মেয়েই-তো মা

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পূত জন্ম-শতবর্ষের
আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডঃ রেবতী মোহন বিশ্বাস
এম. এ. (ক্যাল), পি. এইচ. ডি-(ইউ. এস. এ.)

আলফা পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ
বিহার, ইণ্ডিয়া

প্রকাশক—শ্রীমতি প্রতিমা বিশ্বাস
আলফা পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার, ইণ্ডিয়া

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ ১৩৬৯

মুদ্রক—হরিহর প্রেস
৯৩/২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান—

ডঃ রেবতী মোহন বিশ্বাস
গুইন'স্ লজ, পুরন্দহ
পোঃ বি. দেওঘর
জেঃ দেওঘর, বিহার
পিন - ৮১৪১১২

মিঃ অশ্বিনী চৌধুরী
[illegible] স্টেশন রোড
পোঃ ভদ্রকালি, হুগলি
পিন - ৭১২২৩২

সূচীপত্র

(গ) ভালবাসার অভিব্যক্তির অভাব

(ঘ) স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায় উদাসীন হলে

(ঙ) স্ত্রীর বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বকে তাচ্ছিল্য করলে

(চ) স্বামীর সেন্টিমেন্ট আহত হলে

(ছ) স্ত্রীর সেন্টিমেন্টে আঘাত দিলে

(জ) সন্দেহ এলে তার নিরাকরণ করলে

(ঝ) স্ত্রীর প্রতি প্রন্দেহ হলে

(ঞ) স্বামীকে সন্দেহ করলে

১০। সুখী দাম্পত্যজীবন রূপায়নে কার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

(ক) স্বামী ভাল না বাসলে স্ত্রীর করণীয়

(খ) স্বামীর বিরক্তি বা ক্রোধে স্ত্রীর করণীয়

১১। মাতৃজীবন

(ক) মা—মানবজীবনের আধার

(খ) জীবন মূর্ত্তিলাভ করে কি ভাবে ?

(গ) অভিগমনের রীতি

‘মা’

“যাদের মনোবেদনার কথা শুনতে যেয়ে
এই লেখার বিশেষ উপাদানসামগ্রী
সংগৃহীত হয়েছে—সেই আমার
মাতৃসমা মা-মনিদের করকমলে
উৎসর্গ করলাম।”

—লেখক

প্রস্তাবনা

প্রতিটি মানুষ চায় জীবনে বেঁচে থেকে সুখ, শান্তি ও পরম আনন্দ লাভ করতে। তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অপরিহার্য্য।

পরিবেশ দুরকমের : নিকটতম বা পারিবারিক পরিবেশ, আর বৃহত্তম বা সামাজিক পরিবেশ। পারিবারিক পরিবেশে আছে স্ত্রী [বা স্বামী], পুত্র, কন্যা, মা, বাবা, ভ্রাতা-ভগ্নি প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন। আর পাড়া প্রতিবেশী থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত ধরা হয় বৃহত্তর পরিবেশ। নিকটতম পরিবেশের সঙ্গে যার সম্পর্ক যত সুস্থ, গভীর ও মধুর—তার জীবন তত গভীর, মধুর ও শান্ত। পক্ষান্তরে, যে নিজের আচার আচরণ, সেবা সাহচর্য্য ও বাস্তব অবদানে পরিবেশের যত বিস্তৃত পরিধি পর্যন্ত নিজেকে সংশ্রবান্বিত করতে পারে তার জীবন তত বিস্তৃত, এবং সে তত ভূমা ও আনন্দের অধিকারী হয়ে ওঠে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন যখন মানুষ তার পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, নাম-যশ যতই থাক না কেন, মানুষ যদি তা নিজের স্ত্রী [বা স্বামী], পুত্র, কন্যা বা তদ্রূপ ঘনিষ্ঠ যারা তাদের সঙ্গে প্রীতিমধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে না পারে, যদি প্রতিনিয়ত তাদের সঙ্গে মতান্তর তথা মনান্তর ঘটতে থাকে, তাহলে তার মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। স্ত্রী মনের মত না হলে স্বামীর বুকে কি জ্বালা, এবং স্বামী স্ত্রীদরদী না হলে স্ত্রীর বুকে যে কি ব্যাথার সৃষ্টি হয় তা উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না। ছেলে যদি ছন্নছাড়া হয়ে অবাধ্য চলনে চলতে শুরু করে তবে, তার দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করে বাবা মার অন্তর যে কতখানি আশঙ্কা শঙ্কুল হয়ে ওঠে তা ভুক্তভোগী যাঁরা তাঁরা সবাই জানেন। বুকের ওপরে রেখে মানুষ করা মেয়ে যখন বাবার মুখের ওপরে জবাব দিয়ে বাবা-মার অবাঞ্ছিত পুরুষের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তখন বাবা-মার বুকে যে বেদনার সুর ঝংকৃত হয় তা বড়ই মর্মন্তুদ : ঐশ্বর্য্য ও প্রাপ্তির প্রতুলতার মধ্যেও সংসারকে মনে হয় আলুনী। মানুষ জীবন সংগ্রামে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

লোকজীবনের পরম আশ্রয়, লোকত্তর মহামানব শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের লোক কল্যাণী কর্ম্মধারাকে মাথায় করে দেশ থেকে দেশান্তরে চলার পথে অমনতর শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন শত সহস্র আবাল বৃদ্ধবনিতার সংস্পর্শে আসবার

সুযোগ ঘটেছে। তারা মনখুলে ব্যক্ত করেছে তাদের মনোবেদনার কথা। কত স্বামী কাতর কণ্ঠে বলেছে—"দাদা, জীবন যে বিষময়। স্ত্রীকে নিয়ে এমন নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে জানলে চিরকুমার থাকতাম।"

কত স্ত্রী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেছে—দাদা! দীর্ঘ দশ বছরের বিবাহিত জীবনে দশ দিনের জন্যও অনুভব করতে পারি নি স্বামী সুখ কি জিনিষ। বুকে অসহ্য জ্বালা নিয়ে সংসার করে চলেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় এ অভিশপ্ত জীবনে মৃত্যুই বুঝি শ্রেয়।

কয়েক সহস্র পিতা তাঁর বেদনামথিত অন্তরের কান্নাকে চেপে রেখে বিলাপ করেছেন—"নিজের মেয়ে আমার মুখে চুনকালি দিয়ে একটা লোফারের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে তাতো স্বপ্নেও ভাবিনি, দাদা!

অসংখ্য মা দুঃখ করে বলেছেন—আমার পেটের ছেলে যে এমন অমানুষ হবে, বাবা-মার বুকে ব্যাথা দেবে তা, আগে জানলে কি মা হতে চাইতাম?

আবার কত মেয়ে গোপনে কেঁদেছে আমার কাছে, কেউবা পত্রে আকুল আর্তি জানিয়েছে—"জেঠু! তুমি আমার জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দাও। বাবার দুর্ব্যবহারে বাড়ীর পরিবেশ আমার কাছে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কোন্ দিন যেদিকে দুচোখ যায় পালিয়ে যাব।"

এই সকল বেদনাবিধুর মানুষকে সমাধান দিতে যেয়ে তাদের সমস্যার গভীরে নেমে যেতে হয়েছে। খুঁজে বের করতে হয়েছে কী সে কারণ যার ফলে অর্থ-সম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্র থাকা সত্ত্বেও এঁরা স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র বা কন্যাকে নিয়ে এত অশান্তি ভোগ করছেন। সন্ধান পেয়েছি সেই সব অভিশপ্ত কারণগুলির যার জন্য অজস্র কুমারী কন্যা ভ্রান্ত নির্বাচনের শিকার হয়ে বধূ-জীবনে অমানুষিক অশান্তি ভোগ করছে সারাটা জীবন ধরে অথবা যে সম্পদ থাকলে মেয়েরা বিবাহিত জীবনে সহজেই স্বামী সোহাগী হয়ে উঠতে পারে, যার অভাবে সারাটা দাম্পত্যজীবনে ব্যর্থতার ভার বহন করতে করতে কত মেয়ে যে মৃত্যুকে কামনা করে তাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে দিবালোকের মত। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ছোট ছোট ঘুন-পোকার মত কারণগুলি যা লক্ষ লক্ষ দাম্পত্যজীবনকে জীর্ণ করে তুলেছে ও তুলছে। মা-এর কোন্ অজ্ঞতা বা অক্ষমতা মনের মত সন্তান প্রাপ্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে তাও প্রতিভাত হয়ে উঠেছে অভিজ্ঞতার দর্পণে।

এই সব বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপরে দাঁড়িয়ে বর্তমান পুস্তকের বিষয় বস্তু—

বাবা-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী এবং মা-ছেলে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। কারণগুলি যেমন তুলে ধরেছি গল্পচ্ছলে, সমাধানগুলিও আঁকবার চেষ্টা করেছি উদাহরণের মাধ্যমে।

পুস্তকের কলেবরে কোথাও প্রবন্ধের ধরণ থাকলেও পূর্ণ কলেবরটি তৈরী হয়েছে ঘটনার বিন্যাসে।

প্রত্যেকটি ঘটনা বাস্তব, কোনটা কল্পনায় আঁকা নয়। শুধু সাহিত্যরস সঞ্চারণের জন্য কখনও ঘটনার স্থান, কাল, পরিবেশের গায়ে কল্পনার রঙ্ লাগিয়ে তার চেহারার পরিবর্তন করতে হয়েছে। চরিত্রগুলির নাম, পরিচয় ও পেশা ইচ্ছা করেই বদল করতে হয়েছে। শুধু তাদের মুখের কথাগুলি যথাযথ রাখবার চেষ্টা করেছি।

তবে পিপাসা পেলে মানুষের অন্তরে জলের জন্য যে আকাঙ্খা বা আগ্রহ জেগে ওঠে, তা যেমন সবদেশে, সবকালে, সকল হৃদয়ে প্রায় একই রকমের, ঠিক তেমনই সংসারে স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ের সঙ্গে পারস্পরিক সংঘাত হ'লে ব্যক্তি অন্তরকে যে ভাবে বেদনামথিত ক রে তোলে তার মূর্চ্ছনাও চিরকাল সকল হৃদয়ে প্রায় একই এবং তা থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা একই আকুলতা দিয়ে ঢাকা। তাই যার জীবনের ঘটনা, তিনি ছাড়া আর কোন পাঠক যদি তাঁদের জীবনের ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পান তা'হলে আশ্চর্য্যের কিছু নেই এবং তার জন্য লেখক ক্ষমা পাবেন বলে আশা রাখেন।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত চরিত্রগুলির সমস্যার কথা লেখককেই শুনতে হয়েছে এবং তার সমাধান লেখককেই দিতে হয়েছে। তাই প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে লেখক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। এতে সাহিত্যের রসব্যঞ্জনা অনেকাংশে ম্লান হতে পারে বলে আশঙ্কা। তবে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপরে দাঁড়িয়ে নিজেকেই সমাধানী সঙ্কেত জানাতে হয়েছে ব'লে, লেখক বিষয়বস্তু থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে পারেন নি। তার এই অক্ষমতা পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষমার চোখেই দেখবেন ব'লে বিশ্বাস।

শুধু একটা প্রশ্ন পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

লেখক কোন 'প্রফেশনাল' মনস্তত্ত্ববিদ নন। তেমন কোন বিজ্ঞাপনও নেই তাঁর। অথচ মাত্র দুতিনদিনের পরিচয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভাষাভাষী পরিবারের অন্তঃপুরের কুমারী মেয়েরা, তরুণী বধুরা, বা গৃহিনীরা তাঁদের মনোবেদনার কথা এত অকপটে লেখকের কাছে বল্লেন কি করে?

পুরুষ মানুষের পক্ষে যদিওবা সম্ভব, কিন্তু সদ্যপরিচিত একটি মানুষের কাছে বাপের বিরুদ্ধে মেয়েরা, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীরা যে অভিযোগ করেছে বা মনের ব্যথার কথা প্রকাশ করেছে তা কি বাস্তবে সম্ভব ?

সম্ভব তো বাস্তবেই হয়েছে, তবে কেন সম্ভব হয়েছে তা লেখকের কাছেই খুব পরিষ্কার নয়। শুধু একটি কারণ মনের কোনে উঁকি মারে।

যারা লেখকের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের মান্ত্রশিষ্য বা শিষ্যা অথবা তাঁদের সন্তান-সন্ততি বা আত্মীয় বান্ধব। এঁরা সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনের পরম আশ্রয় এবং মঙ্গলের মূর্ত্ত বিগ্রহ ব'লে মনে করেন। তাঁরা এও দেখেছেন বা শুনেছেন যে ১৯৫২ সাল থেকে লোকত্তর মহামানবের শ্রীচরণপ্রান্তে বসে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমস্যার কাহিনী ও তার সমাধানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনবার ও তা অনুলিখনে লিখে রাখবার সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল। স্থানীয় কর্মীবৃন্দ যাঁরা স্থানীয় কোন উৎসব বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও দর্শনের ওপরে ভাষণ দেবার জন্য লেখককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন তাঁরা পূর্ব থেকেই তাঁদের পরিবার, পরিজন ও পরিবেশের মানসপটে লেখক সম্বন্ধে এক গভীর শ্রদ্ধা, ও আপনত্বের ছবি এঁকে রেখে দেন।

অডিটোরিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ। স্থানীয় বি. টি. কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাই হবে তিনশত। আলোচনার বিষয়বস্তু,—শিক্ষার সার্থক রূপায়নে মায়ের ভূমিকা।

মায়ের ভূমিকা বলব কি! আমার ভূমিকার যে এত গুরুত্ব আছে তা উত্তর-পূর্ব ভারতের এই শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না এলে অনুভব করতে পারতাম না। অধ্যক্ষমহোদয়ের স্বাগতমী অভ্যর্থনা, অধ্যাপকবৃন্দের অভিনন্দন এবং ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক অতিথি বরণের সাত্বিক ব্যঞ্জনা আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলল।

কোনমতে প্রাথমিক সম্বোধন শেষ ক'রে প্রশ্ন করলাম, ভারতবর্ষের মহিলাগণ কি ঋষিদের ঘুষ দিয়েছিলেন?

হাসির রোল উঠল শ্রোতাদের মাঝে। দরজার পাশে দাঁড়ান একজন শ্রোতার মন্তব্য কানে এল, ও বাবা! প্রথমেই ঘুষাঘুষি! শিক্ষা সম্বন্ধে কি বলবেন ভদ্রলোক?

কি যে বলব তাইতো ভাবছিলাম। বল্লাম, ভারতীয় সভ্যতার শ্রীঅঙ্গনে যত দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং যাঁদের হাতে মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য সমস্ত সম্পদ সরবরাহের ভার তাঁদের অধিকাংশই মহিলা!

অর্থসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং লক্ষ্মী। বিদ্যা-প্রদায়িনী—দেবী সরস্বতী। এঁরা নাকি পরস্পর সহোদরা। শক্তির দেবতা—আদ্যাশক্তি মা কালী। তাঁকে ভবতারিণীও বলেন অনেকে। অন্নপ্রদানের ভার যাঁর ওপরে তিনি মা অন্নপূর্ণা। দুর্গতিনাশিনী, বরাভয় প্রদায়িনী যিনি তিনিও দশভূজা মা দুর্গা। বিবাহের ভার প্রজাপতির ওপরে থাকলেও সন্তান সংখ্যা কত হবে,—সরকারী বরাদ্দের মধ্যে সীমিত থাকবে কি না তা নির্ভর করছে মা ষষ্ঠীর মর্জ্জির ওপরে। এঁরা প্রত্যেকেই মহিলা। তবে কি ভারতবর্ষের মহিলাগণ পুরাণ-প্রণেতা ঋষিদের ঘুষ দিয়েছিলেন? তা'নাহলে প্রায় সমস্ত পার্থিব সম্পদের ভার মহিলা দেবতাদের হাতে-দেখান হল কেন?

আবার হাসির রোল উঠল চারিদিকে। তবে জবাব দিলেন না কেউ। জবাব দিয়েছিলাম মণীষীদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে। সেই জবাবের জের টেনেই লিখতে বসেছি আজ।

মানুষের জীবনে যা'যা' একান্ত অপরিহার্য্য—অর্থসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য, সুখশান্তি,—তা'র সবগুলিই নির্ভর করছে মায়ের ওপরে।

সন্তান ধনী হবে না দরিদ্র হবে, প্রাচুর্য্য-পরিবেষ্টিত হবে না নিজের সামান্য প্রয়োজনটুকু পূরণ করতেই হা-ভাতের মত হাঁপিয়ে উঠবে তা নির্ভর করছে, তার মায়ের ওপরে। সন্তান পণ্ডিত হবে না মূর্খ হবে, বীর হবে না কাপুরুষ হবে তাও নির্ভর করছে তার মায়ের ওপরে। সে স্বস্তি ও সমৃদ্ধিতে অঢেল হয়ে উঠবে না দুর্গতির নিষ্পেষণে দুর্ভাগা হয়ে উঠবে তাও নির্ভর করছে তার মায়ের ওপরে। কারণ, মা তিনি, যিনি সন্তানকে পরিমাপিত করেন—গুণগত ভাবে ও পরিমানগত ভাবে। তাই বোধ হয় ভারতীয় ঋষিগণ মহিলাগনকে দেবতার আসনে বসিয়ে 'মা' ব'লে পূজা করতে শিখিয়েছিলেন।

জনজীবনে মাতৃজাতির এতবড় মূল্যায়ন, জীবনবর্দ্ধনের ক্ষেত্রে নারীজীবনের গুরুত্ব এত অকপট ভাবে আর কোন সভ্যতায় স্বীকার করেছে কি না জানা নেই। তবে একথা ঠিক যে 'মেয়ে মাত্রই নিজের মায়ের প্রতিরূপ'—এই মনোভাব নিয়ে শ্রদ্ধা ও নতি জানাবার শিক্ষা ভারতীয় সভ্যতাতেই জন্ম লাভ করেছিল। এমনটি আর কোথাও চোখে পড়েনি।

ভারতীয় গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের পটভূমিকা এমনভাবে বিন্যস্ত যে নারীর ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। করেনও নি কেউ। বরং গৌরবের সঙ্গে তাদের মর্য্যাদার অকপট স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

নারী যে গৃহলক্ষ্মী, শ্রী-স্পর্শ ব্যতীত সংসার জীবনের 'শ্রী' যে সুদূর পরাহত তা কে না অনুভব করেছেন? নারীর কল্যাণ সাহচর্য্য, তার পবিত্র অবদান ছাড়া মানুষের মঙ্গল প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ, সব যে শূন্য তা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও স্বীকৃত হয়েছে। কবিগুরু বলেছেন:

"ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন
সুন্দর কর সার্থক কর
পুষ্পিত আয়োজন।
তুমি এসো এসো নারী
আনগো তীর্থ বারি
স্নিগ্ধ হসিত বদন ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিন্দুর বিন্দু

মঙ্গল কর, সার্থক কর
শূন্য এ মোর গেহ
এসো কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থ বারি।”

কল্যাণী নারীর মঙ্গলময় রূপটিই তো ফুটে উঠেছে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন দর্শনে। তিনি বলেছেন :

“ডান হাতে তার সেবা, বামে সান্ত্বনা,
বুকে আবেগ ও অনুরক্তি,
মুখে সহানুভূতি,
নাসারন্ধ্রে স্নেহমমতা,
শ্রবণে বেদশ্রুতি
মস্তিষ্কে বোধ ও বিবেচনা,
চরণে ক্ষিপ্রতা, ও কর্মতৎপরতা,
সর্বাঙ্গে বৃত্তি নিবেদন।”

নারী চরিত্রের এই মহিমময় রূপ যদি তার বাস্তব ব্যবহারে বিকশিত হয়ে ওঠে তবে কে না স্বীকার করবে যে ‘নারী নরকের দ্বার’ নহে, স্বর্গের পারিজাত; সে জীবনের অমৃতভাণ্ডারের স্নিগ্ধ সৌরভ। সে ক্লান্তির উৎস নহে; শ্রান্তিময় জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। নারী সাধনায় বিঘ্ন নহে, বরং পরম সিদ্ধির পথে প্রতিটি সাধকের জীবনে যোগ্য উত্তর সাধক। সে শুধু জনজীবনের জননী নহে, সমগ্র জাতির জননীও বটে!

কিন্তু প্রশ্ন জাগে মনে, মানবজীবনে নারীর অবদান যদি এতই অমূল্য তবে কেন সহস্র সহস্র গৃহকোণে স্ত্রীরূপী নারী আজ অবদলিত, লাঞ্ছিত, বেদনা-ধুক্তিত? কেন আজ অভিশপ্ত বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার হয়ে শতসহস্র সীমন্তিনী অন্তরজগতে দেউলিয়া হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে? নারী যদি জন ও জাতির জননী তবে প্রতিটি নারী ‘সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্’-এর প্রসূতি রূপে প্রাপ্তির প্রসাদ নন্দনায় ভরপুর হয়ে উঠছে না কেন? কেন আজ প্রতিটি গৃহকোন থেকে ধ্বনিত হচ্ছে না—“মা ভৈঃ! সর্বাণি বিঘ্নানি মাতুঃ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি!” [ভয় নেই! মায়ের প্রসাদে সর্ব বিঘ্ন থেকে রক্ষা পাবে।]

কারণ, “মা হওয়া কি মুখের কথা। প্রসব করলে হয় না মাতা॥” “মা” হলে তবে না মাতৃপ্রসাদে দৈত্ত বিঘ্ন থেকে রক্ষা পাব আমরা। মা কি আর

একদিনে হয়? মেয়ে থেকেই তো মা হয়। জননী হতে গেলেই তো জায়া হতে হয় আগে! তাই কন্যা-জায়া-জননী তিনটি পর্য্যায় নারী জীবনে। একটির সঙ্গে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বধূজীবন জড়িত কুমারী জীবনের সঙ্গে যেমন জড়িত গোলাপ কুসুম তার কলিকার সাথে।

স্বাভাবিক পরিচর্য্যায় গোলাপ কলিকা অনুপম কুসুমে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। রূপ-রস-গন্ধের আমেজে মানুষের অন্তরে আনন্দের দোলা সৃষ্টি করে। তেমনই কুমারী জীবনে মেয়েরা সুষ্ঠু পোষন পরিচর্য্যা পেলে বধূজীবনে তারা বিভব-মণ্ডিতা হয়ে ওঠে। সেবা ও পরিচর্য্যায়, সহ্য ও ধৈর্য্যে, ধী ও ধারণে, প্রেরণা ও প্রেমের মাধুর্য্যে স্বামী ও স্বামীকুলের মনোলোভা হয়ে ওঠে তারা। শ্বশুর ঘরের প্রত্যেকে তাদের প্রশস্তিতে মুখর হয়ে গেয়ে ওঠে, "জয়তু লক্ষ্মী স্বরূপিনী মে।"

পক্ষান্তরে কলিকা যদি কোন কারণে বিকৃতি-বিদ্ধ হয় তবে তা আর কুসুমে পল্লবিত হতে পারে না। অশোভন বোঝার মত বৃন্তের গায়ে ভার হয়ে থাকে। মানুষের মনোলোভা হতে না পারায় তার কদর যায় ক'মে।

তেমনই কুমারী জীবনে মেয়েরা পিতৃগৃহে সুস্থ পোষণ-পরিচর্য্যা না পাওয়ায় বিকৃতি-বিধ্বস্ত হয়ে ওঠে। ফলে ব্যর্থতায় বিবশ হবার সম্ভাবনা নিয়েই বধূজীবনে প্রবেশ করে। ব্যর্থ বধূজীবনের যে জ্বালা তা তাদের ঐশীদীপনাকে [divine zeal] সুন্দরে পরিস্ফুট না করে একটা কুৎসিৎ বিদ্রোহী আবেগে রূপায়িত ক'রে তোলে। তাদের অন্তর জগত ভ'রে ওঠে হতাশা, নিঃসঙ্গ বোধ ও আহত অহং-এর ক্ষুব্ধ আক্রোশে। জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অপরের [স্বামীর] জীবনকে বিস্বাদে পরিণত করবার জন্য অন্তরে অজ্ঞাতে জেগে ওঠে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা জৈবিক মিলনের মাধ্যমে যখন সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করে তখন সে সন্তান আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মায়ের কোল পূর্ণ করলেও বাঞ্ছিত ব্যবহারে মায়ের দিলকে ভ'রে রাখতে পারে না। মাতৃজীবন ধিক্কার ও অনুশোচনার ভারে নিজের কাছেই অভিশপ্ত মনে হয়। মনের দুঃখে ব'লে ওঠে, "মেয়ে-মানুষ হয়ে জগতে আর যেন কেউ না জন্মায়। নারী জীবন অভিশপ্ত।"

নারী জীবন অভিশপ্ত না সপ্ত সিন্ধুর সম্ভারে পূর্ণ তা কে বলবে? মেয়েমানুষ জগতে না জন্মালে জগতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে তার চাইতেও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যদি মেয়েরা মানুষ হবার সুযোগ না পায়।

তাই মেয়েকে যদি মানুষ করতে হয়, প্রকৃতিদত্ত অক্ষয় সম্পদে বিভবমণ্ডিতা

ক'রে তুলতে হয়, বলিষ্ঠ জন বা জাতির জননী রূপে পেতে হয় তাকে তবে শিশুকাল থেকে তার একাগ্র সম্বেগের [concentric urge] সুষ্ঠু পোষণ পরিচর্য্যা অপরিহার্য্য।

একাগ্র সম্বেগ কাকে বলে ? যে সম্বেগ বা আগ্রহ মেয়েকে কোন 'এককে' অগ্রে রেখে চলার পথে এগিয়ে যেতে প্রেরণা যোগায় ; যে সহজাত আগ্রহের ফলে মেয়ে ঐ বিশেষ একে সর্বতোভাবে সার্থক হয়ে উঠতে চায়, তাকেই বলে মেয়ের একাগ্র সম্বেগ।

এই একাগ্রসম্বেগের উৎস হচ্ছে মানুষের [মেয়ে পুরুষ উভয়েরই], অন্তর্নিহিত মিলন প্রবণতার ঝোঁক বা 'লিবিডো'। মানুষ যা দিয়ে এই মিলন প্রবণতার ঝোঁক বা 'লিবিডো'কে প্রকাশ করে তাকে বলে ভালবাসা। এই 'লিবিডো'-র সাহায্যে মানুষ নিজেকে অপরের সঙ্গে সংশ্রবান্বিত করে এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার [interaction] মাধ্যমে নিজেকে উপভোগ ক'রে থাকে। এই লিবিডোর অন্যতম বিশেষ ধর্ম হচ্ছে কোন শ্রেষ্ঠে বা প্রেষ্ঠে নিজেকে নিবদ্ধ ক'রে পুষ্ট হওয়া এবং আরও থেকে আরোতে বিবর্ত্তিত হয়ে ওঠা।

তাই মেয়েদের সহজাত প্রকৃতিই হচ্ছে কোন বিশেষ এককে ভালবেসে তন্মুখী ও তন্নিষ্ঠ হয়ে থাকা। একের সান্নিধ্যে নিজের সব যা কিছু বিলিয়ে দিয়ে ঐ এককে আত্মকৃত ক'রে আত্মপ্রসাদে ভরপুর হয়ে থাকতে চায় তারা। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা, সেবা পরিচর্য্যা, স্নেহমমতা, প্রীতি, ভক্তি ও প্রেমের বন্ধনে বহুকে আপন ক'রে নিয়ে ঐ বিশেষ একে সার্থক হ'য়ে উঠতে চায়। নারী-জীবনের পরম তৃপ্তি ও প্রাপ্তিই ওখানে। তাই মেয়ের এই একাগ্রসম্বেগ বা এককে ভালবাসার আবেগকে পুষ্ট করাই হচ্ছে কুমারী জীবনের প্রকৃত পোষণ পরিচর্য্যা।

একটা চারাগাছকে যদি ফুলে ফলে সমৃদ্ধ বৃক্ষে পরিণত হতে হয়, তবে তার মূলকে কোন নির্দ্দিষ্ট উর্বর ক্ষেত্রের গভীরে প্রবেশ করে রস সংগ্রহ করতেই হবে।

তেমনই একটি কুমারী কন্যাকে যদি বধূরূপে ও মাতৃরূপে কৃতী ও সার্থক হতে হয় তবে তার একাগ্র সম্বেগকে কোন একজন প্রেষ্ঠে নিবদ্ধ ক'রে তাঁর থেকে ভালবাসারূপ রস সংগ্রহ ক'রে তার ভালবাসার টানকে মজবুত করে তুলতেই হবে। অর্থাৎ, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও স্নেহমমতার রসঘন ব্যক্তিত্ব নিয়ে জায়া ও জননী রূপে যদি আবির্ভূত হতে হয় তবে এমন একজন প্রেষ্ঠকে ঐ কন্যার ভালবাসতেই হবে, যাঁর কাছ থেকে ভালবাসার পোষণা [Feed back] পেয়ে তার লিবিডো বা একাগ্র সম্বেগ মজবুত হয়ে ওঠে।

একটি শিশুকন্যার সম্মুখে বাবা ও মা-ই হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা প্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বাবা ও মার প্রতি ভালবাসার টান শিশুর জীবনে সহজাত। শিশুর সেন্টিমেণ্টের সূক্ষ্ম তারগুলি তার মা ও বাবাতেই নিবদ্ধ থাকে। তার চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা ও কর্মধারা এমনকি পারিপার্শ্বিক জগত সম্বন্ধে বোধ, তার মা-বাবাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়।

এও লক্ষ্য করা যায় যে সাধারণতঃ মেয়েরা বাপ-ঘেঁষা এবং ছেলেরা মা-ঘেঁষা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ছেলের জন্য মায়ের এবং মেয়ের জন্য বাপের একটা দুর্বলতা [soft corner] থাকেই। মা ও বাবার মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁদের প্রতি ছেলেমেয়েদের প্রকৃতিগত ভালবাসার টান যদি পুষ্ট হয়ে ওঠে তবে স্বতঃই তাদের 'লিবিডো' মা এবং বাবাতে সুনিবদ্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে মায়ের প্রতি ছেলের টান ও বাপের প্রতি মেয়ের টান যদি খুব তীব্র হয়ে ওঠে তাহলে মা ও বাবার পক্ষে অপ্রীতিকর কিছুই তারা করতে পারবে না। তারা স্বাভাবিক ভাবেই পরিবেশের বিকৃতি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারে। তাই তো ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

"ছেলের নেশা মায়ের উপর
মেয়ের নেশা বাপে
এমনতর ছেলে মেয়ে
নষ্ট হয় না চাপে।"

নষ্টতো হয়ই না, বরং নিটোল ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেড়ে ওঠে। তেঁতুল বা তজ্জাতীয় কোন টকবস্তু দেখলে আমাদের বিশেষ গ্রন্থির [gland] যে ক্ষরণ হয় এবং রসনা রসাপ্লুত হয়ে ওঠে তা কে না জানেন? ঠিক তেমনই বাবার আদর-সোহাগ-ভালবাসার স্পর্শে বিশেষ করে আট-ন বৎসর থেকে উনিশ-কুড়ি বৎসরের কুমারী মেয়েদের বিশেষ গ্রন্থির ক্ষরণ হয়। এটা সাইকো-ফিজিক্যাল সিক্রেষাণও বলা যেতে পারে। এই ক্ষরণের ফলে মেয়েদের অন্তরের সূক্ষ্ম সুকুমার ভাবগুলি [finer and tender feelings] পুষ্ট ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। রসাল ফল পুষ্ট হয়ে ঠিক মত পাকলে তা স্বাদে, গন্ধে ও গুণপনায় যেমন মানুষের রসনাকে তৃপ্ত করে এবং প্রয়োজনকেও পূরণ করে, ঠিক তেমনই বাবার সোহাগসন্দীপনায় কুমারী কন্যার সুকুমার ভাবগুলি যদি পরিপুষ্ট হয়ে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায়, তবে সেই মেয়ে জায়ারূপে স্বামীর সত্তাকে সহজে পরিতৃপ্ত করতে পারে। আর ঐ তৃপ্ত

স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত সন্তানকে সার্থক জননী রূপে বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে পারে অনায়াসে।

পক্ষান্তরে, মেয়েরা যদি বাবার কাছ থেকে ভালবাসা, আদর, সোহাগ না পায় তবে বাবার প্রতি তাদের সহজাত ভালবাসার টান ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। এমনকি বাবার অজ্ঞতা ও অমনস্তাত্ত্বিক ব্যবহারের ফলে ঐ টান একদম ছিঁড়েও যায়। তখন ঐ মেয়ের লিবিডো বাস্তুহারা মানুষের মত নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। জোঁক যেমন তৃণ থেকে তৃণান্তরে আশ্রয় অন্বেষণ করে, ঐ মেয়ের একাগ্রসম্বেগ বা লিবিডোও তদ্রূপ লোক থেকে লোকান্তরে সুনিবদ্ধ হতে চেষ্টা করে।

তাছাড়া, গাছের মূল ছিঁড়ে গেলে রস ও রসদ সংগ্রহ করতে না পেরে গাছ যেমন শুকিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই বাবার প্রতি ভালবাসার টান ছিঁড়ে গেলে, পুষ্টি যোগাতে পারে এমন পাকা ভালবাসার অভাবে মেয়ের অন্তর জগত শুকিয়ে যায় এবং সে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে ওঠে। সে তখন মরিয়া হয়ে ওঠে পরিবেশের যে কোন বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির ভালবাসায় প্রলুব্ধ হতে।

গুণের রশি ছিঁড়ে গেলে নদীর বুকে নৌকা যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, এমনকি স্রোতের সংঘাতে অতলে তলিয়েও যেতে পারে। ঠিক তেমনই বাবার প্রতি ভালবাসার টান কেটে গেলে মেয়ের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পরিবেশের সংঘাতে সে কোথায় কখন কি ক'রে বসবে তার কি ইয়ত্তা আছে ?

তাছাড়া বাপের আদর সোহাগ স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত মেয়েদের সুকুমার ভাবগুলি পুষ্ট তো হয়ই না বরং শুকিয়ে যায়। ফলে বিবাহিত জীবনে স্বামীকে সুখী করবার জন্য খুবই কসরৎ করতে হয় তাদেরকে। সাধারণতঃ এইসব মেয়েরা দৈহিক সেবা পরিচর্যা ও জৈবিক ক্ষুধার তৃপ্তিদান ছাড়া প্রেমের অভিব্যক্তিতে স্বামীকে রসাপ্লুত করে রাখতে পারে কমই। নীরস যন্ত্রবৎ দাম্পত্য জীবনে ক্লান্ত হয়ে ওঠে স্বামী। স্ত্রীর সঙ্গ সাহচর্য্যে মানসিক ও আত্মিক সম্পদে ভরপুর হবার সুযোগ স্বামীর ভাগ্যে জোঠে না বললেই হয়।

এ-সত্যের আভাস পেয়েছি বহু মেয়ের কাছ থেকে। মনের বেদনার কথা বলতে গিয়ে তৃষিত অন্তরকে উজাড় করেছে অকপটে। যে বয়সে মেয়েরা প্রেমের প্রমোদ কাননে প্রবেশের সুযোগ পেলে সব না পাওয়াকে ভুলে থাকতে পারে, সেই বয়সে সেই সুযোগ পেয়েও বাবার স্নেহমমতা ভালবাসার অভিব্যক্তি-হারা ব্যবহারের জ্বালা ভুলতে পারে নি তারা।

আমিও ভুলতে পারিনি বিনতার তৃষিত অন্তরের আকুল আবেদন : জেঠু! তুমি আমায় আশীর্বাদ কর যেন স্বামী সোহাগী হতে পারি।"

সমুদ্রসৈকতের কোন এক শহরে কেটে গেল সাতদিন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় হয় সাধারণ সভা না-হয় ঘরোয়া অধিবেশনের ব্যস্ততা। সারাদিন আবাল-বৃদ্ধ বণিতার আনা-গোনা ও আলাপ-আলোচনায় মুখর হয়ে থাকত গৃহস্বামীর আস্তানা।

গৃহস্বামী বয়সে তরুণ। তিরিশের কোটায় পা দেবে আগামী আষাঢ়ে। মাত্র তিনটি আষাঢ় পার হয়েছে বিবাহের পর। স্ত্রী বিনতা—তন্বী তরুণী। হাসি, উচ্ছ্বাস, প্রাণ-চঞ্চলতা—কোনটারই অভাব দেখলাম না তার। সংসারে অভাবের লেশমাত্র নেই। একটি মাত্র শিশু—কোলে এসেছে আঠার মাস আগে। সুখের সংসার বলতে দ্বিধা করবে না কেউই।

কিন্তু বুকের বেদনার কথা বলতে বিনতা যে দ্বিধা করছিল তা বুঝতে পেরেছিলাম তাদের বাড়ী থেকে ফিরে আসবার পর। যে সাতদিন ছিলাম, কি সেবাই না করেছে বিনতা! শ্রাবণী, শিবাণী, কল্পনা, আল্পনা প্রভৃতি সপ্তদশী প্রতিবেশিনীরা তাকে সহযোগিতা করলেও বিনতার দশভূজা রূপকে অস্বীকার করবার উপায় ছিল না।

বিনতাদের বাড়ী থেকে ফিরে এলাম আশ্রমে। কয়েকদিন পরে বেশ কয়েকখানা চিঠি পেলাম সেখানকার ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে। বিনতাও লিখেছে লম্বা এক চিঠি। চিঠিখানার প্রতিছত্রে যে সুর ঝঙ্কার দিচ্ছে তা কানে গেলেই বোঝা যাবে যে বাবার আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিতা মেয়েদেরকে কতখানি কসরৎ করতে হয় পতিসোহাগী হবার জন্য। লিখেছে বিনতা :

শ্রীচরণ কমলেষু,

জেঠু! লিপির প্রারম্ভে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আশা করি ভালভাবেই পৌঁছতে পেরেছেন।

মনে আছে কি আমাদের কথা? আপনি যেদিন চলে গেলেন সেদিন থেকে আজঅবধি সংসারের কূল খুঁজে পাচ্ছি না। কি একটা অজানা নেশা মনটাকে করে রেখেছে ভারাক্রান্ত। কোন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। ক্লান্তির ছায়া নেমে এসেছে সারা শরীরে। আর চোখের কথা? সেকথা বলে লাভ নেই। চোখ অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে আপন মনে গাল বেয়ে বুক ভাসিয়ে চলেছে।

অনেক বক্ বক্ করে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি। ভাবছি, বেশ করছি। তবে একটা কথা কি জানেন? আমার মনে হয়, মনটাও তো একটি এঞ্জিন! তাতেও তেলের দরকার হয়। আমি বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই—যে আমি বাবার কাছে শুধু মারই খেয়েছি। ভয়ে তটস্থ হয়ে থেকেছি। স্নেহ কি জিনিষ শুধু এই গত সাত দিনে আপনার কাছে পেয়েছি। কিন্তু অমৃতের স্বাদ কি এতটুকুতে মেটে? আমার তো মেটেনি। অবশ্য

'যোগ্যতা নেই দাবি করে
বেঘোর পথে তারাই মরে।'

ভেবে মনের অন্যায় আশাকে দমন করবার চেষ্টা করছি। শাসন জীবনে অনেক পাই। কিন্তু সোহাগ কি তা জানলাম না—হয়তো যোগ্যতার অভাবে।

এ-সব কথা কোনদিন কাউকে বলিনি। কিন্তু কেন জানি না আপনাকে জানার পর থেকে মনের সমস্ত কথা উজাড় ক'রে দিতে ইচ্ছা করছিল। সুযোগ পাই নি। আর বলার জন্য মনের জোরও পাই নি। শুধু মনে হয়েছে নিজেকে অপরাধী ব'লে। বেশছিলাম সংসারের সব বাইরে সাজিয়ে আর মনের গহনে কান্নাটাকে লুকিয়ে। হঠাৎ আপনি দেবদূত রূপে এসে কেন এমন অমৃতের স্বাদ একটুখানি জিবের ডগায় ঠেকিয়ে দিয়ে গেলেন? কি করবো? কোথায় যাব? মনটা যে শূন্যতায় ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে আজ অবধি যা পেয়েছি সব মেকী। আসল কিছুই ভগবান আমার জন্য বরাদ্দ করেন নি।

পাগলের প্রলাপ শুনে নিশ্চয়ই আমাকে খুব খারাপ ভাবছেন। কিন্তু জানেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পনার মত সতীনারী [পতিপ্রাণা] হওয়ার বাসনা আমারও আছে। কিন্তু শুধু স্নেহের অভাবে জীবনটাকে ব্যর্থতায় ভয়া বলে মনে হয়।

জেঠুমনি, বল না! আমি কি আমার স্বামীকে শান্তি দিতে পারব না? আমি ও আমার স্বামীর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। কিন্তু তবু কেন শান্তি পান না উনি তা ভেবে পাই না। উনি শান্তি পেলেই আমি শান্তি পাব। এই আমার বিশ্বাস। উনাকে শান্তি দিতে পারছি না বলেই আমার যত দুঃখ।

আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। অভাগিণী মেয়েকে ক্ষমা করবেন। আর কি লিখব? মনে কথা অনেক—মুখে আসছে না। এবার শেষ করছি। তালনবমীতে দেওঘর যাবার ইচ্ছা আছে। ইতি—

আপনার বৌমা।

কত কচি বোমার অন্তরে এমন চাপা কান্না যে ধ্বনিত হচ্ছে তা একটু কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যেতে পারে।

শুধু ভারতবর্ষে কেন, পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের বুকে কান পাতলেও শতসহস্র কুলবধূর অন্তর বেদনার ঐ একই সুর শুনতে পাওয়া যাবে। তবে সে দেশের মেয়েরা বেশী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভোগ করতে করতে বিবাহের আগেই এত স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে যে বেশীদিন স্বামীর উপেক্ষা সহ্য করতে পারে না। পতি পরমগুরু এই বিশ্বাস না থাকায় খুঁটিনাটি কারণে মতান্তর তথা মনান্তর ঘটলেই আইনের দ্বারস্থ হয়ে পত্যন্তর গ্রহণের সুযোগ করে নেয়। মনে হয়, যে সব দেশে বিবাহবিচ্ছেদ যত বেশী, সে দেশে তত বেশী সংখ্যক মেয়ে বাবার সোহাগ-সন্দীপন থেকে বঞ্চিতা। বিবাহবিচ্ছেদের পেছনে থাকে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে সয়েবয়ে নিতে না পারা। স্ত্রীদের তরফ থেকে এই না পারার অন্যতম প্রধান কারণ—কুমারী জীবনে বাবার আদর সোহাগ বঞ্চিতা হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে মেয়েদের একাগ্র সম্বেগ ছিন্ন ও বিকৃত হয়ে পড়ে। তাই তারা "এককে" সয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে না।

পাশ্চাত্য মেয়েদের অন্তরও যে বাপসোহাগী হবার জন্য লালায়িত, তারাও যে বাবার সেবা পরিচর্য্যায় বাবাকে খুশী ক'রে পিতৃপ্রসাদে ভরপুর হয়ে উঠতে চায় তার পরিচয় পেয়েছি ভূরি ভূরি।

১৯৭২ সাল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছি ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে কিছু বলবার জন্য। বিষয় বস্তু : সাম্য ব্যক্তিত্ব লাভ করা যায় কি করে?

ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য ও তাদের আগ্রহ উদ্দীপ্ত নানা প্রশ্ন ভাষণের বিষয়বস্তুকে একপেশে ক'রে ফেল্‌ল। ছেলেদের সম্বন্ধে যে বলি নাই তা নয়। তবে মেয়েদের ভাগেই বেশী। কথাপ্রসঙ্গে বল্‌লাম :

"কুমারী মেয়েদের
পিতায় অনুরক্তি থাকা
তাঁহার সেবা ও সাহচর্য্য করা
তাঁহার সহিত
আলাপ আলোচনা করা
উন্নতির
প্রথম ও পুষ্ট সোপান!"*

---

* শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র : নারীর নীতি ৮

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করবার সময় মনে বেশ সংশয় হল: ধর্মযাজকের মত বেশী নীতিউপদেশ দিয়ে ফেলছি না তো?

আমরা ভারতীয়রা না হয় ভগবানকে মা বলি। তাই মার প্রতি আমাদের টান এত বেশী। আর আমাদের শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পিতা দশরথের প্রতি ভালবাসার টানেরই সাক্ষ্য রেখে গেছেন ভারতীয় জনজীবনের জন্য। তাই বাবাকে শ্রদ্ধা করা আমাদের কৃষ্টিগত সম্পদ। কিন্তু এরা? এরাতো ভগবানের মাতৃরূপ কল্পনাও করতে পারে না। অবশ্য মহামতি যীশু ঈশ্বরকে পিতা বা পরমপিতা বলেই সম্বোধন করেছিলেন। তাই এদেশের ছেলেমেয়েরা বাবাকে ভালবাসবেই বা না কেন? সংশয়কে সংশ্লেষণ করে সমাধান দিতে যেয়ে বলেই ফেললাম:

পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান
সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ।

মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে বললাম: বাবাকে যে মেয়েরা ভালবাসে, শত কাজের মাঝেও বাবাকে খুশী করবার লোভ যে মেয়েদেরকে পেয়ে বসে, তারা ব্যক্তিত্ব ও ব্যুৎপত্তিতে মজবুত হয়ে উঠবেই কি উঠবে।

আমার কথাগুলি যে ছাত্রীদের মনে ধরেছে, তা বুঝতে পারলাম অধ্যক্ষ মহোদয়ের খাসকামরায় এসে। একজন ছাত্রী প্রতিনিধি এসে অধ্যক্ষ মহোদয়ের কানের কাছে বিড় বিড় ক'রে কি যেন বলল। অধ্যক্ষমহোদয় আমার দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললেন—Dr. Biswas would you please favour these girls with your valuable time? They desire to have some personal talks with you.

ডঃ বিশ্বাস! আপনি অনুগ্রহ করে এই ছাত্রীদিগকে আপনার মূল্যবান সময় যদি দিতেন! এরা ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

আমি সাগ্রহে বললাম—That is my great pleasure

সেটা তো আমার কাছে খুবই আনন্দের!

প্রথমে এগিয়ে এল এমিলী। সে তার সহপাঠিনীদেরকে দেখিয়ে বলল ডঃ বিশ্বাস। আমরা তোমার প্রতিপাদ্য বিষয়কে মনে প্রাণে স্বীকার করি। বাবাকে ভালবাসা ও সেবা করা আমাদের জীবনের পরম আনন্দ। কিন্তু

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের বাবা নেই। তুমি আমাদের জন্ম কোন বিকল্প ব্যবস্থা বল।*[1]

অডিটোরিয়ামে আমার বলার আবেগে মেয়েরা কতখানি অভিভূত হয়েছিল তা মেপে দেখবার অবকাশ হয়নি। তবে 'আমাদের বাবা নেই' বলতে এমিলীর চোখের কোন থেকে যে দু' ফোটা জল ঝরে পড়ল তা আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলল। চেয়ে দেখি এমিলীর কপালে আমার বড় মেয়ে 'মান্নুর' চোখদুটি বসান। মনে হল, মান্নু বুঝি শাড়ি ছেড়ে 'গাউন' পরে দাঁড়িয়ে আমার সম্মুখে। সন্তান বাৎসল্যে ভরপুর পিতার চোখে নিজের মেয়ে আর মিঃ মরিসের মেয়ে যে একই রকম প্রতিভাত হয় তা এই মুহূর্তে মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। বললাম, দুঃখ করো না আমার মা-মনিরা। তোমরা হয়তো বাবাকে হারিয়েছ। মাকে ভালবেসে তাঁর সেবা করাই তোমাদের পক্ষে বিকল্প শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।*[2]

আমার কথায় মেয়েরা যে আশ্বস্ত হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু তারা চলে গেলে অধ্যক্ষমহোদয় যখন বললেন, 'ঐ মেয়েগুলি বলতে চেয়েছিল যে তাদের বাবা তাদের মাকে ডিভোর্স করেছে' তখন বুকের ভেতরটা কেমন অবশ হয়ে উঠল—বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগলে যেমন হয় সারা শরীর। লজ্জিত হলাম ভুল বুঝবার জন্য। আমি ভেবেছিলাম, তাদের বাবা মারা গেছেন। এখন বুঝতে পারলাম, বাবা বহালতবিয়তে জীবন্ত থেকে এই সব মেয়েদের কাছে মৃত।

হায়রে সভ্যতা! অহো ভাগ্যম্! মনে হতে লাগল, বিবাহবিচ্ছেদের শিকার শতসহস্র কিশোরীর মর্মবেদনা যে নীরবে গুমরে গুমরে কাঁদছে তা কি সভ্যসমাজের কেউ শুনতে পাচ্ছেনা? আটলান্টিকের ঢেউ-এর গর্জন যেমন সকলের অগোচরে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়, বাবার আদরসোহাগ বঞ্চিতা মেয়েদের অন্তরের হাহাকার কি তেমনই ব্যর্থতার মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে?

বাপের বুকে মাথা রেখে তাঁর আদর খাওয়ার প্রলোভন কত কিশোরীর জীবনে যে এই ভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হিসাব কি কেউ রাখে?

1* **Dr. Biswas! We all appreciate your proposition. And you know, to love and serve our father is our greatest pleasure. But unfortunately we have missed our father. Please suggest an alternative remedy for us**

2* **Don't worry my young mothers You may have lost your father. But to love and serve your mother is the best alternative resort.**

মেরী আইভ্যান নামে এক ভদ্রমহিলা প্রায়ই আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়াস সেণ্টারে। তাঁর সঙ্গে আসত তাঁর ছয় বছরের ছেলে টম্ আর নয় বছরের মেয়ে ভিভিয়ান। হাসি খুশীতে ভরা, প্রাণোচ্ছল ছিল শিশু দুটি।

মিঃ আইভ্যানের সঙ্গে মেরীর আদালত অনুমোদিত ডিভোর্স তখনও হয় নি। তবে "সেপারেশন পিরিওডে" স্বামী স্ত্রী পরস্পর থেকে আলাদা বাস করেন। টম ও ভিভিয়ান থাকে তাদের মায়ের কাছেই।

প্রতি শনিবার সকালে মিঃ আইভ্যান ছেলে মেয়েকে নিতে আসেন উইকএণ্ডে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য। মোটর কারে উঠবার আগে টম্ মেরীর হাত ধরে বলে, মাম্ ওনট্ ইউ গো উইদ আস্? [মা, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?] মা নিরুত্তর।

আবার সোমবার সকালে মা মেরী যখন ছেলেমেয়ে দুটিকে ফিরিয়ে আনতে যায় তখন ঐ একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মেয়ে ভিভিয়ান তার বাবার শার্টের কোণা টেনে ধরে বলে, হোয়াই ডোণ্ট ইউ কাম উইদ্ আস্, ড্যাড্? [আমাদের সঙ্গে আসছ না কেন বাবা?] বাবা শুধু একটু মুচকী হেসে তাঁর ডান হাতের আঙুল দুটো নেড়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন—বা-ই-ই।

ভিভিয়ান বাবার অধরের ঐ হাসির অর্থ বুঝতে পারে না। টমও বুঝতে পারে না কেন তার বাবাকে দেখে মা মুখ নিচু করে থাকে!

টম ও ভিভিয়ানের অন্তর মা ও বাবা উভয়ের সোহাগাকাঙ্ক্ষী। উভয়কেই কাছে পেতে চায় তারা। কিন্তু অলুক্ষণে বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা শিশুমনের এই আকাঙ্ক্ষাকে কোনদিন পূরণ হতে দেবে না।

মিঃ আইভ্যান বা মেরী কেউ কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে নির্দোষ পবিত্র মানবকলিকা দুটিকে অজানা অদৃশ্য রাজ্য থেকে মর্ত্তের মাটিতে যখন নামিয়ে এনেছেন তখন তাদেরকে কুসুমে পরিণত করার দায়িত্ব তাঁদেরই? এমনতরভাবে মা-বাবা যদি তাঁদের দায়িত্ব পালন না করেন তবে শতসহস্র কিশোরীর মাতৃত্ব যে ঝরামুকুলের মত ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আম গাছের মুকুল যখন অকালে ঝরে যায় তখন গৃহস্বামী চিন্তিত হয়ে পড়েন। চেষ্টা করেন যাতে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে অধিক সংখ্যক মুকুল সুস্থ ও সুপুষ্ট আম প্রসব করতে পারে। আজ সভ্যতার মানব কাননে কত কুমারী কন্যা যে ঝরামুকুলের মত ব্যর্থ জীবনের ভার বহন করছে তা কি কারও চোখে

পড়ছে না? মানুষের বিবেক ও বিজ্ঞান কি চেষ্টা করবে না যাতে অধিক সংখ্যক কুমারী কন্যা সুস্থ ও সুন্দর জায়া জীবনে, সুন্দর ও কৃতী সন্তান প্রসব ক'রে তৃপ্ত ও নন্দিত হয়ে ওঠে? তার জন্য তো অর্থের প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন হয় না! প্রয়োজন শুধু মেয়ের একাগ্র সম্বেগকে পুষ্ট করে তোলা। মেয়েকে ভালবাসা। এই সামান্যটুকু দিতেও যেন পিতারা নারাজ।

আমার এই মন্তব্যে অনেক পিতাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন। বিশেষতঃ একমাত্র কন্যার পিতা যিনি তিনি তো বলবেন, ইস্, মেয়েকে কি কম ভালবেসেছি? বুকের রক্ত জল করা পয়সা দিয়ে মেয়ে যখন যা আবদার করেছে তাই যোগান দিয়েছি। ভালবাসলাম না কেমন করে? তবুও আমার মেয়ে আমার মুখে চুনকালি দিয়ে এমন ভাবে চলে যাবে তাতো ভাবতেই পারি নি।

অনেক পিতাই ভাবতে পারেন না যে বাপের প্রতি মেয়ের ভালবাসার টান বা একাগ্র সম্বেগকে মজবুত করতে হ'লে মেয়ের এবং মেয়ের মার সঙ্গে বিশেষ ব্যবহার প্রয়োজন। ব্যবহারে ক্রটী হ'লে ব্যাঙ্ক উজাড় ক'রে মেয়ের জন্য খরচ করলেও বাপের প্রতি মেয়ের ভালবাসার টান যে কেটে যেতে পারে এবং বাপের মুখে যে চুনকালি পড়তে পারে তা কালিবাবুর কাহিনী থেকে শুরু করে কয়েকটা বাস্তব ঘটনা শুনলেই অনুমান করা যাবে।

দাম্পত্য কলহ

কলকাতায় সরকারী উদ্যোগে নির্মিত হাউসিং কমপ্লেক্সে বাস করেন ভদ্রলোক। বর্ণে বিপ্র, কুলীন ব্রাহ্মণ। স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। মাসের প্রথমে কেটে-ছেঁটে যা হাতে পান তাতে আরও দু'মাস ভালভাবেই চলে যায়। তাই অভাব নেই সংসারে।

সংসারে অভাব নেই ঠিকই। কিন্তু তার বাবা ও মায়ের মধ্যে 'ভাব' আছে বলেও তো বাসনা বুঝতে পারে নি কোন দিন।

কালিবাবুর একমাত্র মেয়ে বাসনা। বঙ্গবাসী কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। লেখাপড়ায় ভাল বললে কম বলা হবে। কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে বেশ সুনাম কিনেছে সে!

কিন্তু বাড়ীতে মন বসে না বাসনার। প্রতিদিন সকালটা কাটে কোন মতে। কিন্তু সন্ধ্যায় কালিবাবু অফিস থেকে ফিরে এলে কুরুক্ষেত্র বেধে যায় বাসনার মায়ের সাথে। মা দেখতে পারেন না বাবাকে; বাবা সহ্য করতে পারেন না মাকে। তাই বাড়ীর পরিবেশ অসহ্য হয়ে ওঠে বাসনার কাছে।

সমবয়সী বান্ধবীরা খুবই ভালবাসে বাসনাকে। সহপাঠিনীরা তার অসাক্ষাতে সুখ্যাতি করে, 'এত বড়লোকের মেয়ে, এতটুকু দেমাক নেই বাসনার!'

সেদিন গায়ত্রী তো গালে টোকা দিয়ে বলেই বসল, তোর আর ভাবনা কি? কলেজ থেকে পাস ক'রে বেরুলেই বিয়ে দেবেন বাবা! বাপদুলালী মেয়ে! মনের মত বর জোগাড় করে রেখেছেন নিশ্চয়ই। আমার মত তো আর নয়। মাথার ওপরে এখনও তুই দিদি! দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতখানা চেপে ধরল বাসনার। হুড় হুড় করে টেনে নিয়ে বসাল তাদের চালা-ঘরের কাঁথা পাতা বিছানার ওপরে।

গায়ত্রীর মা মলিনা দেবী আহ্লাদ করে বল্লেন—ওমা বসন যে! আজ আমার কি ভাগ্যি! বাসনা প্রণাম করল মলিনা দেবীকে। থাক থাক মা'। আহা হেঁটে এসেছ বুঝি! মেয়ে আমার ঘেমে নেয়ে উঠেছে।—নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন গায়ত্রীর মুখখানা।—ঐ যে তোমার জ্যাঠামশাই আসছেন। ছুটে নেমে গেলেন বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে। সবজি-বাজার ভরা থলে দুটি নিয়ে নিলেন মন্মথবাবুর হাত থেকে। আড় চোখে বসনকে দেখিয়ে বললেন—দেখ, কে এসেছে! রান্নাঘরে চলে গেলেন মলিনা দেবী।

মন্মথবাবু ঘরে ঢুকতেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল বাসনা। থাক, থাক, সুখী হও মা। বাসনার মাথায় হাত বুলিয়ে কোলের কাছে টেনে নিলেন মন্মথবাবু। বললেন—তোমাদের রেজাল্ট কবে বেরুবে?

বাসনা কিছু বলবার আগেই হাতের কাগজখানা দেখিয়ে বলল গায়ত্রী, রেজাল্ট বলতেই তো এসেছে। সবচাইতে বেশী মার্কস পেয়ে ফোর্থ ইয়ারে উঠল। অনার্স পেপারে ৭০% মার্কস পেয়েছে। দুখানা মার্কশীট মন্মথবাবুর হাতে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করল গায়ত্রী। বল্ল—আমি অনার্স পেয়েছি তবে একবারে কাঁটায় কাঁটায়।

সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন মন্মথবাবু—তা হোক। তুমি তো শরীর খারাপ নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলে। পাশ করেছ এতেই আমি খুশী। কাগজ দুখানি হাতে নিয়ে অন্দর মহলে যেতে যেতে বললেন—বলি শুনছ নাকি! আমার ছাতাটা দাওতো। আমার দুই মা পাশ করেছে। বিশেষ করে আমার সোনা মা তো ফার্স্ট হয়েছে। আমি সকলকে মিষ্টি খাওয়াব।

—আমিও তাই ভাবছিলাম তুমি বাজার থেকে এলে বলব।—উত্তর দিলেন মলিনা দেবী।

সামনেই ঝুলছিল ছাতা। হাতে নিয়ে বললেন—তোমরা বসো। আমি রসগোল্লা নিয়ে আসি। সকলেমিলে আনন্দ করতে হবে। বাজারের পথে বেরিয়ে গেলেন মন্মথবাবু।

গল্পের ফাঁকে গায়ত্রী গেছিল বাসনার জন্য মিষ্টি দেয়া লেবুর জল আনতে। শরবত হাতে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল গায়ত্রী। দেখল, বাসনা দেয়ালে ঝুলান তার বাবা ও মার যুগল ছবির দিকে অপলক চাহনীতে চেয়ে আছে। তার দুচোখের পাতা ছাপিয়ে উপছে পড়ছে চোখের জল।

সন্তর্পণে বাসনার পেছনে এসে দাঁড়াল গায়ত্রী। আস্তে করে ডাকল, বাসু! কি হয়েছে রে?

বিস্মিত গায়ত্রী! পাঠশালা থেকে একসঙ্গে পড়াশোনা খেলাধুলা করছে দুজনে। কিন্তু হাসিখেলা, নাচেগানে-মসগুল বাসনার বুকে যে এত ব্যথা আছে তা তো বুঝতে পারেনি কোনদিন!

গায়ত্রীর স্পর্শে ফিরে দাঁড়াল বাসনা। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, তোরা ভাগ্যবতী। এমন বাবা-মা পেয়েছিস। মা-বাবা থেকেও মনে হয় না যে, বাবা মা আছে।

সান্ত্বনা দিয়ে বলল্ গায়ত্রী, না না! জ্যেঠিমা জেঠু কত ভালবাসেন তোকে।

একনিঃশ্বাসে শরবত শেষ ক'রে বল্ল বাসনা,—কিন্তু মার ভালবাসার উষ্ণতা কোনদিন অন্তরকে স্পর্শ করে নি। শুখনো কর্ত্তব্য করেছে মাত্র। আর সবচাইতে বিশ্রী লাগে বাবার সঙ্গে মার ব্যবহারে। যেমন মা, তেমনই আমার বাবা। দুইই সমান। মা যখন মনের ঝাল ঝাড়তে ঝাড়তে ভাতের থালা বাবার সামনে ছুঁড়ে দেন তখন মাকে আর মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করে না। আবার বাবা যখন মাকে গালাগালি দেন, অপমানজনক কথা বলেন, কিম্বা মাকে মারতে ওঠেন তখন সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপরে ঘৃণায় মন বিষিয়ে ওঠে।

যুগল ছবির দিকে আবার চাইল বাসনা। বলল্, বাবা কোন দিন আমায় 'মা' ব'লে ডেকেছেন বলে মনে পড়ে না। কোলের কাছে নিয়ে আদর করা তো স্বপ্নেও দেখিনি। প্রত্যেকটি পরীক্ষায় কত ভাল রেজাল্ট করেছি। কত

আনন্দ করে বলতে গেছি। বাবা বলে উঠেছেন—তাতে আর লাফানর কি আছে! তুই বুঝবি না গাতু আমার বুকে কি জ্বালা।

একটু নীরব থেকে বলল বাসনা, আমার যখন যা প্রয়োজন, বাবা তা এনে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যখন দেখি বাবার ব্যবহারে মা নীরবে চোখের জল ফেলেছেন তখন মন আমার বিষিয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে, একদিন পালিয়ে যাব কোথাও!

গেলও সে চ'লে। ঠিক ছ'মাস পরে ঘটল ঘটনা।

একদিন রাত্রের অন্ধকারে কালিবাবু এসে হাঁপিয়ে পড়লেন গায়ত্রীদের বাড়ীতে। বললেন, বাসনাকে পাওয়া যাচ্ছে না আজ সকাল থেকে। একটু দম নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বলতে লাগলেন, সকালে চা খেতে আসে না দেখে, ওর মা ডাকতে গিয়ে দেখে ঘরে নেই। সামনের দরজা বন্ধ। পেছনের দরজার খিল খোলা। খবর পেয়ে আমি সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করেছি। ওর মা বলছিল গতরাত্রে ওর, মার সঙ্গে নাকি কি নিয়ে কথাকাটাকাটি হয়েছিল। ভাবলাম, মার ওপরে রাগ করে ভোরে যদি এখানে চলে এসে থাকে!

ব্যথিত হল গায়ত্রী। বলল, গত ছুদিন কলেজে যাইনি। কলেজে দেখা হলে হয়তো জানতে পারতাম।

জানতে সে পারল পরদিন কলেজে রেণুকার কাছে। ঐ হাউসিং কম্প্লেক্সের কেয়ার টেকারের ছেলের সঙ্গে রেজিষ্ট্রী করে চলে গেছে রাজস্থানে। সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের শিক্ষিতা মেয়ে বেরিয়ে গেল কৈবর্ত্ত দারোয়ানের মুর্খ ছেলের সঙ্গে। ছিঃ ছিঃ। বেদনাহত বুকে ভাবতে লাগল গায়ত্রী, বর্ণে, বংশে, বিদ্যা, পদমর্য্যাদায়—কোনদিক থেকে যার সঙ্গে মেলে না, তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল বাসনার মত বিজ্ঞানের ছাত্রী? তার প্রজনন বিজ্ঞানের ওপরে পরীক্ষামূলক প্রবন্ধ উচ্ছ্বসিত প্রসংশা পেয়েছে অধ্যাপকদের কাছে। বিশেষ করে অ্যান্ডসেসিয়ান কুকুর, অস্ট্রেলিয়ান মুরগী ও রাজ গাঁদা ফুলের পরীক্ষা তো বিস্ময় সৃষ্টি করেছে সবার মনে! যে বিশেষ ভাবে প্রমান করল, 'মেল' (পুরুষ) যদি ফিমেল (নারী) অপেক্ষা লেচ কালচার্ড ও লোয়ার হেরেডিটি ওয়ালা হয় তবে তাদের মিলনে যে জীবনের আবির্ভাব ঘটে তা অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, ও উৎকৃষ্ট গুণাবলীর পরিধ্বংসী হবেই। সেই কি না বিয়ে করল শূদ্রের ছেলেকে! তবে কি জৈবিক ক্ষুধা মেটাবার জন্য একাজ করল? ভেবে কুল পায় না গায়ত্রী।

কুল সে পেল ছমাস পরে বাসনার চিঠি পেয়ে। বাসনা চিঠি লিখেছে রাজস্থান থেকে। চিঠিখানার বেশীর ভাগই ভরে আছে কালিবাবুর আর দামিণী দেবীর দাম্পত্য কলহের কাহিনীতে। শেষে লিখেছে, অনেক চেষ্টা করেও মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা আনতে পারলাম না; বিশেষ করে বাবার প্রতি বিদ্বেষ বাড়তে লাগল দিন দিন। অথচ অন্তর ক্ষুধার্ত হয়ে উঠল ভালবাসা পাবার জন্য। তুই তো জানিস কত বড়লোকের ছেলেও বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফিরে গেছে আমার কাছ থেকে। বিশ্বাস করতে পারি নি কাওকে। শেষে মায়া হল আমাদেরই দারোয়ানের ছেলেটার ওপরে। এর অর্থসম্পদ, মান-মর্যাদা বা ডিগ্রী নেই বটে; কিন্তু অন্তর আছে। গত পাঁচবছরে যেটুকু ভালবাসা সে প্রকাশ করেছে তা নিঃস্বার্থ ও নির্ভেজাল বলে মনে হয়েছে। আমার বিক্ষিপ্ত মনে ঐটুকু খাঁটি ভালবাসাই যথেষ্ট মনে ক'রে তার জীবনের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিয়ে অজানা অনিশ্চয়তার বুকে ঝাঁপ দিয়েছি।

কিন্তু গাতু! আজ বুঝতে পারছি, আমি কি ভুল করেছি! এ যেন ফ্রাইং প্যান থেকে ফার্নেসে ঝাঁপ দিয়েছি। আর তো ফেরার পথ নেই ভাই! মা হতে চলেছি যে। এ কলঙ্কের চিহ্ন বুকে নিয়ে তোদের কাছে মুখ দেখাব কি করে?

চিঠি পড়া শেষ করে চেয়ে রইল টেবিলে রাখা তার পাশে দাঁড়ান বাসনার ছবির দিকে। অন্তরেব আবেগ সামলাতে না পেরে বালিশে মুখ গুঁজে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল গায়ত্রী, বাসু তুই এতবড় ভুল করলি কেমন করে?

এমন ভুল করবে না বলেই ঠিক করেছিল খুকু।

খুকু খাস্তগীর। বাপ মায়ের প্রথম সন্তান। তার পরে দুটি ভাই। খুকুর বয়স তেইশ বছর। ফর্সা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী। চোখে ও চেহারায় যেন যৌবনের ঢল নেমেছে। বি. এসসি পরীক্ষায় বসবে আর কটা মাস পরে।

খুকুর বাবা সরকারী সংস্থায় মোটা মাইনার চাকুরী করেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আমার মাধ্যমে সৎনামে দীক্ষিত। দক্ষিণ কলিকাতার উপকণ্ঠে বাড়ী করেছেন বছর বার আগে। বার বার অনুরোধ করেছেন তাঁদের বাড়ী যেতে। সুযোগ হল দীর্ঘ এগার বছর পরে।

আমার থাকবার ব্যবস্থা দোতলায়—দু নম্বর ঘরে। এক নম্বরে আমার সহকারী আস্তানা করে নিয়েছে। তার ভাব জমে উঠেছে খুকুর ভাই দুজনের সাথে। তিনজনের বয়স প্রায় কাছাকাছি।

আমার জন্য খুকুর ব্যস্ততার অন্ত নেই। ভোরে বেড্-টী দেয়া থেকে শুরু হয় জেঠুর জন্য খুকুর তৎপরতা। তারপর সময় পারম্পর্য্যে যোগান দেয় স্নানার জোগাড়, জলযোগ ও নৈশ ভোজের ব্যবস্থাপনায়। শুধু কি তাই রাত্রের খাবার পর বিছানায় মশারী খাটিয়ে, এক গ্লাস জল মাথার কাছে ঢেকে রেখে দাঁড়িয়ে থাকে নাইট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়ে। ফিরে যায় যখন জেঠুর নাকডাকার শব্দে বুঝতে পারে ঘুম এসে গেছে। মা যেমন তার বাচ্চার প্রয়োজনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, তেমনই খুকু নজর রেখেছে তার প্রথম পরিচিত জেঠুর প্রয়োজনের ওপরে।

নিজের প্রয়োজনের কথা বলবার জন্য খুকু যে সুযোগ খুঁজছিল তা বুঝতে পারলাম তাদের বাড়ী থেকে চলে আসবার আগের দিন রাত্রে যখন সে ঘুম পাড়ানির অছিলায় জাগিয়ে রাখল আমাকে। বলল, জেঠু! তোমার সঙ্গে আমার কত কথা ছিল। কিন্তু সব সময় তোমার কাছে লোক। কাল দুপুরেই তো পালাবে। কখন বলব বল ?

বালিশ থেকে মুখ তুলে বললাম, বল মা! এখনই বল।

মশারীর কোনাটা তোষকের তলে গুঁজে দিয়ে বলল, আচ্ছা জেঠু! মেয়েরা কি বিয়ে না ক'রে সৎভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে না ?

আমি বললাম,—কেন পারবে না মা। ভগিনী নিবেদিতা কি পারেন নি ? মীরাবাঈ-এর বিয়ে হয়েছিল নামে মাত্র। তবে সাধারণতঃ বিয়ে করাই ভাল ?

খুকুর চোখের কোন দুটি চক্ চক্ ক'রে উঠল। কয়েক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল আমার হাতের ওপরে। হাতের জল হাত দিয়ে মুছে নিয়ে বলল খুকু, কোন পুরুষকেই স্বামী হিসেবে বিশ্বাস করতে পারি না। সারাজীবন ধরে দেখলাম মা ও মাসী দুজনেই অসুখী। বাবাকে নিয়ে মা, মেসোকে নিয়ে মাসী কোন দিন সুখ পেলেন না। কেন কি জন্য, তা বুঝি নি। তবে তাঁরা চোখের জল ফেলেন নি, এমন দিন খুব কমই দেখেছি। তাই মনে হয় বিয়ে করাটা পাপ।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আমার পাগলী মা! তুমি না বিজ্ঞানের ছাত্রী! রোগ থাকলেই যে, তার প্রতিষেধক থাকতে পারে তা কি জান না ? একটু চুপ করে বললাম, তোমার আমবাগানে একটা কি, দুটো গাছে পোকা লেগেছে বলে কি, আর সব আম গাছ কেটে ফেলে দেবে, না আর কোন গাছে পোকা না লাগে তার ব্যবস্থা করবে ?

খুকু নিরুত্তর। তবে কি বলতে চাই তা যে, সে বুঝেছে তা নীরবে জানিয়ে দিল।

কিন্তু খুকুর বাবা-মা জানতেন না, তাঁদের একমাত্র মেয়ে বিয়েতে নারাজ কেন! রওনা হবার দিন খুকুর বাবা জানালেন, দাদা খুকুকে এত অ্যাকটিভ দেখি নি কোনদিন। এক পা চলে তো দুপায়ে দাঁড়ায়। সেই মেয়ে ভোর থেকে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত সমানে খেটে চলেছে। আপ:ন এসে ওর জীবনের একটা বিরাট দিক খুলে দিয়ে গেলেন।

পাশের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন খুকুর মা। চকিতে চারিদিক দেখে নিল, খুকু আসছে কি না! বললেন দাদা! মেয়েকে নিয়ে তো মহাসমস্যায় পড়েছি। যত ভাল পাত্রের সঙ্গেই সম্বন্ধ করি খুকু ততই বেঁকে বসে। বলে, 'আমি বিয়ে করব না।'

খুকুর বাবা বললেন,—বিয়ের কথা বললেই কেমন বিরক্ত বোধ করে।

মা বললেন, অথচ অন্য কোন ছেলের সঙ্গে ওর যে ভাব-ভালবাসা আছে, তাও বুঝতে পারি না। প্রকাশও করে না কিছু!

দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললেন খুকুর বাবা, মেয়ে আমার সবদিক থেকে ভাল। কিন্তু বিয়ের কথা বললেই তেলে বেগুণে জ্বলে ওঠে। ওর মার সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু ক'রে। কি করি বলুন তো দাদা।

বলবার তো অনেক কথাই ছিল। কিন্তু কথান্তরে সময় যাবে বয়ে। সংক্ষেপে বললাম, মা ও বাবার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের তিক্ততা মেয়ের একাগ্র সম্বেগকে নিস্তেজ করে তোলে। বিবাহিত জীবনের ওপরে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে বহু মেয়ের মনে।

কাতর কণ্ঠে বললেন খুকুর বাবা, ভুলতো করে ফেলেছি অনেক। এখন উপায় কি?

খুকুর মায়ের চোখেও অসহায় চাহনী। বললেন, যা দিনকাল পড়েছে তাতে বয়স্থা মেয়েকে তো, ঘরে রাখাই দায়।

ঈশারায় দুজনকে আরও কাছে ডেকে বললাম, শত-বছরের অন্ধকার দেশলাই কাঠির মুহূর্তের আলোতে দূর হয় কি না?

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ধরাগলায় বললেন, হ্যাঁ তা হয়!

ভরসা দিয়ে বললাম, এ সমস্যাও দূর হবে। রাতারাতি স্বামী-স্ত্রীর তিক্ত সম্পর্ক ধুয়ে মুছে প্রীতির বাঁধনে একে অপরকে আপন করে নিয়ে চলুন। মেয়ে

যেন বুঝতে পারে বাবার সোহাগের ফাগে মায়ের ফাঁকা বুক ভরে আছে। নিশ্চয় সে বিয়ে করতে রাজী হবে।

মা-বাবার মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির বাঁধন মজবুত থাকলেও বাপের ওপরে মেয়ের ভালবাসার টান যে কেটে যায় তার উদাহরণও কি কম ?

কাশীপুরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাষণ শেষে আলাপ করছিলাম ছাত্রীদের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবাকে যে-

মাত্রাধিক শাসন

আমি কিছুতেই ভালবাসতে পারি না। তাঁর খাই, তাঁরই পরি- অথচ এতটুকু টান নেই বাবার ওপরে। কেন বলতে পারেন ?

মেয়েটির নাম করুণা। বাড়ী বরানগরে। সংসারে আছেন বাবা, মা, দুই বোন আর এক ভাই। করুণাই সবার বড়। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে আর ক'মাস পরে।

কিন্তু মন বসাতে পারে না পড়াশোনায়। পড়তে বসলেই মনে পড়ে যায় বাবার শাসনের কথা। পান থেকে চুন খসলেই কড়া শাসন। কবিতায় পড়েছিল, 'শাসন করা তারই সাজে

সোহাগ করে যে।'

সোহাগের কথা উঠলেই হাসি পায় করুণার। হারাধন মাষ্টারের মন্তব্য মনে পড়ে যায়। করুণা তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। শ্রুতি লিখন লিখতে দিয়েছিলেন মাস্টার মশাই। 'সোহাগা' শব্দের 'আ-কার' ছাড় পড়েছিল তিনবার। তিরিশবার লেখালেন ঐ বানানটি। ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, খুব বুঝি বাপের সোহাগ খাও, তাই না ? তাই খাতায় এত সোহাগের ছড়াছড়ি !

কিন্তু মাস্টারমশাই যদি একবার বাড়ীতে আসতেন, তাহলে দেখতেন— বাপ মেয়েতে কত ছাড়াছাড়ি। বলল্ করুণা, বাবা বকলে বা মারলে কষ্ট হতো না, যদি কোন অপরাধ করতাম। বিনা অপরাধে এমন শাস্তি দেন, তখন মনে হয়, বাবা মরে গেলেই ভাল হতো ! অমনি আঁতকে ওঠে বুকের বুকের মধ্যে। মা বিধবা হবেন ! ছিঃ ছিঃ ! এমন অশুভ চিন্তা ! অনুতপ্ত হই। চেষ্টা করি বাবাকে ভালবাসবার। দু-চার দিন বেশ ভালই কাটে। মনটা নরম হয়ে আসে। কিন্তু আবার এমন ধাক্কা খাই, ছিটকে পড়ি বহু দূরে।

সেদিন বাজারে বেরুচ্ছেন বাবা। পড়ছিলাম পাশের ঘরে। বাবা ডেকে বললেন, তুবালতি জল রৌদ্রে রেখে দিস, এসে স্নান করব !

তক্ষুণি উঠে গেলাম কলতলে। দেখি ঝি বাসন মাজছে, সারা কলতলা জুড়ে। এঁটো নোংরা চারদিকে ছড়ান ছিটান। ভাবলাম, ঝির কাজ সারা হলে জল ধরে রাখব রোদ্দুরে।

কিন্তু ধরে নিয়ে গেল আমার বান্ধবী, পাশের বাড়ীর রেবা। সন্ধ্যায় সত্যনারায়ণের পূজো হবে তাদের বাড়ীতে। আল্পনা দেবার জন্য আবদার করল রেবার ছোট বোন মঙ্গলা। আল্পনা শেষ হতেই মনে পড়ে গেল, এই যা! জলতো রোদ্দুরে রাখা হয় নি। অমনি ছুট দিলাম বাড়ীর দিকে। বাড়ী ঢুকতেই বাবার সামনে পড়ে গেলাম। বাজার থেকে ফিরে রোদ্দুরে জল না দেখে বাবা যে তেলে বেগুনে জ্বলেছেন তা কি ছাই জানি? এক পসলা হয়ে গেছে মার ওপরে। বজ্রপাত হল আমার মাথায়। চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, দূর হয়ে যা বাড়ী থেকে। বাবার একটা কথাও মনে লাগে না? শুধু খেলা, আর পাড়ায় টো টো ক'রে বেড়ান?

চোখের পাতা দুটো ছলছল ক'রে উঠল করুণার। চোখ মুছতে মুছতে বলল, বকলেন বা মারলেন বলে আমার দুঃখ হয় না। দুঃখ যে বাবা আমার মন বুঝবার চেষ্টা করেন না এতটুকু। একবার জিজ্ঞাসা করলেন না, জল কেন রাখিনি। আমার ভুল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বাবার জন্য কিছু করব না, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আপনিই বলুন, ভুলের মাশুল আর অপরাধের শাস্তি কি সমান?

সমান নয় বলেই তো আমরা বাবারা ব্যবহারে সাম্য হারিয়ে ফেলি। আমরা অনেক সময় ছেলেমেয়েকে এমন দণ্ড দেই যা তুলাদণ্ডে ওঠালে আমাদের অজ্ঞতার পাল্লাই যে নিচের দিকে ঝুঁকবে তা কি খেয়াল রাখি? খেতে, শুতে, উঠতে, বসতে, ছেলেকে রাতারাতি মডেল বানাতে চেষ্টা করি। তাই তারা শাসনের সাঁড়াশি থেকে ছাড় পায় না কখনও। তাই বিধিও ছাড়েন না। অত্যধিক শাসন, বিশেষ করে মেয়ের অন্তরে যে পিতৃভীতির সৃষ্টি করে, তা তাকে সঙ্কুচিত করে তোলে। ফলে মেয়ের একাগ্র সম্বেগ ম্লান ও দুর্বল হয়ে ওঠে। বাবার সাহচর্যে তাদের যেন দম বন্ধের মত অবস্থা হয়। বাবা বাড়ী এলে তাদের হাসি, হুল্লোড়, গল্পগান, প্রাণ চাঞ্চল্যের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি যায় থেমে। অনেক মেয়ে মন্তব্য করেছে, বাবা যতক্ষণ বাইরে থাকেন বেশ ভাল থাকি। বাড়ী এলেই মনে হয় খাঁচায় বন্দী।

এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য অনেক মেয়ে দিন গণনা করে, আর বলে—কবে যে বাবার হাত থেকে মুক্তি পাব, তাই ভাবি!

স্বাধীনতা হরণ

চমকে উঠলাম, চামেলীর কথা শুনে। বিবাহের পরদিন শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় সাধারণতঃ কান্নার বর্ষানামে মেয়েদের চোখে। সেই মেয়ে-কুলে বাবার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়, এমন মেয়ে যে আছে, তা আগে জানা ছিল না। তবে কি চামেলী অতিমাত্রায় পরাধীন?

স্বাধীনতার দিনে [১৫ই আগষ্ট] রিক্সাতে আমার পাশে বসে যাচ্ছিল চামেলী। আঠার পেরিয়ে উনিশে পা দিয়েছে এই শ্রাবণে। কশবা বালিকা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী। দশদিক সামাল দেবার মত ধী ও উপস্থিত বুদ্ধি তার যথেষ্ঠ। নিটোল স্বাস্থ্য। রূপলাবণ্যে বিশ্বসুন্দরীর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে না পারলেও পনের টাকা মুকুব করাতে পারবে বিয়ের বাজারে। আমি তাকে আদর ক'রে ডাকি লেডি ব্রাউন বলে। কখনও নূতন মামনিও বলি। তাই বিস্মিত হয়ে বললাম—নূতন কথা শুনছি তোমার মুখে।

আমার ডানহাত খানা চেপে ধরল চামেলী। করুণ চোখে চেয়ে বলল, ভাবি বাবাকে ভালবাসব। ভক্তি করব। কিন্তু পারি না। বুকটার মধ্যে জ্বলে যায়। কিছুতেই আপন ভাবতে পারিনা বাবাকে।

সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? বাবা কি তোমায় বকেন না শাসন করেন?

রিক্সার চাকায় তার শাড়ির আঁচল পাক খাচ্ছে কিনা তা দেখে নিল্। বল্ল, বাবা স্বাধীনতা দেন না এতটুকু! কোন কিছুই নিজের ইচ্ছামত করতে পারিনা। এমনকি শাড়ি ব্লাউজ টিপ ম্যাচ্ করে পরতে দেখলেও বাবা ক্ষেপে যান। এমন মন্তব্য করেন যে ঘৃণায় মন ভরে ওঠে।

চামেলীর মন যে ঘৃণায় ভরে আছে তা বুঝতে পারি নি। তবে তার মেজাজ যে বিগড়ে আছে তা গতকাল ট্যাক্সী থেকে নেমেই টের পেয়েছি।

ঘরে ঢুকতেই নূতন মামনির ছোট ভাই লাট্টু এসে তার বি. বি. সির মুখ খুলে দিল। বলল্, জেঠু! দিদি আজ সারাদিন খায় নি। রাগ করে—। আর আওয়াজ নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে 'বেতার' যেমন হঠাৎ বেকার হয়ে পড়ে ঠিক তেমনই বোবা ব'নে গেল লাট্টু। পেছন ফিরে দেখি লাট্টুর মা লাল চোখে চেয়ে আছেন তার দিকে। পাড়ায় বা ঘরে, যেখানে যাই কিছু

ঘটুক না! কেন, তার প্রথম খবরটা লাট্টুর মুখে। তাই তাকে অনেকেই ডাকে বি. বি. সি ব'লে।

চামেলী আমার পাঞ্জাবী থেকে বোতাম সেট খুলছিল। বললাম, পাঞ্জাবী পরে গোছালেও হবে। তুমি আগে খেয়ে এস মা।

অভিমানের সুরে বলল চামেলী, তুমি আমায় কিছু বলো না জেঠু। আমি খাব না।

তবে চল্ যাই। ফিরে যাব এখুনি।—সহকারীকে ইঙ্গিত করতেই সে 'হোল্ড-অল' বের করে ফেলল্ বারান্দায়।

বেগতিক দেখল চামেলী। চার বছর যাবৎ অনুরোধ করবার পর জেঠু এসেছেন আজ। তিনি চলে যাবেন! ভাবতে পারেনা চামেলী। বলল, না, না! তুমি যেও না; জেঠু। আমি এক্ষুণি খেয়ে আসছি।—চলে গেল রান্নাঘরে।

কি হয়েছে চামেলীর? তাব মাকে জিজ্ঞাসা করলাম। চামেলীর মা সংক্ষেপে বললেন মেয়ের রাগের কাহিনী:

গতকাল তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বালিগঞ্জে ধর্মসভায় ভাষণ শুনতে গেছিলেন। চামেলী তার ছোট দুই ভাইকে নিয়ে ছিল বাড়ী পাহারায়। সন্ধ্যার একটু আগে প্রমিলা এসে জানাল যে তাদের বাড়ীর সামনের মাঠে সিনেমা হবে—রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যা।

মনতো নেচে উঠল তিন কন্যা দেখবার জন্য। কিন্তু মনে বড় ভয় হল, যদি বাবা এসে বকেন? সাহস জোগাল বিবিসির বায়না। লাট্টু এমন বায়না ধরল যে তা এড়ান দায় হয়ে পড়ল চামেলীর। একেবারে 'না' বললে লাট্টুর ঘাড়ে ভুত চাপতে দেরি লাগবে না। আব সে ভুত নামাতে পারে এমন ওঝা ভূভারতে নেই। মায়ের হাতের গরম খুন্তির স্যাঁকা খাওয়ার ভয়ই একমাত্র দাওয়াই। তাই বলল,—রান্নাবাড়া তো হোক। তার পর দেখা যাবে।

রান্না শেষ না হতেই সিনেমা দেখতে যাবার জন্য জিদ্ ধরল লাট্টু। তার সঙ্গে তাল দিল মেজভাই চঞ্চল। সেও প্যান্ট-জামা পরে চঞ্চল হয়ে উঠল সিনেমা দেখবার জন্য।

অগত্যা তিন ভাই-বোন খেয়ে নিয়ে মা ও বাবার রাত্রের খাবার ঢেকে রাখল পরিপাটি করে। দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চামেলী। ভাবল, দোষটা লাট্টুর ওপরেই চাপিয়ে দেয়া যাবে।

রাত্রি সাড়ে নটায় ফিরে এলেন চামেলীর বাবা ও মা। ঘরে তালা বন্ধ। ডেকে সাড়া পেলেন না। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন চামেলীর বাবা। হাঁক ডাক শুনে ডাক দিলেন পাশের বাড়ীর দক্ষিণাবাবুর মা। বললেন, কে বাবা ভোলানাথ? চামেলী চাবি আমার কাছে রেখে গেছে। ওরা তিনজনে একটু সিনেমা দেখতে গেছে সেনদের বাড়ীর সামনের মাঠে।

সিনেমায় গেছে? গর্জন করে উঠলেন ভোলানাথবাবু। জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে, চাবির ছড়া হাতে নিলেন দক্ষিণাবাবুর মায়ের কাছ থেকে। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, আসুক বাড়ী। সিনেমা দেখা ভাল ক'রে দেখিয়ে দেব।

ভোলানাথবাবুর মনটাকে নরম করার জন্ম বললেন বৃদ্ধা—আমাদের বাড়ীর ওরাও গেছে। বই নাকি খুব ভাল।

বৃদ্ধার কথায় কান দিলেন না ভোলানাথবাবু। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন গজগজ করতে করতে।

স্বামী-স্ত্রী নৈশ ভোজ সমাধা করলেন মুখোমুখি বসে। হাত-মুখ ধুয়ে ভোলানাথবাবু সবে বসেছেন বজ্রাসনে। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকেছে চামেলী ভাইদুটিকে নিয়ে। লোডসেডিং না হলে অনেক আগেই চলে আসত। আশঙ্কায় দুরদুর করছে চামেলীর বুক। ভাবছে বাবাকে বুঝিয়ে বলবে সব কথা। বাবা খুশী থাকলে অন্ততঃ এক কন্যার কাহিনী শোনাবে বাবাকে। কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। বজ্রাসনে বসেই বজ্রপাতের মত ঘরবাড়ী কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ভোলানাথবাবু, দূর হয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। যে পথে এসেছ সেই পথেই বেরিয়ে যাও। এত বড় স্পর্দ্ধা! কার হুকুমে গেছিলে মাঠের ঐ বারোয়ারি সিনেমা দেখতে?

হুকুমে গেছে না লাট্টুর লাটাই-এর মত পাক খেতে খেতে গেছে তা বলবার সুযোগ কোথায়? আর শুনছেই বা কে? অটোমেটিক মেশিনগানের মুখ থেকে আগুনের গোলার মত গরম গালাগালি বেরিয়ে এল ভোলানাথবাবুর মুখ থেকে। তার পর সব চুপ! পায়ের দিকের জানালাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। শুধু শোনা গেল, কাল থেকে গেলা [খাওয়া] বন্ধ। চামেলীও নীরবে শুয়ে পড়ল পাশের ঘরে।

পরদিন সকালবেলা। মর্নিং স্কুল। চামেলী প্রায়ই না খেয়ে স্কুলে যায়। এটা যে তার স্বভাব তা নয়। অভ্যাস হয়ে গেছে অভাবের আশীর্বাদে। কারণ এবাড়ীর রেওয়াজ বড়ই বিচিত্র। সকালে দুমুঠো মুড়ি, অথবা ছোলা-

ভাজা, না হয় দু-পিস পাঁউরুটির সঙ্গে এক পেয়ালা চা, প্রত্যেকের ব্রেকফাস্টের বরাদ্দ। তাতে আপত্তি বা অভিযোগ করে না কেউ। কারণ, চায়ে চুমুক দিয়ে তিন ভাই-বোনই আত্মপ্রসাদ লাভ করত—বুঝি বড় হয়ে গেছি। তা নাহলে কি বাবা চা বরাদ্দ করতেন? কৈ কৈলাশ, ঝণ্টু, ভুতু—এদের বাড়ীতে তো বাচ্চাদের চা দেয় না। কিন্তু এই ব্রেকফাস্টের সামগ্রী কোনদিনই আগের দিনে ঘরে আসে না। রোজ সকালে টাটকা খাবার ব্যবস্থা।

আজকেও না খেয়ে যেত চামেলী। কিন্তু প্রাকটিক্যাল ক্লাস আছে। ব্যাঙ্ কাটতে দেরি হয়ে যাবে। না খেয়ে সে থাকতে পারে ঠিকই। তবে বেলা দশটা পার হলে দশদিক অন্ধকার দেখে। পেটে চিন্ চিন্ ব্যথাও অনুভব করে। তাই বাবার কথা গায়ে না মেখে রান্নাঘরে যেয়ে মাকে বল্‌ল, মা! আজতো ফিরতে দেরি হবে—দুটো মুড়ি দেবে?

মা-ও বাবার কথার ওপরে কথা বলতে পারেন না। মুড়ি দেবেন কোন্ সাহসে। বললেন, বাবার কাছে যেয়ে বলগে।

গুটিগুটি এগিয়ে গেল চামেলী। বাবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলল, বাবা—দুটি মুড়ি খেয়ে যাব? বাড়ী ফিরতে বারটা বাজবে।

ভোলানাথ বাবু দাড়ি কাটছিলেন। সাবান মাখা কোলা মুখখানা আর একটু ফুলিয়ে বলে উঠলেন, না! তোমার মত মেয়ের না খেয়েই যাওয়া উচিত!

ভোলানাথবাবু হয়তো ভাবছিলেন—ভয় দেখালে মেয়ে কাবু হবে। তখন দয়া দেখিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন, 'আর এমন করব না।' কিন্তু চেয়ে দেখেন মেয়ে ততক্ষণে সড়ক ধরে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। স্কুল থেকে ফিরে এসেও সে খেতে চায় নি। মা দু-একবার 'খেয়ে নেগে' ব'লে নিয়ম রক্ষা করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি।

নিবিষ্ট মনে শুনছিলাম চামেলীর না খাওয়ার পটভূমি। ভোলানাথবাবুর সাবান জড়ান কোলা মুখের 'না' তখনও আমার অন্তরের ছোট্ট বাৎসল্য সরোবরে আছড়ে পড়ছে। মনে হতে লাগল, আহা কত আশা ক'রে খেতে চেয়েছিল চামেলী। অমন কড়া ভাষায় বললেন ভোলানাথবাবু! তিনি কি ভুলে গেলেন যে শুধু শাসন ক'রে শুধরান যায় না কাউকে। কে না জানে,—

"কাউকে যদি বলিস কিছু
সংশোধনের তরে
গোপনে তারে বুঝিয়ে বলিস
সমবেদনা ভরে।"

গত রাত্রে নাহয় রাগের মাথায় রাগ করেছিলেন ভোলানাথবাবু! অনেক বাবাই তা করে থাকেন! কিন্তু আজ সকালে তো অনুরাগের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে মেয়ের মুখখানা দেখতে পারতেন। দেখলেই বুঝতে পারতেন, তার পাংশুটে মুখচ্ছবির অন্তরালে কতখানি ভীতি লুকান আছে। কাছে ডেকে নিয়ে যদি বলতেন, তুমি ঐভাবে সিনেমায় যাওয়াতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। বই তো ভাল। কিন্তু বারোয়ারি মাঠেব পরিবেশ কখন্ খারাপ হয়ে পড়ে, কোন্ হুল্লোড বেধে যায় তা কে বলতে পারে? আরও কোলের কাছে টেনে নিয়ে যদি বলতেন, লক্ষ্মী মা আমার! এমন কাজ আর করো না। কেমন? যাও খেয়ে নাওগে! তাহলে দেখতে পেতেন কতবড দীর্ঘশ্বাস মেযের বুকের পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। বাবার ওপরে বীতরাগ হতো না চামেলী। বরং নিজেকে সংশোধন করবার সিদ্ধান্তে সবল হয়ে উঠত সে।

চামেলী যে এতক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে তা খেয়াল করিনি। আনমনে ভাবছিলাম, বাবার কোন্ ব্যবহারে মেয়ে কেমন হয়ে যায়। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললাম, শোন্ পাগলী, শাস্ত্রে কি বলেছেন! শাস্ত্রে আছে, মা বা বাবা যদি একবার ছেলে মেয়েকে মারেন বা বকেন তবে ঐ ছেলেমেয়ের বিশ বছরের পাপ কেটে যায়। তোব বাবা যখন এতবার বকেছেন বা মেবেছেন তখন সব পাপই কেটে গেছে। বরং পুণ্যফল জমা পড়েছে পাওনার ঘরে।

কথা শুনে হেসে উঠল চামেলী। ভাবল, ঠাট্টা করছি। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের কোনা মুছে নিয়ে বলল—বাবার সাথে কেমন ভাবে চলব জেঠু?

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, যাকে ভাল বাসতে চাও তার মন বুঝে চলবে। আর বিনয়ের সঙ্গে নিজের মত প্রকাশ করবে। ঝাঁঝাল স্বরে ন্যায় বললেও দুজনের মধ্যে তিক্ততা যায় বেড়ে।

কিন্তু সবসময় ঝাঁঝ কমিয়ে রাখা যায় না। বিশেষ করে সেন্টিমেন্টে আঘাত খেলে অনেকেরই ঝাঁঝাল স্বরে কথা বেরিয়ে আসে।

সেন্টিমেন্ট আহত হয়

প্রাইভেট কথা বলতে এসেছিল ঝাড়গ্রামের অরুণা। শহরের উপকণ্ঠে

তাদের বাড়ী। বাবা সাবজজ-কোর্টের মহুরী। অরুণা একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। তার বড় দুই দিদি আর ছোট দুই ভাই, এক বোন। অরুণার কাকা, কাকীমা ও খুড়তুতো ভাইবোন শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনামে দীক্ষিত। তারা এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। সেও এসেছে তাদের সঙ্গে। গত পাঁচদিন ধরে প্রতিদিনই সে আসে। কথা বলেনি একদিনও। আমার আলাপ-আলোচনা শুনেই হোক, বা পাঁচজনকে দেখেই হোক, আজ মুখ খুল্‌ল অরুণা। আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে ক'রে বলল্, জেঠু! আপনার কাছে আমার একটা প্রাইভেট কথা বলতে চাই।

উঠে গেলাম পাশের ঘরে। আমার পাশে এসে বসল অরুণা! কিন্তু একটা কথাও বলছে না। শুধু চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে অঝোরে।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, বল মা—কাঁদলে তো কথা বলতে দেরি হয়ে যাবে। আমার মিটিংএ যাবার ডাক এসে যাবে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে বল্‌ল অরুণা, আমার বাবা না, বড় মীন মাইণ্ডেড। বাবাকে এত নীচমনা ভাবতে বড় কষ্ট হয়। এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল কথা কয়টা। আবার ঝরে পড়ল চোখের জল—শ্রাবণের ধারার মত।

বিস্মিত হলাম। বল্‌লাম, বাবা কি মেয়ের কাছে মীন মাইণ্ডেড [নীচমনা] হন?

নিজেকে সমর্থন করতে যেয়ে অরুণার গলার আওয়াজটা বেশ জোরেই বেরিয়ে এল। বলল, জঘন্য সন্দেহ বাতিক। পথে, ঘাটে, কিম্বা বাড়ীতে পরিচিত কোন সমবয়সী ছেলের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই বাবা যা তা বলেন।

বাবা বলেন তোমারই ভালর জন্য। দিন কালতো ভাল না। কোথায় কার পাল্লায় পড়ে বিপন্না হয়ে পড়—তাই!—

এক অসহায় চাহনী অরুণার চোখে। করুণ সুরে বলল, ভালর জন্য বললে তেমন ভাবে বুঝিয়ে বলতেন। চরিত্র নিয়ে এমন কুৎসিত ইঙ্গিত করেন, যা মনে পড়লে মন বিষিয়ে ওঠে। মনে হয় বিষ খেয়ে মরি৷

বাবা কি ধরণের ইঙ্গিত করেন তার একটা উদাহরণ দিতে পার?

অরুণা মুখ নিচু করে বলল, না! সে কথা মুখে—আবার কেঁদে উঠল। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মনে হল, সাগরপ্রমাণ অভিমান ওর বুকের ভেতরে ঘৃণায় ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। কান্না আর থামেনা। বলেও না কোন কথা।

নিরুপায় হয়ে ডাক দিলাম অরুণার কাকার মেয়ে, নিরুপমাকে। দুজনে সমবয়সী, সুখদুঃখের সাথী। একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে দুই বোনে। জিজ্ঞাসা করলাম নিরুপমাকে, কি হয়েছেরে মা। সাম্প্রতিক কোন ঘটনা বলতো—অরুণা তো শুধু কেঁদেই চলেছে।

অরুণার মুখের দিকে তাকাল নিরুপমা। বলল, জ্যাঠামশাই না ভীষণ কড়া। পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই সন্দেহ করেন। যাদের সঙ্গে ছোটবেলায় খেলা করেছি, তারা পথে-ঘাটে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর না দিয়ে কি পারা যায়? আপনিই বলুন!

সেদিন ওর স্কুল থেকে ফিরতে দেরী হয়ে যায়। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিদিমনিরা নাটকের রিহার্সাল দেয়াচ্ছিলেন। আমার শরীর খারাপ হওয়ায় টিফিন পিরিওডে বাড়ী চলে আসি। অরুণা আসে সন্ধ্যের পরে। পাড়ার একটা ছেলে ওকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়। তাই দেখে জ্যাঠামশাই রেগে যান। কুৎসিত ভাষায় গালি দেন। শেষ পর্যন্ত জেঠিমাকে হুকুম দিলেন, "ওর শাড়ি-শায়া—"

আর বলতে পারল না নিরুপমা। ওর চোখ থেকেও, গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা।

বললাম, বুঝেছি মা! আর বলতে হবে না। বুকের মধ্যে কেমন ভারবোঝা মনে হতে লাগল। ভাবতে লাগলাম, কি বলি অরুণাকে।

অরুণা কাতর কণ্ঠে বলল,—জেঠু! আপনি আমাকে আশ্রমে নিয়ে চলুন। ঠাকুর বাড়ীতে বাসন মেজে হলেও, আমি আশ্রমে থাকব।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, মারে! মন খারাপ করো না। কালকে মাকে সঙ্গে নিয়ে এস। ভেবে চিন্তে বলব। আজ আর সময় নেই।

বড় মমতা হল মেয়েটির জন্য। আর মর্ম্মাহত হলাম অরুণার বাবার কথা ভেবে। নিজের মনেই বললাম, বেচারী জানেন না যে, মানুষের সেন্টিমেন্ট আহত করার মত, মানুষকে হারাবার এত সহজ পথ আর নেই!

অনেকে বলতে পারেন, তাই ব'লে কি ছেলেমেয়েকে শাসনকরাও যাবে না? শাসন করলেই যদি সেন্টিমেন্ট আহত হয় তাহলে তো ছেলেমেয়েকে মানুষ করাই দায়।

শাসন না করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শাসন করতে যেয়ে যদি মেয়ের ব্যক্তিত্বই পঙ্গু হয়ে পড়ে, বাপের ওপরে টান ছিঁড়ে যায়, তবে সে শাসনে লাভ কি?

আমরা বাবারা রাগের মাথায় প্রায়ই ছেলেমেয়েকে বলে থাকি, 'বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা।' 'বাপের হোটেলে বসে খেতে খুব মজা!' 'ভাতের বদলে ছাই দেয়া দরকার।' ইত্যাদি। এইসব খোঁচা মারা মন্তব্যের ফল ফলতে দেরি হলেও, একেবারে নিষ্ফলা যায় না। রিটায়ার করবার ছ-মাসের মধ্যে যখন দেখি, বড় ছেলে তার বৌ নিয়ে ভবানীপুরে আলাদা বাসা করল, তখন দোষ দেই বেহাই-এর বাড়ী থেকে বরন করে আনা মেয়েটিকে। চোখ যদি মানুষের ভেতরটা দেখতে পারত তাহলে দেখা যেত, বার বছর বয়সে ছেলের সেন্টিমেণ্টে যে আঘাত দিয়েছিলাম তার ক্ষত তখনও শুখায় নি!

মেয়েদের সেন্টিমেণ্ট আরও সূক্ষ্ম ও সাড়া প্রবণ। ভারতীয় মেয়েরা চরিত্রের কলঙ্ক শুনলে মরমে মরে যায়। বিশেষ করে ঘটনা সত্য না হয়ে যদি রটনা হয়। তাদের অন্তর অস্থির হয়ে ওঠে প্রশ্রয়ের আশায়!

ভালবাসার অভিব্যক্তির অভাব

অন্তর চায় ভালবাসা। ভালবাসাই মানুষের অন্তরের খোরাক।

ভালবাসা ব্যক্ত হয় অভিব্যক্তিতে। অভিব্যক্তিবিহীন কোন ভাবই অন্যের ওপরে প্রভাব ফেলতে পারে না।

ভাব পুষ্ট হয় সমরূপ ভাবের পোষণায়। রাগ বেড়ে যায়, যার ওপরে রাগ হয়েছে তার রাগত ভাবের অভিব্যক্তিতে। পক্ষান্তরে বিপরীত ভাবের সংঘাতে ভাব প্রশমিত হয়—যেমন জল পেলে আগুন যায় নিভে। সাহসের পোষণা পেলে ভীতির ভাব যায় কমে। অর্থাৎ, সাহস যায় বেড়ে।

বাপ-মার প্রতি ছেলে-মেয়েদের সহজাত ভালবাসার টান বেড়ে যায় তাঁদের অন্তরের ভালবাসার বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, সব বাবাই তাদের ছেলেমেয়েকে ভালবাসেন। কিন্তু অবিশ্বাসের বোঝা বেড়ে গেছে মেয়েদের মুখে শুনে শুনে।

এইসব মেয়েদের কাছে 'ভাবও' পেয়েছি দুরকমের। কেউ বলেছে, জেঠু তোমাকে দেখলে বাবার কথা মনে পড়ে। আমার বাবাও ছিলেন ঠিক তোমার মত। খুব ভালবাসতেন আমাকে।

কেউ বলেছে তোমার কাছ থেকে যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি, তাতে আমার তৃষ্ণার্ত্ত বুকখানা ভরে গেছে। এমন স্নেহ, এমন ভালবাসা কোনদিন কারও কাছে পাই নি।

অনেকে আবার লিখেছে, তোমার কাছ থেকে যে স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি,

তেমন স্নেহ ভালবাসা বাবার কাছ থেকেও পাই নি। তাই তোমার কথা মনে হলেই চোখ ভরে আসে জলে।

শত শত মেয়ের প্রায় একই প্রকার স্বীকারোক্তিতে আমার চোখও জলে ভরে উঠেছে। সন্দেহ হয়েছে, একি তাদের মনের কথা? না, মন ভুলান কথা? কিন্তু তাদের আন্তরিকতার স্পর্শ এত গভীর ও জীবন্তভাবে পেয়েছি যে, সন্দেহ করাটাই অস্বাভাবিক। অক্লান্ত সেবা, বিদায়কালে চোখের জল, চিঠির আবেগময় ভাষা ও আমাকে আবার কাছে পাবার আকুল আবেদন—সবটাই যে জীবন্ত বাস্তব। তাই মনে হয়েছে, তবে কি আমি ডাইনীর 'ডিয়ারেষ্ট' কেউ?

প্রবাদ আছে, "মার চেয়ে যে বাসে ভাল, ডাইনি তারে কয়।" তাহলে বাবার চাইতে যে বেশী ভালবাসে তাকে কি বলা হবে? ডাইনীকুলের সর্দ্দার?

এত বড় অপবাদ মেনে নিতে মন চাইল না। তাই শুরু করলাম অনুসন্ধান। সিদ্ধান্তে আসতে বেশী দেরি হল না। যে মেয়েরা বাবার স্নেহ-ভালবাসার অভিব্যক্তিতে ভরপুর তাদের চোখে মুখে তৃপ্তির আভাস সুস্পষ্ট। তারা যে আগ্রহ ও অভিব্যক্তিতে আমাকে আপন করে নিয়েছে তাতে তাদেরকে উপবাসী ব'লে মনে হয় নি। প্রাপ্তস্বাদের পুনঃআস্বাদন পেয়ে আরও তৃপ্ত হয়ে উঠেছে তারা।

অপরপক্ষে, যারা এক বাঁধনহারা আগ্রহ ও আবেগে আমাকে আপন করে নিয়েছে তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে, এতদিনের উপবাসী অন্তরে আরও পেয়ে ভরপুর হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

তাই সুবীক্ষণী দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করেছি, এইসব মেয়েদের সঙ্গে তাদের বাবার ব্যবহার। পার্থিব প্রয়োজনের সবটুকু তারা পেয়েছে তাদের বাবার কাছ থেকে। তবে সেই পাওয়াগুলি যে মেয়ের প্রতি বাবার ভালবাসার স্মারক, তা তারা অনুভব করতে পারে নি। মেয়ের প্রতি বাবার কর্ত্তব্যের কোটা বলে মেনে নিয়েছে তারা। তাই বাবার কাছ থেকে এত পেয়েও বাবার প্রতি অনুরাগের টান পুষ্ট হয় নি। অনুরাগের টান পুষ্ট হয় দানের সাথে অভিব্যক্তি মাখা টানে। আর টান যেখানে, দান সেখানে স্বতঃ উৎসারিত।

অনেক পরিবারের মেয়ের প্রয়োজন পূরণ হয় 'ভায়া মিডিয়া,' অর্থাৎ, অন্যের মাধ্যমে। কলেজের বেতন, খাতা, কলম, পোষাক-পরিচ্ছদ সব, যা কিছুর ফরমাইস হয় মায়ের কাছে। মা তুলে দেন বাবার কানে। বাবা এনে দেয়

মায়েব হাতে। দাতা ও গ্রহীতাব মধ্যে ভালবাসার সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয় না কোন দিন। তাই ব্যাঙ্ক উজাড কবে মেয়েব প্রয়োজন পূবণ করলেও যদি ব্যবহাবে অজ্ঞতা থাকে, তাহলে তা মেয়েব একাগ্র সম্বেগ ছিন্ন কবে তাকে ছন্ন ছাড়া করে তুলতে চায়। নিচেব লেখা চিঠি খানায় চোখ বুলালেই বোঝা যাবে যে, মেয়েব সঙ্গে সন্তাপোষণী ব্যবহাব বাদ দিয়ে তাদেব জন্য যতই কবা যাক না কেন, তা ভস্মে ঘি ঢালাব সমান।

লেখিকা বাপের বড মেয়ে। বযস একুশ বছব। বঙ কাঁচা সোনাব মত। মুখেব আদলে চাঁদেব প্রতিচ্ছবি। নিটোল স্বাস্থ্য। বি এ. পাশ কবেছে ববীন্দ্র ভাবতী থেকে। সঙ্গীতেও 'প্রভাকব উপাধি' নেবে আগামী বছব।

লেখিকাব বাবা উচ্চশিক্ষিত। সবকাবী গেজেটেড অফিসার। এক ছেলে ও তিন মেযে। ছেলে-মেয়েদেব জামাকাপড, স্কুল-কলেজেব কোন প্রযোজনের অভাব বাখেন নি। বাডীব স্বাভাবিক খাবাবেব সঙ্গে বাজাবের সৌখীন খাবার আনেন প্রায়ই। ছেলেমেযেদেব খাওযা পবা শখ-আহ্লাদেব ব্যাপাবে মুক্ত হস্ত। তবুও তাঁব তিন মেয়েই তাঁব উপবে খড়্গহস্ত কেন, তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। তিন দিন তাদেব বাডীতে কাটিয়েছি, ভদ্রলোকেব অনুবোধে। সেই অবসবে তিন মেয়েই কত কথা বলেছে বাবাব সম্বন্ধে। চাপা ব্যথা তিন মেয়েবই বুকে। লিখেছে বড মেয়েটি :

পূজনীয় জেঠুমনি।

আমাব ভালবাসাপূর্ণ অসংখ্য প্রণাম নিও। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম চিঠি লিখব বলে। কিন্তু বাখতে পাবলাম না। যতবার তোমাকে লিখব ব'লে কলম নিয়ে বসি ততবাবই বুকেব ব্যথা অশ্রু হয়ে ঝরে প'ডে লেখা নষ্ট কবে দেয়। লিখি আব ছিঁডে ফেলি।

তোমাব সাহচর্যে যে দিনগুলো গত হয়েছে সেই দিনগুলো তোমার ভালবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। এখন তুমিও আমাব কাছে নেই, আমাব দিনগুলিও আগেব মত বিক্ত হয়ে গেছে। তোমার কথা আমার প্রতিমুহূর্তে মনে হয়। জেঠুমনি! বলো, তুমি আমাকে কোনদিনও ভুলে যাবে না? হাজাব তাবাব ভিডে আমাকে মিশিয়ে ফেলবে না তো? আমার জন্য তোমাব হৃদয়ে ছোট্ট একটু জায়গা ফাঁকা বেখো।

জেঠু! তোমাব চিঠি আমি পেয়েছি। তুমি যে আমাকে ভালবাস তা তোমার চিঠি পড়লেই বোঝা যায়।

জানো ছোটবেলা থেকেই আমি ভীষণ অসুখী। আমার জ্ঞান হবার পর-থেকে মনে পড়ে না যে, বাবা আমাকে কোনদিন কোলের কাছে নিয়ে আদর সোহাগ করেছেন। আচ্ছা, সংসারে তো সবাই ভালবাসা পেতে চায়, ভালবাসা দিতেও চায়। এ স্বাদে আমি কেন বঞ্চিত হলাম? আমাদের বাড়ীর লোকেরা [মা ও বাবা] শুধু ভালবাসা পেতে চায়। কি করে ভালবাসা পেতে হয় তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। জেঠু! বাবা-মাকে ভালবাসতে না পারাটা কি ছেলেমেয়েদের দোষ? আমার তো মনে হয়, এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বাবা-মা। কারণ আমি তো নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি। আমি বার বার আপ্রাণ চেষ্টা করি বাবাকে ভালবাসতে কিন্তু বাবার ব্যবহারে সেই চেষ্টা, সেই ইচ্ছা কর্পূরের মত উবে যায় আমার মন থেকে। মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলায় আমার বাবার জুড়ি নেই।

তুমি ভাববে, মেয়ে হয়ে বাবার নিন্দা করছি! কিন্তু তোমাকে না বললে তো তুমি বুঝবে না, আমি কতটা দুঃখী।

বাবার ভালবাসা কি জিনিষ, তা কোনদিন অনুভব করি নি। বাবা যখনই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, তখনই গলা সপ্তমে চড়িয়ে ধমক দিয়ে বলেন। কেন, আস্তে ক'রে সুন্দর ক'রে, বলা যায় না? সেই সব শুনলে মন থেকে ভালবাসা চলে যায়। রাগ, দুঃখ এসে জমা হতে থাকে।

বাবার কথা লিখতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। তিলমাত্র অপরাধ করলে বাবা সেটাকে তালে পরিণত করবেন। সবার সামনে যা-তা করে বকবেন। এক কথা একশো বার ব'লে সেটাকে তিক্ত ক'রে ফেলবেন। বাবার মত আশ্চর্য্য লোক দুটি আছে কিনা সন্দেহ!

সংসারের প্রত্যেকটি বিষয়ে বাবার কড়া নিয়ম অনুযায়ী চলতে হবে। এর একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। সব সময় কড়া নিয়মে থাকতে থাকতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না, দিনকে দিন আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে, এখন আর আমি কিছুই সহ্য করতে পারি না। জীবনের হাসি, আনন্দ, শখ, আহ্লাদ সব আমার জীবন থেকে বিদায় দিয়েছি।

জেঠু! হয়তো আমার দীর্ঘ চিঠি পড়তে তোমার কষ্ট হবে। তবুও তুমি আমার মুখ চেয়ে প'ড়ো। কেমন?

একটা আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ—বাবা একবারও ভাবেন না যে, আমি এখন বড় হয়েছি। আমার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলা উচিত, তাও জানেন না

কোন কাজে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। গল্পকরা, বান্ধবীদের বাড়ী যাওয়া, এমনকি বাড়ীতে বসে গল্পের বই পড়ে সব কিছু ভুলে থাকব, তাও বাবা পছন্দ করেন না। গল্পের বই বাবার দু' চোখের বিষ।

জানো জেঠু। আমরা ছোটবেলা থেকেই বাবা-মার ভেতর মিল দেখিনি। বাবার দুর্ব্যবহারেই যে মা চোখের জল ফেলেছেন, তা দেখেছি বহুদিন। আমার বাবা, মার জীবনটাকে তো নষ্ট করেছেনই, আমাদের তিন বোনের জীবনটাও নষ্ট করছেন।

কোনদিনও বাবা বা মা আমাকে মা ব'লে ডেকেছেন কিনা, আদর করেছেন কিনা, তা আমার মনে পড়ে না। সংসারের কোন একটা কাজ করেও বাবার প্রশংসা পাইনি। তুমি তো নিজেই সেদিন রাত্রে খেতে বসে দেখলে। দুপুরে তুমি যে যে ভাবে আলু-ফুলকফি রান্না করলে আমি সেই মত আলু-ছানার ডাল্‌না রান্না করলাম। তোমরা সবাই বল্লে, রান্না দুপুরের ফুলকফির ডালনার চাইতেও টেষ্টফুল হয়েছে। অথচ বাবা কেমন মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন, যা যা! তোর ক্ষমতা এমন রান্না করা? আরও সাত জন্ম লাগবে এমন রান্না করতে। দাদা রান্না করেছেন, তুই হয়তো খুন্তি নেড়েছিস!

তুমি বলেছ বাবার সেবা করতে! কিন্তু যে বাবা ভালবাসার অযোগ্য, শ্রদ্ধা করার অযোগ্য, তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কি করে সেবা করব?

জেঠুমনি! আমার ভেতরে যে কি জ্বালা তা তোমাকে কি ক'রে বোঝাব? সেদিন কি কারণে যেন মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। আর তক্ষুণি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছি। পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি ক'রে কেঁদেছি। বুকের ভিতরটা অসহ্য জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছিল। হাত পা সব অবশ হয়ে গেছিল। রাত আটটা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা একনাগাড়ে কাঁদলাম। বাবা একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না, কেন অমন করে কাঁদছি। মা তো সেই অবস্থাতেও আমাকে বকলেন!

বাবা অমন। মা সবসময় যেন তেলে-বেগুনে জ্বলেই আছেন। যাকে কোন কথা বোঝান যাবেনা। বাবাকে তো বলাই যাবেনা। বলতে পার, আমরা কোথায় যাব? আমাদের সঙ্গে বাবা ও মার ব্যবহার দেখলে মনে হয় আমরা বোধ হয় গঙ্গার বানের জলে ভেসে এসেছি!

জেঠু! আমার কিছু ভাল লাগে না। কারও প্রতি আমার টান নেই। সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে আমি চলে যেতে চাই, যেখানে আমি অন্ততঃ নিজের

মত ক'রে বাঁচতে পারি। নিজের জগত—গানবাজনা, বই পড়া, সবধরণের শিল্প আমার ভাল লাগে। আমি এইগুলোর সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতে চাই। আমাদের এই পরিবেশে সেটা কখনই সম্ভব নয়।

এখানে আমি আর থাকতে পারছি না। যেমন করেই হোক আমাকে কোথাও চলে যেতেই হবে। জেঠু! তুমি যদি বল যে আমাকে বাড়ীতেই থাকতে হবে, তবে তোমার এই অনুরোধ কিছুতেই রাখতে পারব না।

জেঠু! তুমি আমার একটা উপায় করে দাও না। তোমার জানাশোনা কোন জায়গায় আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে বাঁচাও না জেঠু! আর যদি তুমি কোনদিন শোন যে, আমি বাড়ী থেকে চলে গেছি, তবে তুমি যেন আমাকে খারাপ ভেবো না! জেনো, কত কষ্টেই না আমি ঘর ছেড়েছি। তুমি কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। আমি সুন্দরভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম। এরা আমাকে তা হতে দেবে না।

আমাদের ওপরে বাবার কোন সহানুভূতি নেই। কোন রোগ হ'লে, বাবাকে বললে, বাবা ভাবে, বানিয়ে বানিয়ে বলছি। সব রোগ কি বাইরে থেকে বোঝা যায়, বল? এ জীবনের প্রতি আমার কোন মায়া নেই। যায় যাক জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে। আমার ভিতরে যে সুন্দর কুঁড়িগুলি উন্মুখ হয়ে উঠেছিল ফুটবে ব'লে, তারা সকলেই শুকিয়ে গেছে।

খুব বড করে তাড়াতাড়ি উত্তর দেবে। চিঠি এমন ভাবে লিখবে যাতে বাবা আমার প্রতি বিরূপ হয়ে না ওঠে। কারণ, এসব কথা জানতে পারলে বাবা আমাকে কেটে ফেলবে। তোমার পত্রের আশায় পথ চেয়ে থাকব। জেঠুমনি, তোমার ভালবাসা আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না। তোমার মত করে কেউ আমাকে ডাকেনি, আদর করেনি! বাড়ীর সবাই ভাল আছে। আজ এখানেই রাখছি। তোমার চিঠি পেলে আবার লিখব।

প্রণামান্তে—

তোমার 'সোনা মা।'

উপরের চিঠিখানা পড়লে বোঝা যায় যে মানুষ শুধু খাওয়া-পরা পেলেই বাঁচতে পারে না। তার সত্তা পেতে চায়, ভালবাসা। বঙ্কিমবাবু কি তাঁর মেয়েকে [পত্র লেখিকাকে] ভালবাসতেন না? নিশ্চয়ই বাসতেন। ছেলে-মেয়েদেরকে মনের মত ক'রে মানুষ করবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা তার কম ছিল না। নিজের মুখের গ্রাস তাদের মুখে তুলে দিতেও কুণ্ঠিত হন নি কোনদিন।

তবে তাঁর প্রতি, তাঁর তিন মেয়েরই কম বেশী একই বিরূপ মনোভাব কেন। কারণ একটাই। তাঁর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি ছিল না। বরং অভিব্যক্তি যা ছিল তা তাঁর হৃদয়হীনতা ও ব্যবহারে অজ্ঞতাই প্রকাশ করেছে। অভিব্যক্তিবিহীন ভালবাসা মেয়ের একাগ্র সম্বেগকে যে পুষ্ট করে তুলতে পারে না, জীবনকে ছন্নছাড়া হবার প্রবোচনা যোগায়, বঙ্কিমবাবু কি একবারও ভেবে দেখেছেন?

ভেবে দেখেন নি নিরঞ্জনবাবু! নিরঞ্জন সেন। থাকেন চব্বিশ পরগনায় —দত্তপুকুরে। তেতলা বাড়া। এক মেয়ে, তিন ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার।

ভদ্রলোক উচ্চশিক্ষিত। ডিগ্রীর বহরের সঙ্গে দক্ষতাও সকলের চোখে পড়ে। যেমন সজ্জন তেমনই পরোপকারী। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান। আরও একাধিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। নানা সংস্থার সিংহভাগ দায়িত্ব বহন করতে হয় নিরঞ্জনবাবুকে। তাই ছেলে, মেয়ে, সংসারের দায়িত্ব তাঁর স্ত্রী অমলা দেবীর ওপরে। সংসারের কোন ঝামেলাই পোহাতে হয় না নিরঞ্জনবাবুকে।

ঝামেলা বেধেছে একমাত্র মেয়ে মালবিকাকে নিয়ে। তাই উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছেন আমার বাসায়। কোন এক সর্বনাশের আশঙ্কায় মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

পকেট থেকে একগোছা কাগজ বের ক'রে বেশ জোরের সঙ্গে রাখলেন টেবিলের ওপরে। বল্‌লেন, এই দেখুন, এই সেই লোফার! লোফার নয়তো কি? বাবা চোলাই মদের কারবার করে। নিজে ওয়াগান ব্রেকার! এনার সঙ্গে রেজিষ্ট্রী করেছে শ্রীমতি, মানে আপনার টুকটুকী! একখানা ময়লা, কোঁচকান ফটোগ্রাফ আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন নিরঞ্জনবাবু। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ঘৃণার ছাপ। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপছে।

মালবিকার গায়ের রঙ তাজা গোলাপের মত। তাই আদর করে নাম দিয়েছিলাম টুকটুকী। দুবার গেছি ওদের বাড়ীতে। বড় শান্ত স্বভাবের মেয়ে। লেখা পড়ায়ও ভাল। বি. এ. পাশ করেছে বেশ ভালভাবে। সেই টুকটুকী বিয়ে করবে ওয়াগান ব্রেকারকে? রাজকন্যা মালা দেবে বাগানের মালিকে! ফটোগ্রাফখানা দেখলাম অনেকক্ষণ ধরে। ছোকরাকে দেখতে হাল ফ্যাসানের হিপিদের মত। তবে লোফার ব'লে মনে হল না। আর

ওয়াগান ব্রেকার যদি হয়ই তবে, তা তো টেম্পোরারী। কারণ বেকারত্ব ব্রেক করলে প্রাণ হাতে নিয়ে কেউ ওয়াগন ব্রেক করতে যায় কিনা সন্দেহ। তবে ফটোগ্রাফখানা দেখে মনে হল, এটা যার কাছে ছিল সে বহুবার ফটোগ্রাফে আঁকা মুখখানা দেখেছে ও আবেগপূর্ণ আদর প্রকাশ করেছে। আর নিরঞ্জন-বাবু যে ছবিখানা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন তাও বুঝতে বাকী রইল না।

প্রশ্ন করলাম, আপনি কি ঠিক জানেন যে, রেজিষ্ট্রী হয়ে গেছে।

সাত মাস হল হয়েছে। আমরা জানতে পারি, দিন পনের আগে। জানতে পেরেই আপনাকে চিঠি লিখি।

বড় জটিল সমস্যা। মেলামেশার পর্য্যায়ে যদি জানাতেন, তাহলে চেষ্টা করা যেত, টুকটুকীর মন ঘোরান যায় কিনা। রেজিষ্ট্রী-তো হয়েই গেছে। এখন কি করে কি করব বলুন ?

আবেগভরে আমার হাত দুখানা চেপে ধরলেন নিরঞ্জনবাবু। কাতরভাবে বললেন, দত্তদার মুখে শুনেছি আপনি তাঁর আত্মীয়াকে এই একই অবস্থা থেকে ফিরিয়েছেন। দাদা! মেয়ে যদি না ফেরে তবে আমার মান মর্য্যাদা ধূলোয় মিশে যাবে! আর আপনার টুকটুকীর পরিণতি যে কি হবে তাতো ভাবতেই পারছি না। মালুর বয়স এই একুশ বছর। আর ছেলেটির মাত্র একুশ পার হয়েছে। বলুন, ওকি সুখী হবে মনে করছেন ?

বড় দুঃখ হল নিরঞ্জনবাবুর কাতর মুখখানা দেখে। অমন সুন্দর জুলুস-ওয়ালা মানুষ কেমন চুপসে গেছেন মেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায়। আশ্বাস দিয়ে বললাম, চলুন সকলে মিলে চেষ্টা করে দেখা যাক।

ভদ্রলোক বুঝি কিছুটা স্বস্তি পেলেন। গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, আপনি চেষ্টা করলে, পরমপিতার দয়ায় ও বেঁচে যাবে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

একখানা কাগজে কয়েক গোছা প্রশ্ন লিখে নিরঞ্জনবাবুর সামনে রেখে বললাম,—এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর যা মনে আসে তা অকপটে বলে যাবেন। মাউথপীসটা ওনার দিকে ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। সুইচে চাপ দিতেই টেপরেকর্ডার চলতে লাগল পাশের ঘরে।

পরদিন সকালে আবার এলেন নিরঞ্জনবাবু। বললাম, বাড়ী ফিরে যান। দুমাস পরে যাব আপনাব বাড়ীতে। তবে টুকটুকী যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে যে, ওর এই বিয়ের ব্যাপারটা আমায় বলেছেন। তাহলে ওর ঘুণধরা

মনে স্থান পাব না। আর গত এগার বছরে যা ওকে দেন নি, তা দিতে শুরু করুন—সাবধানে।

বিস্ময়ের চাহনী নিরঞ্জনবাবুর চোখে। বললেন, বলেন কি দাদা! মালু আমার প্রথম সন্তান। যখন যা চেয়েছে তাই এনে দিয়েছি, তা যত দামেরই হোক!

মৃদু হেসে বললাম, দামী জিনিস কিনে দিলেই কি আর মেয়ের দিল পাওয়া যায় দাদা? দরদভরা সান্নিধ্য আর অভিব্যক্তিমাখা ভালবাসা লাগে! আপনিই তো বলেছেন।—টেপ রেকর্ডের স্যুইচ টিপে দিলাম। ভেসে এল নিরঞ্জনবাবুর গলা, "মালু ছোটবেলায় খুব ভালবাসত আমাকে। খাবে আমার সঙ্গে। শোবে আমার সঙ্গে। অফিসে যাবার তাড়াহুড়োর মধ্যেও, কোন কোন দিন ওকে স্নান করিয়ে দিতে হত আমাকে।

নয় বছর বয়সেও রোজ দোতালার সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করত আমার জন্য। অফিস থেকে ফিরতে দেখলেই ছুটে গিয়ে আঙ্গুল টেনে ধরত। শুরু করে দিত সারাদিনের জমিয়ে রাখা কত কথা। তার মা বরং মাঝে মাঝে ধমক দিত। মালু! বাবাকে এখন বিরক্ত করো না। বাবা এখন বিশ্রাম নেবেন। আমার টাই ধরে টেনে মুখখানা তার কানের কাছে নিয়ে ফিস ফিস করে বলত, বাবা তুমি বিছাম নেবে? ছুটে যেয়ে পাখা নিয়ে আসত। ছোট্ট হাতে বিরাট পাখায় আমাকে হাওয়া দেবার চেষ্টা করত।—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন নিরঞ্জনবাবু! ধরাগলায় বললেন, সেই মেয়ে আমার এমন রাফ হল কেমন করে!

টেপ বেজে চলল। "গত বার বছরে এক বাড়ীতে থাকলেও, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। স্থপারিনটেণ্ডেন্ট-এর পোষ্টে প্রমোশন পেলাম। তাড়াহুড়ো করে সকাল সাতটার আগেই বেরিয়ে পড়তাম অফিসে। বাড়ী যখন ফিরতাম তখন ভাইবোনে পড়াশুনা করছে, প্রাইভেট টিচারের কাছে। চায়ের পাট সেরেই বেরিয়ে যেতে হত বারোয়ারি কাজে। প্রতিদিনই একটা না হয়. অন্য একটা ঝামেলা থাকত। বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে রাত্রি বারটার আগে বাড়ী ফিরতে পারতাম না। তাই ওরা আমার সঙ্গ সাহচর্য্য পায়নি একদিনও।

কোনদিন বেড়াতে নিয়ে যাইনি কোথাও। নিজের কাছে বসিয়ে খাওয়া কিম্বা কোলের কাছে নিয়ে আদর সোহাগ করা—একদিনও করেছি বলে মনে

পড়ে না। বরং মনমেজাজ খারাপ থাকলে সামান্য অন্যায় দেখলেই ধমক দিয়েছি বিরাট। জানিনা, আমার গম্ভীর প্রকৃতি ব'লে, না চড়া মেজাজ ব'লে, মেয়ে একটু বড় হয়ে আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁসত না। কিছু দরকার হলে বলত ওর মাকে।

বারাসত কলেজে পড়ত। গত এক দেড় বছর মুখ গোমরা করে থাকত। কারও সঙ্গে কথা বলত না মন খুলে। ছুটির দিনেও যখন খুশী বেরিয়ে যেত বাড়ী থেকে। ওর মা নিষেধ করলে মার ওপরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত।

সেদিন একটু আগেই ফিরেছি অফিস থেকে। দেখি মেয়ে তার মার মুখে মুখে ঝগড়া করছে। ওর মা তো আমাকে দেখেই মনের সব ঝালটুকু ঝাড়ল আমার ওপরে। বলল, এ মেয়েকে নিয়ে আমি আর ঘর করতে পারব না। এবাড়ীতে হয় তোমার মেয়ে থাকবে, না হয় আমি থাকব। এইভাবে প্রতিপদে অশান্তি করবে, চোখের সামনে যা খুশী করবে, তাই দেখে চুপ করে থাকতে হবে! তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার মেজাজটাও গরম হয়ে গেল। বলে বসলাম, মা বাবার ব্যথা যে বোঝেনা তেমন মেয়ে মরে গেলে কি হয়?

মরে সে গেল না। মেরে গেল আমাকে। তার পরই রেজিষ্ট্রী করল গোপনে! আমার অমন মিষ্টি মেয়ে কেমন হয়ে গেল দাদা!

ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন নিরঞ্জনবাবু।

সুইচ্‌টা অফ্‌ করে দিলাম।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ধৈয্য হারাবেন না। তাঁর বাড়ীতে না যাওয়া পয্যন্ত মেয়ের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হবে, তা ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, মেয়ে যেন অনুভব করতে পারে, "বাবা আমাকে খু-উ-উ-ব ভালবাসে।

যথা সময়ে হাজির হলাম টুকটুকীদের বাড়ীতে। অতি সন্তর্পণে স্থান করে নিলাম তার মনে। টুকটুকী আমার কাছে মন খুল্‌ল তিনদিন পরে। অবশ্য তার জন্য কাঠখড় কম পোড়াতে হয় নি।

আকুল হয়ে বলল টুকটুকী, জেঠু আমাকে বাঁচাও।

এই তো চেয়েছিলাম। রোগী নিজে থেকে ডাক্তারের শরনাপন্ন হলে ওষুধ খাবার তাগিদটা হয় বেশী। টুকটুকী নিজে থেকে বল্‌ল, বাঁচাও। তাই সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলাম:

ছেলেটির সঙ্গে কি ভাবে, কোন্ কথা বলতে হবে তা, পাখিপড়াবার মত শেখালাম আরও তিনদিন সেখানে থেকে।

যেমন বলেছিলাম তেমন ধাপে ধাপে এগিয়ে গেল টুকটুকী। নিজের লেখা সব চিঠি, যুগল ফটো, রেজিষ্ট্রী দলিল, সব কিছু হাতে নিল ছেলেটির কাছ থেকে। সুযোগ বুঝে ছেলেটির কাছ থেকে তার এফিডেফিট করা ডিক্লিয়ারেশনও জোগাড় করে আনল টুকটুকী।

একবছর পার হলে মেয়ের নাম দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদের আর্জী পেশ করলেন নিরঞ্জনবাবু। যথাসময়ে আদালতের রায় পেলেন মেয়ের অনুকূলে। আনন্দ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে ছুটে এলেন আমার কাছে। হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বললেন, দাদা! পরমপিতার অশেষ দয়া আর আপনার অক্লান্ত চেষ্টায় মেয়ে আমার বিপন্মুক্ত হয়েছে!—পাড়ার যাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী তারা কি বলেছেন জানেন? তাঁরা বলছেন—ঐ ভদ্রলোক যাদু জানেন নাকি? উনি আপনাদের বাড়ী আসার পর থেকেই অদ্ভুত পরিবর্তন এল মালবিকার জীবনে। আর ছেলেটিও তো বেশ। বিনা প্রতিবাদে বিচ্ছেদের প্রস্তাব মেনে নিল!

মেনে কি আর এমনিতে নিয়েছে? মনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে মেয়ের। মেয়ে প্রভাবিত করেছে ছেলেটিকে। ছেলেটিকে তো চোখেও দেখিনি কোনদিন। নামটা যে তার কি তাও কি ছাই জানি?

মেয়ের মনে পরিবর্তন এল কি করে? পাড়ার লোকে বলেছে, 'জাদুস্পর্শে।' ঠিকই বলেছেন তাঁরা। কিন্তু কি সে জাদু? ভালবাসার জাদু! অভিব্যক্তি যাধা ভালবাসার স্পর্শ পেয়েছিল, তার বাবা ও মার কাছে—যার অভাব ছিল তার জীবনে!

প্রশ্ন উঠতে পারে, মালবিকা সুন্দরী। শিক্ষিতা। সমাজে প্রতিষ্ঠিত উচ্চবংশ মর্যাদা সম্পন্ন ঘরের মেয়ে। বিয়ে করল তার সমবয়সী, অশিক্ষিত, অজ্ঞাত কুলশীল বেকার ওয়াগান ব্রেকার ছেলেকে। এটা স্বাভাবিক প্রেমাশক্তি, না পুরুষ সংসর্গের জন্য জৈবিক ক্ষুধার উন্মাদনা? না ব্যাধিগ্রস্ত মনের বিকৃত রুচির পরিচয়?

বিয়েই যখন করল তখন, বিচ্ছেদই বা চাইল কেন? পরস্পর একত্রে বসবাস করলে না হয় অনুমান করা যেত, দুজনে বনিবনা হয় নি। তাই স্বেচ্ছায় ছাড়াছাড়ি হয়েছে দুজনে। পুরুষ সম্ভোগের আকাঙ্খায় মালবিকা তাকে বিয়ে করেছে, এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধির ধোঁয়ার মত ক্ষণস্থায়ী। কারণ সে সম্ভোগ-

সুখে কেউ তাকে বাধা দেয়নি। মেয়ে চাইলে সে সুখ থেকে, কোন অভিভাবক তাকে বঞ্চিত করতে পারত না। তবু তাকে ছাড়ল কেন ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলে যে, শরীরে যে উপাদানের অভাবে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে! ওষুধ বা পথ্যের মাধ্যমে সেই উপাদানের ঘাটতি পূরণ করলে শরীর সুস্থ হয়ে ওঠে। মালবিকার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তার প্রেমিক সম্বন্ধে একটিও মিথ্যা রটনা করা হয় নি। অর্থসম্পদের প্রলোভন দেখান হয়নি। নূতন কোন লোভনীয় পাত্রের ইঙ্গিত দেয়া হয় নি। দেয়া হয়েছিল পবিত্র ভালবাসার পরশ। যে ভালবাসার পুষ্টির অভাবে মালবিকার লিবিডো' [স্মরত] দুর্বল ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, সেই ভালবাসার জোগান দিয়েছিলেন নিরঞ্জনবাবু আর আমলা দেবী। আমার কথা উহ্য রাখতে দোষ কি ? শ্রেষ্ঠজনের প্রতি [মা, বাবা, গুরু বা তৎস্থানীয় গুরুজন] ভালবাসার টান যখন সবল হয়ে ওঠে তখন কামনা মথিত বিকৃত টানকে একটানে ছিঁড়ে, বেরিয়ে আসতে পারে মানুষ। যেমন ফিরেছিল মেরী ম্যাগডালীন—প্রভু যীশুর প্রতি অনুরাগের টানে। লোপামুদ্রা—ভগবান বুদ্ধের প্রতি টানে। এই সকল নারী চরিত্র আজ আর আমাদের সামনে নেই। তবে টুকটুকী যে "সুপিরিয়র লাভ"-এর [শ্রেষ্ঠের প্রতি ভালবাসার] প্রভাবে ঐ প্রেমিকের প্রতি টানকে 'ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করে আনতে পেরেছিল, তা সে তার নিজের উক্তিতেই প্রমাণ করেছিল আমার কাছে !

একদিন কথাপ্রসঙ্গে টুকটুকী [মালবিকা] বলল, বইতে পড়েছি, সকাম ভালবাসা আর নিষ্কাম ভালবাসা—কোনদিন তা অনুভব করিনি। তোমাকে কাছে পাবার পর বুঝলাম ভালবাসার বুঝি প্রকার ভেদ আছে। তোমার ভালবাসার স্পর্শ কেমন স্নিগ্ধ। বুকের মধ্যে ঠাণ্ডা মনে হয়। আর ঐ ছেলেটির ভালবাসার স্পর্শ কেমন জ্বালাময়। সমস্ত দেহমনকে উত্তেজনায় পূর্ণ করে তোলে। তোমার ভালবাসা সত্তাকে স্পর্শ করে। ওর ভালবাসা কামনাকে উসকে দেয়। ওর কাছে গেলে মনে হতো, ওকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে নেই। কিন্তু তোমার কাছে এলে মনে হয়, তোমার পায়ে সম্পূর্ণ উজাড় করে দেই নিজেকে।

হাসতে হাসতে বল্‌লাম, আমাকে যে ভালবাস তাতে তোমার কামনা নেই। তাই অমন মনে হয়।

আবেসভরে আমার হাত দুখানা চেপে ধরল টুকটুকী। বল্‌ল, জেঠু!

তোমার মত ভালবাসা যদি বাবার কাছ থেকে এতদিন পেতাম, তাহলে এমন মতিভ্রম হতো না। তুমি যে ভালবাসা আমায় দিয়েছ তা কারও কাছ থেকে পাই নি।

কোন্ অভিব্যক্তির মাধ্যমে কেমনকরে টুকটুকীর মনকে আকৃষ্ট করা হয়েছিল, যাতে সে সুন্দর নওজোয়ানের ভালবাসার টানকে তুচ্ছ ক'রে, নিজের জীবনের চলার ছন্দকে পরিবর্তন করতে পেরেছিল, তা লিখতে যেয়ে ভবিষ্যৎ কোন তরুণীর কল্যাণের কথা চিন্তা করেই কলম বন্ধ করতে হল।

তবে টুকটুকী তার মনের দুয়ার খুলে দিয়ে যা প্রকাশ করেছিল তা সংক্ষেপে বলতে দোষ কি ?

"গত তিন বছর ধরে মনের অবস্থা কেমন যে ছিল, তা বলতে পারব না। কিছুই ভাল লাগত না। সব সময় মনে হতো কি যেন একটা চাই। কি যে চাই, তা নিজেও জানতাম না। পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকতে চেষ্টা করতাম। মন বসাতে পারতাম না। কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হতো।

"বাড়ীর জন্য কোন আকর্ষণ ছিল না। বাবার সঙ্গ পেতাম না কোনদিন। বাবা অযথা এমন বকাবকি করতেন যে বাবার সঙ্গে কথা বলবারই সাহস হতো না। মা খিট্ খিট্ করতেন পান থেকে চুন খসলে। ছোট ভাইদের সঙ্গে খটাখটি বাধত প্রায়ই। মা ওদের পক্ষ নিতেন। তাতে রাগ হতো আরও বেশী। সহানুভূতি দেখাবার কেউ ছিল না আমার। নিঃসঙ্গ বলে মনে হতো নিজেকে।

বান্ধবী মনোরমা পরিচয় করিয়ে দিল তার কলেজের প্রেমিকের সঙ্গে। ঐ প্রেমিকের বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হল দু'দিন পরে। তার পর যা ঘটল তা তো সবই তুমি জান।"

জানি বলেই তো জানতে ইচ্ছা করে আরও। একথা কে না জানে যে,

বাবার প্রতি টান গড়াতে বাবার করণীয়

ভারতীয় মেয়েরা ঋতুমতী হয় সাধারণতঃ এগার থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে। প্রথম রজঃস্বলা হলেই মেয়েদের বৈধানিক পরিবর্তন হতে থাকে অসম্ভব রকমের। তাদের চেহারা ও চলনে ফুটে উঠতে থাকে বধুজীবনের সম্ভার-সম্পদের ইঙ্গিত। অন্তরে উঁকি দিতে থাকে সমবিপরীত সত্তার কাছে, অর্থাৎ, পুরুষের কাছে প্রশংসিত ও স্বীকৃত [admired and appreciated] হবার আকাঙ্ক্ষা। এই প্রশংসা ও স্বীকৃতির প্রলোভন পুরুষ-সান্নিধ্য ভাললাগার প্রেরণা যোগায়। তার চালচলন, হাবভাব,

পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনে ফুটে ওঠে ঐ আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। তাই সাধারণতঃ দেখা যায়, দশ-এগার বছর থেকে কুড়ি-একুশ বছর বয়সের মেয়েরা সেজেগুজে বারোয়ারি পূজা দেখতে, যাত্রা-থিয়েটার শুনতে, ছেলেমেয়ে মিলে বনভোজন করতে, বা আত্মীয় পরিজনের বিয়েতে বরযাত্রী যেতে বা বৌভাতে যোগ দিতে ভালবাসে। ঐ সকল ক্ষেত্র নিজেকে 'ডিস্‌প্লে' করা ও পুরুষের প্রশংসা ও স্বীকৃতি পাবার পক্ষে খুবই প্রশস্ত।

তাই এই বয়সের মেয়েরা তাদের বাবার সান্নিধ্য যাতে বেশী পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, বিশেষ করে মেয়েদের মায়ের। মায়ের সময়, সুযোগ, সামর্থ্য থাকলেও তার স্বামীর [মেয়ের বাবার] প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি পূরণের ভার দিতে হয় মেয়েদের ওপরে। ভোর বেলায় বাবাকে চা ক'রে দেয়া, সকালের কাপড় জামা গেঞ্জী ইত্যাদি তাঁর হাতের কাছে গুছিয়ে রাখা, বাবার জুতো মোজা ব্রাশ ক'রে রাখা, স্নানের পূর্বে বাবাকে তেল মাখিয়ে দেয়া, খাওয়ার পর বাবা শুয়ে পড়লে তাঁর পায়ে বা পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়া, বাবার বিছানা পরিপাটি করে রাখা, তাঁর অফিসের পোর্টফোলিও, কলম, রুমাল বা ছাতা প্রভৃতি গুছিয়ে রাখবার দায়িত্ব—মেয়েদের বয়স, কর্মদক্ষতা ও ব্যস্ততা অনুপাতে যথাযোগ্যভাবে ভাগ ক'রে দেয়া উচিত। বাবার জন্য এই রকম বাস্তব কাজ-কর্ম করার আগ্রহ ও অভ্যাস মেয়ের ভালবাসাকে বাবাতে সুনিবদ্ধ হতে সাহায্য করে। কারণ ভালবাসার টানকে মজবুত করার কাজে বাস্তব সেবার জুড়ি নেই।

পক্ষান্তরে, এই সেবা-সংশ্রবের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে বাবাও প্রশংসা ও স্বীকৃতিতে মেয়ের অন্তরকে ভরে তুলতে পারেন। হয়তো বললেন, আমার সোনাবুড়িটা কি সুন্দর চা করে। এমন চা শর্মাজীর রেষ্টুরেন্টেও খাই নি; ছোট মেয়েকে দেখিয়ে হয়তো বললেন, এই যে আমার টুম্পারাণী! টুম্পার মত সুড়সুড়ি আর কেউ দিতে পারে না। ঘুমিয়ে পড়তে একটুও দেরি লাগে না আমার।

ছুটির দিনে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে কি মাসের বাজেটে বেশী টান পড়ে? স্টার থিয়েটারে গেলে না হয় টিফিনের সঙ্গে 'পাফকর্ণ' বা আইসক্রীম দিতে খরচা বেশী হয়ে যায়। বোটানিক্যাল গার্ডেনে বুড়ো বটগাছ দেখিয়ে আনতেও কি খুব বেশী খরচা পড়ে?

অন্ততঃ ছুটির দিনে দুপুরে অথবা অন্যদিনে রাত্রে ছেলে মেয়েদেরকে কাছে ব'সিয়ে সকলে মিলে খেলে কি বাড়তি ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয়? খেতে খেতে

চট্‌করে হাতখানা ধুয়ে নিয়ে কোন মেয়ের থালায় একখানা পটলভাজা, বা অন্য মেয়ের মুখে একটুকরো আলু কিম্বা টুম্পার দিকে চাটনীর প্লেটখানা এগিয়ে দিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই দেখেছেন, মেয়েদের চোখে-মুখে কি তৃপ্তির স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে। তাদের অন্তরজগত পাকা বোধ গজিয়ে ওঠে, 'বাবাটা না কি ভাল!'

বিশেষ ছুটির দিনে বাড়ীতে থাকলে ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীর ধুম লাগিয়ে দিতে কি বাড়তি পয়সার প্রয়োজন হয়? সকালে উঠেই হয়তো স্ত্রীর ওপরে 'ফরমান' জারি করলেন, আজ তোমার রান্নাঘর থেকে ছুটি। আমরা একটা বিশেষ রান্না করব আজ।

ছানার ডালনা বা পটলের দরমা রান্না করার মত আর্থিক সঙ্গতি না থাকতে পারে সব বাবার। কিন্তু আলুর দম, কিম্বা আলুপটলের ডালনার জোগাড় করার মত দমও কি বাবাদের কাছে আশা করা যায় না—অন্ততঃ ছ'মাসে একবার?

ছেলে গেল বাজারে আলু কিনতে। মেজ মেয়েব ওপরে ভার মসলা পেষার। সেজ মেয়ে কুটনো কুটেই ফুলমার্কস। আর টুম্পারাণী? বাবার পাশে বসে ছোট পাখাখানা নাড়া-চাড়া করে নড়ে বসছে মাঝে মাঝে। তার চোখইতো উনুনের আগুনকে ক'রে রেখেছে তাজা। স্ত্রী আছেন পরামর্শদাতার ভূমিকায়। আর বড মেয়ে? সে তো আজ সকালে পড়ছিল কেমিষ্ট্রি। তাকে হয়তো বললেন, সোনা বুড়ি-তো কেমিষ্ট! টেষ্ট ক'রে দেখতো মা গরম মসলার কম্বিনেশানটা কেমন হল? লবন-ঝালের ভাক ঠিক আছে কি না?

কম্বিনেশানে দোস-ত্রুটি যাই থাক, বা স্বাদে গন্ধে আলুর দম "গ্রাণ্ডব" গন্ধ না ছড়াতে পারে, তবুও এইভাবে সমবেত প্রয়াসের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের জেগে ওঠে, সমবায় সংবেগ। এই সংবেত প্রচেষ্টায় প্রত্যেকের ভূমিকার স্বীকৃতিতে যে খুশীর আমেজ ও "হলিডে মুড্" সৃষ্টি হয় তাতে পড়াশোনা, শাসন পীড়ন, ও সংসারের একঘেয়েমী থেকে ছেলেমেয়েরা অনেকখানি রিলিফ পায়।

এইভাবে মাঝে মাঝে বাবার কাছ থেকে প্রশংসা ও উচ্ছ্বাস-জড়িত স্বীকৃতি পেলে, বিশেষ ক'রে মেয়ের অন্তর বাবার প্রতি অনুরাগে ভরে ওঠে। বাবাকে সবচাইতে আপনার জন ব'লে অনুভব করতে থাকে। এই অনুভূতি বা বোধ যতই পাকা হয়, ততই মেয়ে ব্যক্তিত্বে মজবুত হয়ে ওঠে। পরিবেশের কোন

বিরুদ্ধভাব তাকে বিকৃত ব্যবহার বা চলনে প্রলুব্ধ বা প্রবৃত্ত করতে পারে না। অবাঞ্ছিত বা বৈশাদৃশ্য-ওয়ালা কোন পুরুষই তার কাছে কখনই গ্রহণ যোগ্য বলে প্রতিভাত হবে না। বিশুদ্ধ জলে তৃষ্ণা তৃপ্ত হলে, ঘোলা জল কি কেউ চায়?

ভারতীয় কৃষ্টিতে শিবপূজার প্রচলন আছে। বিশেষক'রে কুমারী মেয়েরা শিবরাত্রির দিনে উপবাসী থেকে প্রহরে প্রহরে শিবের শিরে বেলপাতা ও জল নিবেদন ক'রে। ভগবান শঙ্কর তুষ্ট হলে নাকি শিব-প্রতিম স্বামী পাওয়া যায়। অন্ততঃ ঠাকুমা দিদিমারা নাতনীদের তাইই বুঝিয়েছেন। নাতনীরাও যে অবিশ্বাস করে তা নয়।

কিন্তু যাত্রাথিয়েটারে বাঘছাল পরা, জটাবল্কল জড়ান যে শিব তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন, তিনি যখন গ্রীনরুমে যেয়ে পোশাক বদল করেন, তখন তাকে তাঁতীপাড়ার শিবনাথ বাউল ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। ঠিক তেমনই, শিবের বরে প্রাপ্ত 'বরেরা' অষ্টম বা দশম মঙ্গলের গাঁটছড়া খোলার পর্ব শেষ হলে যে রূপ ধারণ করেন তা দেখে আধুনিক উমারা আঁতকে উঠে বলেন, 'ও বাবা! বার বছর শিবপূজা ক'রে নন্দীভৃঙ্গীও কপালে জুটল না'! শিব তাণ্ডবনৃত্য করেছিলেন মৃতা স্ত্রী পার্ব্বতীকে কাঁধে নিয়ে। আর এই সকল বরেরা মাঝে মাঝে এমন 'তাণ্ডব শুরু করেন যে তাদের জীবন্ত পত্নীরা মৃতপ্রায় হয়ে ওঠেন, সে দাপট সহ্য করতে না পেরে। তপস্যাতৃপ্তা গৌরীর মত স্বামীকে সয়ে বয়েও নিতে পারেন না এই সকল উমা মায়েরা।

এর একটি মাত্র কারণ। মেয়েরা স্বর্গের দেবতা শিবের পূজা করে। কিন্তু ভুলে যায় মর্ত্তের মানুষ বাবার পূজা করতে। শিবপূজার সাথে যদি বাবার পূজা অর্থাৎ বাবার সেবা সম্বর্দ্ধনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তবে প্রতিটি মেয়ে যে দেবী উমার মত সংসারকে মঙ্গল আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সেই জন্যই বোধহয় একমাত্র শিবকেই "বাবা" বলে সম্বোধন করা হয়। বাবা বৈদ্যনাথ, বাবা তারকনাথ, বাবা কেদারনাথ,—শিবের সবকটি নামের পূর্বে "বাবা" ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু আজকালকার মেয়েদের অত সময় কোথায় যে, বাবার সেবা সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত থাকবে? স্কুলে-কলেজে পাঠ্যতালিকার যা বহর তাতে বাড়ীর বাড়তি সময়টুকু সবই দিতে হয় প্রাইভেট টিউটরকে। তদুপরি নাচ-গান, সেলাই ও সাজের রেওয়াজ যদি বাড়ীতে থাকে তবে তো কথাই নেই। মেয়ের হয়ে মা

ওভারটাইম খাটেন, মেয়ের বাপের ফায়ফরমাশ যোগান দিতে। তাই, ইচ্ছা থাকলেও বাপের সেবা করবার অবকাশ পায় না মেয়েরা।

আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গোল করি আমরা বাবারা। আমরা আমাদের কর্ম ও কর্তব্যের জগতে এমন ধ্যান-গম্ভীর থাকি যে ছেলেমেয়েদের সাধ্য কি যে তারা আমাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে! অস্কার ওয়াইল্ডের "স্বার্থপর দৈত্যের" [Selfish giant] বাগানে যেতে শিশুরা যেমন ভয় পেত, তেমনই আমাদের জগতের আনাচে-কানাচে আসতে সমীহ করে আমাদের ছেলে-মেয়েরা। বাবা হিসাবে ছেলেমেয়ের সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখতে যেয়ে ভুলে যাই তাদের বন্ধু হতে। তাই বাপদুলালী হতে পারে না বহু মেয়ে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী বহু পরিবারে, একাধিকবার আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ হয়েছে। সে সব পরিবারের মেয়েরা নিপুণ হাতে নিখুত সেবা করেছে আমার। সারাক্ষণ সজাগ ও সাগ্রহী দৃষ্টি রেখেছে আমার প্রয়োজন ও স্বস্তির দিকে। অথচ তাদের নিজের বাবা—যিনি ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছেন কারখানায়—যখন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমান্তে বেলা তিনটেয় ঘরে ফিরে এলেন তখন সেই বাবাকে স্বস্তি দেবার জন্য, ঐ তিনটি মেয়ের একটিও উঠে গেল না। বাবা নিজেই জামা-জুতো ছেড়ে কলের নিচে বসলেন রুমাল আর গেঞ্জিতে সাবান লাগাতে। তারা তখন দিব্যি ফ্যানের তলে শুয়ে হালফ্যাসানের শাড়ির বিজ্ঞাপন দেখছে উল্টোরথ বা আনন্দলোকে!

রাত্রে আহারান্তে মেয়েরা যখন ফুলবিছানায় শুয়ে গালগল্পের ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে, তাদের বাবা তখন রাত্রের বিছানা বিছাতে যেয়ে ঝাড়ু খুজে বেড়াচ্ছেন।

সময় ও সুযোগ মত এইসব মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি কেন তারা বাবার বিছানা সুন্দর করে বিছিয়ে রাখে না? রুমাল, গেঞ্জি সাবান দিয়ে হাতের কাছে রাখেনা কেন? আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেকে একই কথা বলেছে। তারা বলেছে, আমাদের কাজ বাবার পছন্দ হয় না। বিছানা পেতে রাখলেও নিজে এসে তা পাতবেন। আমাদের ধোয়া রুমাল গেঞ্জি আবার ধোবেন।

কেউ কেউ বলেছে, বাবা নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসেন।

কোন কোন মেয়ে বলেছে, একটু কিছু খুঁত হলে বাবা এমন খুঁত খুঁত করবেন যে, শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যায়।

বহু বাবার সাথে কথা বলেছি এবিষয়ে। তাঁরা গর্ব করে বলেছেন, কারও

সেবা নেয়া আমি পছন্দ করি না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজের প্রয়োজন যেন নিজে করে নিতে পারি, তাই চাই।

নিজের প্রয়োজন নিজে মেটানো তো খুবই ভাল কথা। তবে মেয়ের প্রয়োজনও তো বাবাকেই মেটাতে হয়। খাওয়া-পরা, লেখাপড়া, বিবাহ ইত্যাদি সব প্রয়োজনের দিকে তো বাবা খেয়াল রাখেন। অথচ মেয়ের মঙ্গলের জন্যই তাদের সেবা নেয়া একান্ত প্রয়োজন, তা বাবা ভুলে যান কেন? বাবার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার ভার মেয়েদের হাতে থাকলে মেয়েরা বাবার মন বুঝে চলবার সুযোগ ও শিক্ষা দুইই পায়। পক্ষান্তরে তাদেরকে প্রশংসা ও স্বীকৃতিতে উচ্ছল ক'রে তুলবার সুযোগও বাবা পান বেশী।

কিন্তু বাবা যদি মেয়ের সেবা না নেন, সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে তার আগ্রহ ও আকুলতাকে পুষ্ট ক'রে না তোলেন, বরং মেয়ে বাবার জন্য উপযাচক হয়ে কিছু করলেও বাবা যদি কঠোর সমালোচনায় তার করাটাকে তাচ্ছিল্য করেন, তাহলে মেয়ের অহং আহত হয়ে ধাক্কা দেয় তার সূক্ষ্ম সেন্টিমেন্টে। "মালবিকা যেন আমার জন্য চা না করে। অপদার্থ। চা টাও বানাতে জানে না।" এরূপ মন্তব্য বাবার মুখে শুনলে মেয়ের মনের অবস্থা কেমন হয় তা বহু মালবিকার মুখে শুনেছি। আহত অহং আশ্রয়শূন্য হয়ে বাবার প্রতি বীতরাগ করে তোলে। বাবার প্রতি স্বভাব-সহজ অনুরাগ আর ক্ষুব্ধ অহং সঞ্জাত বীত রাগের দ্বন্দ্বে, মেয়ের অন্তর জগতে যে ভাবের সৃষ্টি হয়, তা তার একাগ্র সম্বেগকে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর ক'রে তোলে। বিভিন্ন মেয়ের মনে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাবাভিভূতির [obsession] সৃষ্টি হয়। ক্ষীণতর একাগ্র সম্বেগের সঙ্গে ভাবাভিভূতি থাকার ফলে মেয়ের পছন্দ বিকৃতি লাভ করে। ফলে, জীবনের সংস্কারজাত তৃষ্ণা মেটাবার তাগিদে যখন স্বামী নির্বাচনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখন ঐ বিকৃত পছন্দ তাকে বাবা, মা, বা অভিভাবককে ডিঙিয়ে "ভ্রান্ত নির্বাচনে" প্রণোদিত করে তোলে। মেয়ের নির্দিষ্ট শ্রেয় বা প্রেয় কিছু না থাকায় নিকৃষ্টকামী [inclined to inferior object of attraction] হয়ে ওঠে। ফলে, সে তার চাইতে নিকৃষ্টতর পুরুষকে আত্মদান করবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। তার মন, বুদ্ধি, বিবেক ও বিচারশক্তি একজোটে এগিয়ে এসে তার পছন্দের সমর্থনে বলতে চায়, :

যার সঙ্গে যার মজে মন
কেবা হাড়ি কেবা ডোম।—

কখনও আবার ইংরাজ প্রেমিকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চায়, 'Love knows no prejudice'. অর্থাৎ, ভালবাসায় বিচার কিসের? মনে প্রাণে টানই তো সব।

তা তো ঠিকই। ভালবাসায় তো বিচার নেইই। বিচার ক'রে যে ভালবাসা তা তো কষাই-এর মুরগী পোষার মত।

কিন্তু বিবাহে? বিবাহেও নির্ব্বিচারতার উদার মনোভাব চলে না কি? তাছাড়া কাউকে ভালবাসলেই যে বিয়ে করতে হবে এমন কথা আমাদের দেশের প্রেমিকপ্রবরগণ—চণ্ডীদাস বা বিল্বমঙ্গল—ব'লেছেন ব'লে তো শুনি নি। চিন্তামণির জন্য বিল্বমঙ্গলের যে টান তা যদি নব্য প্রেমিকদের মধ্যে থাকত তাহলে কি প্রেমিকার বাবা-মাকে তাদের মেয়ে নিয়ে এত টানাটানি করতে হতো? বিল্বমঙ্গলের অভিসারে ছিল মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ ক'রে প্রিয়া মিলনের আকাঙ্ক্ষা। বাধা পেয়ে সে প্রেম পরিণত হল 'কৃষ্ণানুরাগে।'

আজকের প্রেমিক এগিয়ে চলে মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে রেজিষ্ট্রী অফিসের দিকে। বাধা পেলেই নৈশ আঁধারে তা মোড় নেয় বালিগঞ্জের লেকের পথে। সকালে লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়ে প্রেমিক বা প্রেমিকযুগলের প্রশংসা: মরিয়া নিজেরে তারা করিল মৃত্যুহীন।

আধুনিক ভাষায় এই "ভ্রান্তনির্বাচন"-কেই বোধহয় "লাভ ম্যারেজ" বলে। অবশ্য "ম্যারেজ" মানেই তো লাভ ম্যারেজ। হেট ম্যারেজ বলে কিছু আছে না কি? স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ভালবাসার হৃদয় নিয়ে, ভালবাসার পোষণ পুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় একজন অপরজনকে ভালবাসবে ব'লেই তো বিয়ে করে বা তাদের বিয়ে হয়। তবে আধুনিক প্রেমিকযুগল যে অর্থে বলে থাকে, "আমাদের লাভ ম্যারেজ" সেখানে 'লাভ' আগে এসে হৃদয়ে জুড়ে বসে। পরে হৃদয় বিনিময় করে বিয়ে হয়। আর সেক্ষেত্রে বর ও কনের "লাভই" একমাত্র ঘটক। বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, চরিত্র, পারিবারিক পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য, এমন কি বয়সের অঙ্কও আমল পায় না। এই সকল লাভ ম্যারেজের ক'টা ম্যারেজ শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাকে, তা প্রজাপতিই জানেন। তবে বেশীর ভাগই পাশ্চাত্ত্যের মত ডিগবাজি না খেলেও অশান্তির চরকি বাজিতে ঘুরপাক খায় সারাজীবন।

পাশ্চাত্ত্যে ডিগবাজী খাওয়া প্রেমিকযুগলের মর্ম্মবেদনার মর্ম্মান্তিক প্রকাশ যেমন দেখেছি, তেমনই শুনেছি ভারতীয় চরাচরে চরকিবাজিতে ঘুরপাক খাওয়া শত সহস্র মেয়ের বুকের কান্নার সুর। এই কি ভালবাসার ফল।

এই তো সেদিন বিড়লাপুরে। রায়বাবুদের কোয়ার্টারে প্রাতঃরাশের নিমন্ত্রণ। নিমকির কোনাটা মুখে পুরে দিয়ে সবে হাত দিয়েছি রাজভোগে। অমনি রায়বাবু এসে জানালেন, তাঁর এক আত্মীয়ার দুর্ভোগের কথা। বললেন, একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে প্রাইভেট কথা বলতে চায়। মেয়েটি আমাদের আত্মীয়া। লাভ ম্যারেজ। এখন চরম অশান্তি স্বামী-স্ত্রীতে।

ভ্রান্ত নির্বাচনের পরিণতি (১)

পাশের ঘরে উঠে গেলাম প্রাইভেট কথা শুনতে। বাইশ কিম্বা তেইশ বছরের তরুণী বধূ। সুন্দর, সুশ্রী মুখের আদল। নাম সুরমা। ভূমিষ্ঠা হয়ে প্রণাম করল আমাকে। অতি পরিচিতের কণ্ঠে বলল, জেঠু। আমার স্বামীকে নিয়ে বড় অশান্তি। আর সহ্য করতে পারছি না। ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়ল চোখের জল। অতিকষ্টে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, আমাকে একটা উপায় বলে দিন আপনি।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কেঁদো না মা। কি ধরণের অশান্তি, কি নিয়ে অশান্তি বাধে, আর এই স্বামীর সঙ্গে বিয়েই বা হল কি করে তা যদি বল তাহলে সুবিধা হয়।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বল্‌ল সুরমা, সুন্দর গোলাপের মধ্যে যে এমন বিষাক্ত কাঁটা লুকিয়ে থাকতে পারে তাতো আগে জানা ছিল না। একটু থেমে বল্‌ল, আমার বাবা চাকরি করেন বাটানগরে। ওর [সুরমার স্বামীর] এক দিদি জামাইবাবুও থাকতেন বাটানগরে। তাঁদের কোয়াটার আর আমাদের কোয়ার্টার প্রায় পাশাপাশি। ছেলেটি মাঝে মাঝে আসত দিদির বাসায়। আমাদেরও যাতায়াত ছিল ঐ বাসায়। সেই সূত্রে আলাপ হয় ছেলেটির সঙ্গে। ছেলেটি কয়েকবার আমাদের বাসাতেও এসেছে। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে।

ছেলেটির একটা অদ্ভুত গুণ ছিল। যখন বাটানগরে আসত, আসে পাশে কারও বাসায় অসুখ-বিসুখ বা আপদবিপদ হলে আপনজনের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত। প্রাণপণে সেবা পরিচর্য্যা করত। ওর এই পরোপকার করবার মনোভাব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। [একটু নিচু গলায়] ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছিল। পাড়ার লোকেও ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওই একদিন বিয়ের প্রস্তাব দিল। [একটু নীরব থেকে] ওর স্বাস্থ্য, চেহারা, কথাবার্তা আমারও ভাল লাগত। আমিও রাজী হয়ে গেলাম। বাধা দিলেন বাবা

আর দাদা। তাঁরা বললেন, ওরা নাকি বৈশ্য, আমরা ক্ষত্রিয়, কুলীন কায়স্থ। ঘোর প্রতিলোম সম্পর্ক হবে এ বিয়ে হলে। তাই কিছুতেই হতে পারে না এ বিয়ে! দাদা তো ছেলেটিকে শাসিয়ে দিল, 'বাটানগরে দেখতে পেলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।'

আমার মন কিন্তু ভাঙ্গল না। আমার মনে হল, সব মানুষই তো সমান। ছোট-বড় জাতের বিচার তো মানুষের কুসংস্কার। কারও কথায় কান দিলাম না। বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রী করলাম শিয়ালদহে।

সুরমার কথায় মনে মনে না হেসে পারলাম না। তাতো ঠিকই—সব মানুষই সমান! সারা পৃথিবীর দুটো মানুষের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ [টিপ সহি] সমান নয়, আর সব মানুষই সমান? বৈঠকখানা বাজারে আমপট্টিতে অগণিত আম সাজান আছে থরে থরে। সব আমই তো আম। কিনতে যেয়ে দেখুন তো সমান দাম চায় কি না? ল্যাংড়া আর গোলাপখাসের কিলো পাঁচ টাকা। আর গজুবাবুর বাগানের বিজু আম পাঁচ টাকায় আড়াই কেজি। আবার কোহিতুর তুঙ্গে উঠে আছেন "কোহিনুরের" মত। এক কেজির দাম নগদ ন'টি টাকা। এই ভেদাভেদ তো ব্যবসায়ীদের কুসংস্কার!

যা হোক, এসব তত্ত্ব ও তথ্য সুরমাকে এখন বলা নিরর্থক। কারণ সে একটি সন্তানের জননী। আর একটি পথে রওনা দিয়েছে তিন মাস আগে। বিয়ের আগে হলে না হয় বুঝিয়ে বলতাম—বর যদি বর্ণে, বংশে কনের বর্ণ, বংশ থেকে নিকৃষ্ট হয় তাহলে তেমনতর বিয়েতে কি কি সর্বনাশ হতে পারে!

বলা আর হল না। দমকা হাওয়ায় দরজার পাশে দাঁড়ান বাঁশের লাঠিখানা, এসে পড়ল আমার বাম হাতের কনুইএর ওপরে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। লাঠির আঘাতে সম্বিৎ ফিরে এল। চেয়ে দেখি সুরমা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে।

বাম কনুই-এর পরিচর্য্যা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম, বেশ তো! ভালবেসেই-.তা বিয়ে করেছিলে। এখন ভাল না লাগার কারণ কি? কি তোমার দুঃখ।

চোখের জল মুছে নিয়ে বলল সুরমা, দুঃখ কি একটা? দুয়ারে ভিকিরী খিদেয় ধুকছে। তাকে একমুঠো চাল দিতে দেবে না। বাড়তি ভাত-তরকারি হয়তো রাস্তার কুকুরকে ডেকে দিতে হবে, তাও তাকে দিতে দেবে না। দেখা মাত্র দূর দূর করে তাড়াবে।

পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে বাস করতে হলে মানুষের জন্ম করাও লাগে। লাগে কিনা বলুন? আশপাশের বৌ-ঝিরা প্রয়োজনে হয়তো একটু নবন, দুটো কাঁচা লঙ্কা, কিম্বা দু-কাপ চায়ের জন্ম দুধ চাইতে এল। কিছুতেই তা দিতে দেবে না। ঠেকে গেলে আমাকেও তো ওদের কাছে যেতে হয়! বলুন! তা আমি দিলে আমাকে যা না তাই বলবে। বলবে,—অত দান-ধ্যান করতে হলে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে এস। তোমার বাবা তো একগাছি সুতোও সঙ্গে দেয় নি। তার আবার অত দান-ধ্যান কিসের!?

বাপের খোঁটা দিলে মাথা গরম হয়ে যায়। আমি সেদিন বলেছি, আমার বাবা তোমার মত কঞ্জুস নন। বরং তোমাকে দেখলে বোঝা যায় তোমার বাবা কেমন! ও ছুটে এসে আমার গালে ঠাস ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল। জেঠু! আমি কি চড় খাবার জন্ম ভালবেসেছিলাম? ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল নিজের হাত দুখানায় মুখে চেপে ধরে। চেয়ে দেখি সুরমার বাম গালে চারটে আঙুলের দাগ এখনও নীল হয়ে বসে আছে।

বড় ব্যথা পেলাম বুকে। বিস্মিতও হলাম ছেলেটির বিয়ের আগের ও পরের ব্যবহারের মধ্যে অসঙ্গতির কথা শুনে। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা সুরমা। যে মানুষ এত পরোপকারী ছিল সে এমন হল কি করে? এখন কি আর পারিপার্শ্বিকের সেবা করে না?

হ্যাঁ করে। বয়স্থা মেয়ে যে বাড়ীতে আছে, সে বাড়ীতে আপদ বিপদ কিছু হলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কটু কটাক্ষের ইঙ্গিত সুরমার চোখে।

না হেসে পারলাম না। বললাম, বলিস কি রে মা! পরোপকার করে বেছে বেছে?

অশ্রুধারে ভেজা সুরমার অধরকোনে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বিজ্ঞের মত ভঙ্গি করে বলে উঠল, আপনি দেখেন নি জেঠু! ও ক্যায়সান চীজ্। তখনতো ওর 'ক্যামোফ্লেজ' [ভেক] বুঝতে পারিনি!

শুধু কি তাই? পাড়ার কারও সঙ্গে ওর সদ্ভাব নেই। বাজারে গেলে মাছওয়ালা কিম্বা ওলওয়ালার সঙ্গে এমন বাধিয়ে দেবে, দশজন ভদ্রলোক জড়ো হয়ে যায়। ট্রামে বাসে সহযাত্রীদের সঙ্গে খামকা এমন ব্যবহার করে যে আমার মাথা নিচু হয়ে যায়। ওর বৌ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে। ঘৃণা বোধ হয়।

ঢং ঢং। নটা বাজল দেয়াল ঘড়িতে। সুরমা চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল,

আমি এখন যাই জেঠু! বাজার থেকে ফিরে বাসায় না দেখলে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দেবে! অফিসে চলে গেলে দেখা করব আপনার সঙ্গে। কটার সময় আসব?

বললাম, এসো তোমার স্থবিধা মতো—দুটো থেকে তিনটের মধ্যে!

আমাকে আবার প্রণাম করল স্থরমা। চৌকিতে শোয়ান ঘুমন্ত শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, আসি জেঠু! বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভ্রান্ত নির্বাচনের উদাহরণ (২)

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল পিয়াসী, নূতন ক'রে ঘর বাঁধবার আশায়। ঘটনা ঘটেছিল বিশ বছর আগে।

পিয়াসীর বাবা তখন চুঁচুড়া কোর্টের পেশকার। গোস্বামী ব্রাহ্মণ। পূজা-পার্বণে পৌরোহিত্য করবার নেশা ও পেশা দুইই ছিল ভদ্রলোকের। মেয়ে পিয়াসী, ছেলে মনতোষ ও স্ত্রীকে নিয়ে ছিল তাঁর ছোট্ট সংসার। ভদ্রলোকের আয় ছিল না বেশী। কিন্তু তাঁর দিল ছিল দরিয়ার মত বিরাট তিনি। অন্য কোন দর্শন পড়েছিলেন কিনা তা পিয়াসী বলতে পারে না। তবে চার্বাক ঋষির "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ 'ঋণ করিয়াও ঘি খাওয়া কর্তব্য' এই শ্লোকটি মুখস্থ বলতেন প্রায়ই। তাই তো তাঁর মৃত্যুর পর ঋণের দায়ে বিক্রয় করে দিতে হয়েছিল চাকদাহের চকমিলান পৈতৃক বাড়ী খানা।

মৃত্যুর কারণও অবশ্য পিয়াসী। মেয়ে ও মা দুজনেই ছিলেন গোস্বামীবাবুর দিল দরিয়া খরচার বিরুদ্ধে। গোস্বামীবাবু কাবু হয়ে থাকতেন স্ত্রীর রসনার দাপটে। তাই মনের ঝাল ঝাড়তেন মায়ের শাগরেদ মেয়ের ওপরে। সে ঝালের ঝাঁজ মাঝে মাঝে এত বেশী হত যে অন্নজল মুখে না দিয়ে দিনের পর দিন মুখ বুঁজে পড়ে থাকত মেয়ে। শেষ পর্য্যন্ত, বাড়ীর বিষাক্ত পরিবেশ থেকে পালিয়ে গেল পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে। সেই শোক সহ্য করতে পারলেন না, বংশ মর্য্যাদায় সংবেদনশীল গোস্বামীবাবু। হৃদরোগে মারা গেলেন তিনি তিনমাস পরে।

এসব সংবাদ দিয়েছিল শঙ্করী, আমার আত্মীয়া। মানকুণ্ডু মিটিং-এ পিয়াসী যে আসতে পারে সে ইঙ্গিতও দিয়েছিল, পিয়াসীর প্রসঙ্গ বলতে যেয়ে।

সভায় বিষয়বস্তুর ওপরে বক্তব্য রেখে সবে ঘরে এসে বসেছি। জনতার ভিড় ভেদ করে এক ভদ্রমহিলা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়স আন্দাজ চল্লিশ। মানসিক ক্লান্তির আড়ালে যেটুকু রূপ লাবণ্য লুকিয়ে আছে তাতে

বোঝা যায় যৌবনে ভদ্রমহিলা বহু তরুণীর ঈর্ষার পাত্রী ছিলেন। বললেন, আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট্ কথা বলতে চাই।

আমি মুখ খুলবার আগেই শঙ্করী তার মুখের ওপরে বলে উঠল, এত লোকের মধ্যে কি প্রাইভেট কথা বলা যায়? দেখছেন না মেসো খুব ক্লান্ত। আগামী কাল আড়াইটের সময় আসবেন। প্রাইভেটে কথা বলবার সুযোগ হবে।

ভদ্রমহিলা আপত্তি করলেন না। 'তাই আসব মা' বলে যে পথে এসে-ছিলেন সেই পথেই ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলেন। শঙ্করী কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, এই ভদ্রমহিলাব কথা আজ দুপুরে আপনাকে বলেছি। এনার নাম পিয়াসী।

পরদিন যথা সময়ে পিয়াসী এলেন শঙ্করীদের বাড়ীতে। নিজের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে বললেন, আমাব বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় বিশ বছর। সাড়ে উনিশ বছর অশান্তি ভোগ করছি। স্বামীর কাছে একদিনও সুখ পাই নি। ইদানীং তার অত্যাচারের মাত্রা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর পারছি না। তাই আপনার কাছে এসেছি। শঙ্করী বলেছিল আপনাদের ঠাকুর জীবনের সব সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন। আপনি যে আসবেন তাও বলেছিলেন। বাবা! আমার কি গতি হবে?—আর কথা বলতে পারলেন না। চাপা-কান্না বেরিয়ে এল ভদ্রমহিলার বুকের পাঁজর ভেদ করে। সে কান্না আর থামে না।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আপনার স্বামী কি ধরণের অত্যাচার করেন তার একটা নমুনা যদি বলেন!

নমুনা বলবেন কি? কান্নাব চাপে তাঁর দম বন্ধ হবার উপক্রম। শঙ্করী এগিয়ে এসে বলল, কাঁদলে তো কথা শেষ করতে পারবেন না। আর একটু বাদেই আমার কলেজের প্রফেসার আর দিদিমনিরা আসবেন। মেসো যা জিজ্ঞাসা করছেন তার উত্তর দিন।

একটু নীরব থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, অত্যাচারের কাহিনী মানে তো বিরাট মহাভারত। ইদানীং যা করছে তাই বলছি। রোজ ভোরে কাজে চলে যায় সাঁতরাগাছির কাছে রামরাজাতলায়। যাবারসময় চারটে টাকা রেখে যায় দিন রাতের খোরাকী বাবদ। এক ছেলে, দুই মেয়ে, আমি—সব-কটা পেটই যাটের বড়। এছাড়া তিনি রাত্রে ফিরে এসে ভরপেট খাবেন। আপনিই বলুন বাবা! এতজন লোকের দিন-রাতের খোরাক যে এই চার

টাকায় হয় না, তা পাগলেও বোঝে। তা উনি বুঝতে চায় না। যদি বলি কিছু, তবে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়। বলে, এর বেশী পাবি না। যেমন ক'রে হোক চালাবি। কোনদিন রাত্রে তার ভাত একটু কম হলে, ভীষণ মারা ধরা করে।

একেতো একাহারে বা অনাহারে থাকতে হয় অনেকদিন। তারপর এই অত্যাচার। আর সইতে পারছি না।—আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন পিয়াসী।

স্ত্রীকে "তুই-মুই" সম্বোধন করে শুনে সন্দেহ হল। হয় ভদ্রলোকের পেটে মা সরস্বতীর প্রসাদ একেবারেই পড়ে নি, না হয় ভব্যতা ও শিষ্টাচারের ধারই ধারে না ভদ্রলোক। একেবারেই অভদ্র।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার স্বামীর নাম কি? আপনারা কোন বর্ণের?

ভদ্রমহিলা একটু ইতস্তত: করলেন। বোধহয় মনে পড়ে গেছে, হিন্দুর মেয়েদের স্বামীর নাম মুখে আনতে নেই। তাই শঙ্করীর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি বলে দাও না মা, আমাদের কর্ত্তার নামটা।

শঙ্করী বলল, উপানন্দ ভড়।

আশ্চর্য্য ভারতের নারী। কথায় বলে, মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। স্বামীর কাছ থেকে এতটুকু স্বস্তি পায়নি যে মহিলা, স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে স্ত্রী, সেই তিনিও গুরুজন হিসাবে স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে অস্বস্তি বোধ করছেন। এ বড় দুর্লভ পতিভক্তি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কোন বর্ণের? মানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য না কি?

পিয়াসী তার আঁচলে বাঁধা চাবির ছড়াটা পিঠের ওপরে ফেলে দিয়ে বললেন, আমরা কৈবর্ত্ত, মানে জেলে। তবে ওরা দুই পুরুষ ধরে মাছ ধরার কাজ করে না। আমার বাপের বাড়ী ব্রাহ্মণ—গোস্বামী।

অজ্ঞাতে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, সর্বনাশ! বুকটার মধ্যে অস্থির করে উঠল। আবার সেই প্রতিলোম! মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, এই সমস্যার কোন সুরাহা করা আমার পক্ষে সহজে সম্ভব কি না ভেবে। কারণ, কেসটা প্রথমতঃ ক্রণিক, প্রায় কুড়ি বছরের পুরাণ। দ্বিতীয়তঃ, এর গোড়ায় গলদ। তবুও বিবাহের দু-এক বছরের মধ্যে হলে চেষ্টা করলে অন্ততঃ দাম্পত্য কলহের জ্বালাটা নিবারণ করা যেত।

চুপচাপ রইলাম কিছুক্ষণ। শঙ্করীর সঙ্গে এ-কথা সে-কথা বলে মনটাকে হালকা করার চেষ্টা করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম পিয়াসীকে, এ বিয়েতে আপনার বাবা মত দিয়েছিলেন।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিলেন পিয়াসী, বাবা মত দেবেন! জীবনে তিনি আমার মুখই দেখলেন না আর। তিন মাস পরেই মারা গেলেন।

কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করে বললাম, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে আপনার বিয়ের ইতিহাসটা শুনতাম।

মুখ নিচু করে বসেছিলেন পিয়াসী। চকিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপত্তির কিছু নেই। এ ইতিহাস চুঁচুড়ার কে না জানে? শঙ্করীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবটা এমন যেন শঙ্করীও এ বিয়ের সাক্ষী। বললেন, আমার বয়স তখন ষোল কি সতের। ক্লাস টেনে পড়ি। আমরা যে বাসায় ভাড়া থাকতাম তার সামনেই ওদের দো-তলা বাড়ী। স্কুলে যাবার পথে পাঁচমাথার মোড়ে ভড়েদের একটা ষ্টেশনারী দোকান ছিল। খাতা, পেন্‌সিল, এটা-সেটা কিনতে যেতে হতো ঐ দোকানে। সেই থেকে ওর সঙ্গে পরিচয়। আমার দাদার সঙ্গেও পরিচয় ছিল ছেলেটির, সেই সূত্রে কখনও আমাদের বাসাতেও আসত। ক্রমশ: ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে।

সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ ছেলেটিকে পছন্দ করলেন কেন?

পিয়াসীও উত্তর দিলেন সহজ ভাবে, ওর স্মার্টনেস আমার খুব ভাল লাগত। ছেলেটি সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। যখনই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, মনে হতো, কোন অফিসার যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, চেহারা, কথা-বার্তা খারাপ ছিল না। কেন জানিনা, ওর প্রতি আমার দুর্বলতা এসে পড়ল। পর্য্যায়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে বিয়ে না করে উপায় ছিল না।

শেষের কথাগুলি মুখ নিচু ক'রে এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেললেন পিয়াসী। 'পর্য্যায়' অনুমান করতে অসুবিধা হল না। বললাম, তার পর।

—গোপনে রেজিষ্ট্রি করলাম। বাবা জানতে পারলেন দুদিন পরেই। বললেন, আমি যেন ওবাড়ীতে থেকে, এ কলঙ্কিত মুখ তাঁকে না দেখাই। ছেলেটির বাবাও তাকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। বললেন, আমাদের সাতপুরুষে যা করেনি, তুমি তাই করলে? তুমি বামুনের মেয়ে ঘরে এনে আমাদের বংশের পবিত্রতা নষ্ট করলে? 'বংশের কুলাঙ্গার' ইত্যাদি ব'লে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে

দিলেন। ও তখন আমাকে নিয়ে চলে গেল গোরক্ষপুরে। একটা চিনির কারখানায় কাজ জোগাড় ক'রে নিল কোন্ এক পরিচিতের মাধ্যমে।

—অশান্তি শুরু হল কি নিয়ে? প্রথম ঘটনাটা মনে থাকলে বলুন।

অতীতের স্মৃতি বুঝি এতটুকু বিস্মৃত হন নি পিয়াসী। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, অশান্তি শুরু হল ওর অনাচারের প্রতিবাদ করায়। দেখি কি, ও প্যাণ্ট জামা পরেই পায়খানায় যায়। ঐ জামা-কাপড় পরেই ঘরে আসে, বিছানায় বসে। আমার তো এসব সহ্য হতো না। গায়ের মধ্যে ঘিন ঘিন করত। কত অনুনয় করে বলেছি, গামছা বা অন্য কিছু পরে পায়খানা যাও। পায়খানা থেকে এসে বাথরুমে ছেড়ে রেখো। আমিই স্নানের সময় ধুয়ে দেব। তা শুনবে না। ঐ জামা প্যাণ্ট পরেই হয়তো খেতে বসে গেল। ঐ পাতে আমাকে খেতে হতো। আমার ঘেন্না করত। বাপ কাকাকে তো কোনদিন এমন দেখিনি।

ঠাকুর দেবতার ওপরে কোন মান্যতা নেই। গিরিধারীর আসন পেতে-ছিলাম। আমাদের কুলদেবতা। ছোটবেলা থেকে পূজা করে আসছি। আমাকে পূজা করতে দেবে না। ভোগের জন্য দু আনার বাতাসা আনতে বললে আনবে না। উপরন্তু ঐ পায়খানায় যাওয়া জামা প্যাণ্ট পরেই ঠাকুরের আসন ছুঁয়ে দেবে। এই সবের প্রতিবাদ করায় অশান্তির সূত্রপাত। অনেক সহ্য করেছি। এখনতো সহ্যের বাইরে চলে গেছে বাবা।—উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে—কি সমাধান দেই সেই আশায়।

সমাধান দেব কি? জানা থাকলে তো দেব? জীবনটা যে গণিতের হিসাবের মত ধ্রুব। কোন একটা ধাপে ভুল করলে, অঙ্কের উত্তর মেলে না। সঠিক উত্তর পাবার একমাত্র উপায়, ভুল ধাপকে শুদ্ধ ক'রে আবার অঙ্ক কষতে থাকা।

বেদনা-অভিভূত হয়ে ভাবতে লাগলাম, পিয়াসী জীবনের কোন ধাপে ভুল করেছিল? সে ভুল করেছিল 'বর' নির্বাচনে। বিশেষ ভাবের দ্বারা অভিভূত হয়ে, দেখেছিল উমানন্দ ভটকে। তাই ভাবতে পারেনি যে, বংশ, রুচি, কুল, সংস্কৃতি ও মনোভঙ্গিমা দিক থেকে বর ও কনে যদি সদৃশ [compatible] না হয়, তবে সে বিবাহ বিষবৃক্ষের মত বিষ ফলই প্রসব করবে।

কোন রঙিন চশমা চোখে, দিয়ে দেখলে যেমন কোন বস্তুর স্বরূপ প্রতিভাত হয় না, ঐ কাঁচের রঙই নিজস্ব রূপ ব'লে মনে হয়; ঠিক তেমনই কোন বিশেষ

পছন্দের ভাবাভিভূতি নিয়ে কোন পুরুষকে দেখলে তার ব্যক্তিত্বের আসল রূপটা মেয়েদের চোখে ধরা পড়ে না। তার নিজস্ব পছন্দ ও চাহিদার প্রতিফলন দেখতে পেলেই তাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, ঐ পুরুষের বিশেষ কোন গুণ বা দক্ষতা মেয়ের মনকে এমন অভিভূত করে ফেলে যে, সে ঐ পুরুষের সবটুকু বিচার করবার প্রয়োজন বোধ করে না। তার দৃষ্টিতে যেটুকু ধরা পড়ে সেইটুকুই যথেষ্ট মনে ক'রে তাতে আত্মদান ক'রে বসে।

কিন্তু জীবনের ধর্ম হচ্ছে পূর্ণতা। মানুষ যা পেতে চায় তা পরিপূর্ণভাবে পেতে চায়। আংশিক প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হয় না কেউ।

তাই বিবাহোত্তর জীবনে মেয়ে যখন ঐ পুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে, ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব সংঘাতে ভালবাসার "রোমান্স" যখন আর অত রমনীয় থাকে না, যখন পছন্দ প্রয়োজনের তাগিদে বহুমুখী হয়ে ওঠে, তখন সে [মেয়েটি] দেখতে পায় যে, যে-গুণের আকর্ষণে সে ঐ পুরুষে আত্মদান করেছিল, শুধু সেই গুণটুকুই তার সত্তাপোষণারপক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। আরও বিশেষ বিশেষ গুণ ও চরিত্র মাধুর্য্যও প্রয়োজন—তা ঐ পুরুষে নেই। তাছাড়া, অভিভূতির প্রভাবে ঐ পুরুষের যে গুণে সে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল, তাও যে শিবের ভূমিকায় শিবনাথ বাউলের সাজান রূপের মত 'ভেক', তা মেয়েটির চোখের সামনে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তখন আত্মদানের সেই আনন্দ আত্মদহনের গ্লানিতে ভরে ওঠে। আত্মহত্যা করতে স্থির সঙ্কল্প মানুষ উদ্বন্ধনে ঝুলে পড়ার পর বাঁচবার তাগিদে যেমন আঁকু পাঁকু করে, ভ্রান্ত নির্বাচনের আগুনে দগ্ধ মেয়েরাও তেমনই আঁকু পাঁকু করে তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

সুরমা ও পিয়াসী সেই আকুলতা নিয়েই ছুটে এসেছিল। সরমার জীবনে একটা সুরাহা হয়েছিল। সে সংবাদ পেয়েছি রায়বাবুর কাছে। কিন্তু পিয়াসীর প্রয়োজন মিটাই কি করে? সুরমা সবে শুরু করেছিল সংসার। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে তিক্ততা অত তীব্র বা গভীর ছিল না। তাই অতি সহজেই সেবাপূর্ণ ভালবাসায় সুরমা তার স্বামীর মনটা গলিয়ে নূতন ছাঁচে গড়ে নিতে পেরেছিল।

কিন্তু পিয়াসীর দাম্পত্য-সম্পর্ক দীর্ঘ বিশ বছর পার করে এসেছে। তিক্ততার তীব্রতা এত বেশী যে, তা মুছে ফেলে উপানন্দের মনকে মধুর রসে ভিজিয়ে নরম করা খুবই কঠিন কাজ। তবুও বললাম, আমি যা বলে দেব তা কি মানতে পারবেন? নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বা অন্যের পরামর্শ শুনে অন্যথা করবেন না তো?

দুই হাত জোড় ক'রে পিয়াসী বলে উঠলেন, মানব বলেই তো আপনার কাছে এসেছি, ঠাকুর যদি মুখ তুলে চান! আর তো সহ্য করতে পারছি না।

শঙ্করীকে ইঙ্গিত করলাম আমার পকেট থেকে ষাটটি টাকা পিয়াসীকে দিতে। টাকাটা হাতে নিয়ে পিয়াসী অসহায় চাহনীতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। মৌন ভাষায় বোঝাতে চাইছেন, টাকা নিয়ে কি করব? টাকায় কি আর শান্তি আসবে?

বুঝিয়ে বল্‌লাম, এই টাকা থেকে প্রতিদিন দুটো করে টাকা নিয়ে ঐ চার টাকার সঙ্গে খরচা করবেন। পেট পুরে ভাতটা অন্ততঃ খাবেন। স্বামীর কাছে ঘুণাক্ষরেও অভাবের অভিযোগ করবেন না। হাসিখুশীতে এমন ভাব দেখাবেন, যেন কোন দুঃখ নেই আপনার। বিয়ের পরে কর্ত্তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন, তা আপনার মনে আছে তো?

ফিক্ করে হেসে ফেললেন ভদ্রমহিলা। হাল্‌কা স্বরে বললেন, সেই স্মৃতিই তো জাবর কাটি।

বল্‌লাম, আবার শুরু করবেন সেই ব্যবহার। তবে খুব সাবধানে। আমোদে-আহ্লাদে ডুবিয়ে রাখবেন কর্তাকে।

আমার কাছে সরে আসতে ইঙ্গিত করলাম পিয়াসীকে। বললাম, ঘরের চাবির গোছা কার কাছে থাকে।

পিঠের ওপরে ঝুলান চাবির ছড়া দেখিয়ে বলল, মেয়েদের আঁচলে।

আস্তে ক'রে বললাম, ঘরের জীবনের চাবি কাঠিও থাকে তার বৌ-এর হাতে। সাবধানে ঘুরাবেন যাতে কর্ত্তা মনে না করে যে আপনি তার সঙ্গে অভিনয় করছেন। আর সম্ভব হলে একমাস পরে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। শঙ্করীকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন সেই সময় আমি কোথায় থাকব।

খুশীর আমেজে আবিষ্ট হয়ে উঠল পিয়াসীর মুখমণ্ডল। অন্তর-আবেগে কাঁপতে লাগল তার জীর্ণ ঠোঁট দুটি। চোখের কোন্ থেকে ঝরে পড়ল কয়েক ফোটা জল। আমার মুখের দিকে অসহায় চাহনীতে চেয়ে রইলেন। মনে হল কি যেন বলতে চায় আমাকে। ভরসা দিয়ে বল্‌লাম, পরমপিতাকে মাথায় নিয়ে চলবেন। দুঃখ আপনাকে দুঃখিত করতে পারবে না। দুঃখের দিনেও সান্ত্বনা আপনাকে ছেড়ে থাকবে না।

চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। বেদনা ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে লাগলাম পিয়াসীর দুঃখের ইতিহাস।

শঙ্করী প্রশ্ন করল, আচ্ছা মেসো। যে ছেলে অত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট, স্মার্ট থাকত সে অত নোংরা হল কি করে? এ মা! পায়খানার কাপড়েই খেতে বসত? ছি!!

বললাম, তুমি তো সাইকোলজির ছাত্রী। "ক্যামেফ্লেজ" বা ভেক বোঝ না? মনের ইভিল মোটিভকে [দুষ্ট অভিপ্রায়কে] হাসি হাব-ভাবের রঙে ঢেকে রাখবার ক্ষমতা আছে অনেকের।

গার্লস্ স্কুলের কাছে ষ্টেশনারী দোকান। মেয়েরা অনেকেই আসত ওর দোকানে। তাদেরকে আকর্ষণ করার মত আর কোন মেকদার ছিল না উপানন্দের। তাই সেজে-গুজে, তেড়ি কেটে, ফিট্-ফাট্ হয়ে থাকত—যদি কেউ আকৃষ্ট হয়।

সাধারণতঃ, প্রত্যেক মেয়েই তার ভাবি স্বামী সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক মূর্তি অন্তরে এঁকে রাখে। ভাবে, আমার স্বামী এমনটি হলে বেশ ভাল হতো। কারও কারও থাকে ধারণা অভিভূতি। যেমন ছিল পিয়াসীর। স্বামী খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্মার্ট হোক এই ছিল তার চাহিদা। সুরমা চেয়েছিল পরোপকারী স্বামী। এই রকম কোন ধারণা অভিভূতি থাকলে, মেয়েরা ঠিক ঠিক ধরতে পারেনা—যাকে তার পছন্দ হচ্ছে, সে প্রকৃতপক্ষে কেমন।

শান্তাও ধরতে পারেনি। শান্তা যোশী। মহারাষ্ট্রের পুণা শহরে বাড়ী। থাকে বোম্বেতে—থানে অঞ্চলে। থানেতে অধিবেশন শেষ হল। অনেকে এসে অনুরোধ করলেন তাঁদের বাড়ীতে যাবার জন্য। শান্তাও এগিয়ে এসে অনুরূপ অনুরোধ জানাল। বলল্, আঙ্কল্, উড্ ইউ প্লীজ লিসটেন টু মাই পার্সোনাল প্রবলেম?*

ভ্রান্ত নির্বাচন উদাহরণ (৩)

অটোগ্রাফ লিখতে লিখতে মুখ তুলে চাইলাম। সুন্দরী, সুশ্রী তরুণী। নিটোল স্বাস্থ্য। এলোমেলো রুক্ষ কেশরাশির মাঝখানে সরু একটা রক্তিমাভ রেখা ইঙ্গিত করছে, সে বিবাহিতা। লাবণ্যময়ী মুখমণ্ডলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বেদনাক্লিষ্ট অন্তরের অভিব্যক্তি।

বললাম, অফ্ কোর্স। ডু ইউ ওয়ান্ট টু টেল ইট নাও?*

---

* কাকা। আপনি অনুগ্রহ করে আমার জীবনের সমস্যার কথা যদি শোনেন'

** নিশ্চয়ই শুনব। এখন বলবে?

শান্তা বলল, না আমার বাসায় আপনাকে অনুগ্রহ ক'রে যেতে হবে। মিঃ ভাটনগরের বাড়ীর কাছেই আমার বাড়ী।

বুঝলাম, কাল সকালে যে কয়েকটি বাড়ীতে যাবার প্রোগ্রাম আছে তা শান্তা শুনেছে। বললাম, ঠিক আছে। মিঃ ভাটনগর আমাকে নিয়ে যাবেন। তাঁকে একটু বলে যেও!

পরদিন মিঃ ভাটনগরের গাড়ীতে তাঁর বাড়ী হয়ে শান্তা যোশীর বাড়ীতে এলাম।

'কার' থেকে নামতেই শান্তা ছুটে এসে স্বাগত জানাল, আসুন আঙ্কল্। হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেয়ে বসাল সুন্দর পরিপাটি করে বিছান বিছানায়। আবদারের সুরে বল্ল, কি খাবেন বলুন—চা, কফি, না কোলা? সুইট্‌স এণ্ড ফ্রুটস্ তো আছেই।

হেসে বল্লাম, আচ্ছা 'মাদার' তুমিই বল না। দশবাড়ীতে যেতে হবে। এলেই যদি খেতে হয়, তাহলে তোমার আঙ্কল্-এর দফা বফা হবে কি না?

—সে আমি জানি না। আমি তো আন্টীকে [মিসেস্ অভ্যয়ঙ্কর] বলেই এসেছি যে, আপনার "ব্রেকফাস্ট" আমার এখানে হবে।

—তোমার আন্টীই তো আমার "ফাস্ট" (উপবাস) "ব্রেক" করিয়েছেন সবার আগে। তুমি বরং কিছু "ফ্রট্‌স" আর "সুইটস্" দিয়ে দিও, আমরা সবাই মিলে ট্রেনে খাব।

সে হবে। পাশের ঘরে গেল শান্তা। পর্দ্দার আড়াল থেকে চোখে পড়ল, দুটি বিরাট প্যাকেট মিঃ ভাটনগরের হাতে দিয়ে বলছে, ফর আঙ্কল।

ভাবছি, আমি বাঙ্গালী। শান্তা গুজরাটী। বম্বে এসেছি গত ন' দিন। বিভিন্ন স্থানে অধিবেশন ও জনসভায় আমার আলোচনা বা ভাষণ হয়তো শান্তা শুনেছে। সাক্ষাৎ আলাপ মাত্র গত রাত্রে। এর মধ্যে এত আপন করে নিল কি করে? যেন কতদিনের চেনা। আমার বড মেয়ের বাড়ীতে গেলে তার চোখে মুখে যে আপনত্ব ও আপ্যায়নার আবেশ ফুটে ওঠে ঠিক তেমনই ফুটে উঠেছে শান্তার চোখে মুখে।

আমার পাশে এসে দাঁড়াল শান্তা। কোন কথা না বলে দুটো আঙ্গুর আমার মুখে পুরে দিল। আপত্তি করবার পূর্বেই পর পর পড়ে গেল আরও দু-চারটে।

বলল শান্তা, আপনাকে দেখলে আমার বাবার কথা মনে পড়ে। বাবার

কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আপনার কণ্ঠস্বরের হুবহু মিল। বাবাও দেখতে আপনার মত ছোট খাট ছিলেন। আমার বয়স যখন নয় কি দশ, তখন বাবা মারা যান। —বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল শান্তার বুক থেকে। বলল, বাবাকে হাতে করে কিছু খাওয়াবার সুযোগ পাই নি। বান্ধবীদেরকে দেখেছি তারা কেমন ক'রে বাবার যত্ন—আর বলতে পারল না। চোখের পাতা দুটো টল্‌টল ক'রে উঠল অশ্রুভারে। ঝরেও পড়ল কয়েক ফোঁটা।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি না আমায় কি বলবে বলেছিলে মা?

—হ্যাঁ। বলব। পাশের ঘরে প্লেটখানা রেখে হাত ধুয়ে এল শান্তা। সামনের টুলখানা টেনে নিয়ে বসল আমার কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, মিঃ যোশী, মানে, তোমার হাজব্যাণ্ড কোথায়?

তাকে নিয়েই তো আমার সমস্যা আঙ্কল। একটু নীরব থেকে বলল শান্তা,—আমাদের লাভ-ম্যারেজ। বিয়ের মাসখানেক পরে জানতে পারলাম যে স্বামী অন্য একটা মেয়েকে ভালবাসে। ওরই মাসতুতো বোন। অনেকদিন থেকেই ঐ বোনকে নিয়ে থাকে। প্রথমে বুঝতে পারি নি। হঠাৎ অফিস থেকে দেরি ক'রে বাড়ী ফিরতে শুরু করল। কোন কোন দিন রাত্রি এগারটাও বেজে যেত। জিজ্ঞাসা করলে বলত, অফিসে কাজের চাপ। প্রথম প্রথম ভাবতাম, সেকশান্-ইন্-চার্জ হয়েছে। তাই, সত্যিই হয়তো কাজের চাপ বেড়েছে।

ক্রমশঃ ওর লেট বাড়তে লাগল। আর বাড়ী এসে প্রায়ই বলত, রাত্রে খাব না। বন্ধুর বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি। দুজনে একসঙ্গে খাব বলে আমি রান্না-বাড়া করে অপেক্ষা করতাম। তাই ওর এধরণের ব্যবহারে মনে খুবই লাগত। আমার সন্দেহও বাড়তে লাগল। অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম সন্ধ্যা সাতটার পর কোন দিনই অফিসে থাকতে হয় না তাকে।

তাকে তাকেই ছিলাম। ওর পোর্টফোলিও চেক্ ক'রে একখানা চিঠি পেলাম। লিখেছে কুন্তলা পারেকর। পিওর লাভ-লেটার। গোপনে পিছু নিলাম—অফিস ছুটির পর কোথায় যায়। ডুভ্যাল স্ট্রীটের তের নম্বর ফ্লাটে যায়। বুকের মধ্যে ছম্ ক'রে উঠল আন্‌লাকী থার্টিন ভেবে। কুন্তলার চিঠির ওপরেও লেখা ছিল ফ্ল্যাট নং ১৩।

অফিসে ওর পরিচিতদের কাছে জানতে পারলাম যে, ঐ ফ্ল্যাটেই থাকে ওর মাসতুতো বোন্। নাম কুন্তলা পারেকর।

অনেক বুঝাবার চেষ্টা করেছি। ফল হয় নি। বরং আরও দেরিতে বাড়ী ফিরতে লাগল। আমি না খেয়েই অপেক্ষা করতাম। ভাবতাম আমার শুখনো মুখখানা দেখে ওর যদি একটু মমতা হয়। একদিন রাত্রি একটায় ফিরে —'খেয়ে এসেছি' ব'লে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, মাসতুতো বোনের সঙ্গে যদি তোমার সব চলে তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন? যে কোন অজুহাত দেখিয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেই পারতে? তুমুল ঝগড়া বেধে গেল দুজনে। শেষ পর্য্যন্ত 'তোমার পথ তুমি দেখে নাও' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর আসেনি এ বাড়ীতে। সেখানেই থাকে।

বেদনা অভিভূত হয়ে শুনছিলাম শান্তার কথা। আহা! এমন শান্ত মেয়ে। তার বুকে এত অশান্তি।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, মা'রে, বহু মেয়ের জীবনে এ-রকম না হয় অন্য আর এক রকমের দুঃখ। যাক তার জন্য ঘাবড়াবে না। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললাম, তোমার এই বিয়েটা কি ভাবে ঘটল তা যদি বল।

কোন দ্বিধা করল না শান্তা। শান্তভাবে বলতে লাগল, ও [মিঃ যোশী] এবং আমি একই অফিসে, একই সেক্শানে কাজ করতাম। অফিসিয়াল ব্যাপারে প্রায়ই কথাবার্ত্তা হতো। কোন কোন দিন একইসঙ্গে অফিস থেকে ফিরতাম। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল।

দু চার দিন ওর সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটারে যে যাই নি তা নয়। বুঝতে পারতাম যে আমার জন্য ওর অন্তরে একটা সফ্‌ট কর্ণার আছে। অফিসের কাজ কর্মে মাঝে মাঝেই সাহায্য করত। বিশেষ ভাবে, জরুরী অবস্থাকালে উপযাচক হয়েই আমার অনেক কাজ তুলে দিত। ও সাহায্য না করলে হিম্‌সিম্ খেতে হতো। আমার প্রতি ওর এই সহযোগী মনোভাব ও মমত্ব-বোধই আমাকে ওর দিকে আকৃষ্ট করল। ভাবলাম, আমাকে যে এতখানি আপন বোধ করে সেই তো আমার স্বামী। ওদের বর্ণ, বংশ, গোত্র, এবং আমাদের দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য যা তাতে বিয়ে হতে পারে। সবদিক থেকে বিচার করে আমি সুখী হব আশায় আমি ওর প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাই। এক বছর দু মাস আগে রেজিষ্ট্রি হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, সোশ্যাল ম্যারেজ হল না কেন?

শান্তা বলল, অভিভাবক বলতে আমার এক বৃদ্ধা ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ

নেই। ছোটবেলায় মা ও বাবাকে হারিয়ে এই ঠাকুমার কাছেই মানুষ হয়েছি। বোম্বে কলেজ থেকে সোসিওলজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করেছি। অনুষ্ঠানের ঝুট-ঝামেলা কে পোহাবে? তাই রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ। দু-তিন মাস বেশ সুখেই কাটল। তারপরই নেমে এল এই দুঃখের অন্ধকার। [একটু নীরব থেকে] বান্ধবীরা বলছে, ওকে ডিভোর্স করে আবার বিয়ে করতে!

আমি বললাম, আবার যাকে বিয়ে করব সে যদি তার মামাতো বোনের সঙ্গে থাকে!

কাতর কণ্ঠে বলল শান্তা, আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না আঙ্কল্।

একটু গোপনীয় ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মিঃ ঘোশীকে এখনও মনে প্রাণে ভালবাস?

ভাবের আবেগে অধীর হয়ে উঠল শান্তা। আমার দুই হাঁটুর ওপরে তার হাত দুখানা রেখে বলল,—আঙ্কল্, ইউ আর লাইক মাই ফাদার [কাকা! তুমি আমার বাবার মত] তুমি বিশ্বাস কর, ঘোশী ছাড়া আর কোন পুরুষকে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। ভাবতে পারিও না। ওকে কাছে পাবার জন্য সারাক্ষণ বুকের মাঝে আন্‌চান্ করতে থাকে।

ভরসা দিয়ে বললাম, দেন নো প্রব্লেম, মাই সুইট মাদার [আমার মিষ্টি মা! তাহলে আর কোন সমস্যা নেই]

গভীর আগ্রহে ছলছল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল শান্তা। ঘোশীর মানসিক কাঠামোটা ভাল ক'রে বুঝে নেবার জন্য আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলাম শান্তাকে। বললাম, দীপাবলী, দশহারা, প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পর কিম্বা নববর্ষে মিঃ ঘোশীর কাছে তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম দিয়ে চিঠি লিখবে। খুব সংক্ষিপ্ত দু-চার লাইনের চিঠি। যাতায়াতের পথে যদি তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় তবে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিও না। নিজেই তার কাছে এগিয়ে যাবে। মাত্র একটা কথা বলবে। কেমন?

চিঠিতে কি লিখতে হবে আর দেখা হলে কি বলতে হবে তা শান্তা তার ডাইরীতে লিখে নিল।

খুব আশ্বাস দিয়ে বললাম, আর পরমপিতার কাছে প্রাণ ভরে কাঁদবে। বলবে, দয়াল! আমার স্বামীকে শুভবুদ্ধি দাও। তাকে আমার বুকে ফিরিয়ে দাও।—পরমপিতা তোমার আকুল প্রার্থনা মঞ্জুর করবেনই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "তিনি (ঈশ্বর) বড় কানখড়কে গো! তুমি একবার যা

চেয়েছ সব জগতে পেয়েছেন। তুলে রেখেছেন, সময় হলেই দেবেন।” ভয় কি মা তোমার?

রুদ্ধ আবেগের বাঁধ ভেঙ্গে গেল শান্তার। আমার হাঁটুর ওপরে কপাল ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বলল্, আঙ্কল্! আশীর্বাদ করুন। আর যে সইতে পারছি না।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। বললাম, ওঠ মা! অধৈর্য্য হলে ধৈর্য্য ধরে এগোবে কি করে? ভাঙ্গনের মুখে ভেঙ্গে পড়লে কি চলে? এখন তবে আসি।—উঠে দাঁড়ালাম।

চোখ মুছতে মুছতে বলল শান্তা, প্লীজ, আঙ্কল্, যাষ্ট এ মিনিট [কাকা, অনুগ্রহ ক বে একটু দাঁড়ান] পাশের ঘরে থেকে ফিরে এল। ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। একখানা ভাঁজ করা রঙীন কাগজ আমার পকেটে পুরে দিয়ে বলল, মেয়ের এই সামান্য অর্ঘ্যটুকু দিয়ে পথে কিছু কিনে খাবেন।

শান্তার চোখদুটো আবার জলভাবে টল টল ক'রে উঠল। গালবেয়ে গড়িয়েও পড়ল কয়েক ফোঁটা। মিঃ ভাটানগরের 'কারও' টিলার ঢালু গড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পথের বাঁকে।

এক বছর যেতে না যেতেই বাঁক নিল শান্তার জীবনের গতি। পনের মাস পরে একদিন সন্ধ্যায় শান্তা এসে হাজির আমার বাসায়। আবেগে জড়িয়ে ধরল আমাকে, ঠিক মেয়ে যেমন বাপকে জড়িয়ে ধরে, বাপের বাড়ী এসে। শান্তার পিছনে দাঁড়ান মিঃ যোশী।

বলল শান্তা, শান্তি পেয়েছি আঙ্ক্ল, তাই প্রণাম করতে এসেছি ঠাকুরকে।

মিঃ যোশী এগিয়ে এল সম্মুখে। শ্রদ্ধাভরে একটি গিফ্‌ট বক্স আমার হাতে দিয়ে বলল, উই আর গ্রেটফুল টু ইউ [আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ]। প্রণাম করল দুজনে। তৃপ্তিতে দুলে উঠল আমার বুকখানা।

অবগুণ্ঠন খুলে পড়ল শান্তার। আলোর ঝলকে ঝিক্ মিক্ করে উঠল তার বিস্তৃত সীমন্তরেখা। তৃতীয়ার চাঁদের ন্যায় ললাটে শোভা ধরেছে এই বড় এক সিঁদুরের টিপ। অজ্ঞাতে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!

সেদিন জগদ্ধাত্রী পূজা। প্রতিমা দর্শন করে ফিরে আসছি শ্রীরামপুরে।

পাত্রনির্বাচন উদাহরণ (৫)

রিষড়া ষ্টেশনে দেখা শিল্পীর দিদি গীতার সঙ্গে। ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, কালকে কি সবুলীদের বাড়ীতে থাকবেন? থাকলে শিল্পীকে নিয়ে দেখা করতে যাব।

যেও। চারটে পর্য্যন্ত থাকব। আমার ট্রেন এসে পড়ল। রীতার ট্রেন ছেড়ে দিল।

পরদিন বিকাল বেলা। ঘরে ঢুকল শিল্পী। দেখেই চমকে উঠল বুকের মধ্যে। বললাম, ফিরে মা! তোর এমন চেহারা কেন?

কোন জবাব দিল না শিল্পী। প্রণাম করে বসে পড়ল পায়ের কাছে। ডুকরে কেঁদে উঠল। সে কান্নার আওয়াজ শুনে ছুটে এল বাড়ীর মেয়েরা।

কান্না ছাড়া কোন কথা নেই মুখে। ঘরের কোনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে শিল্পীর দিদি রীতা ও ছোট বোন পারুল। বাড়ীর মেয়েদের চোখেও সমবেদনার জল। শিল্পীর আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে তুলে ধরলাম মুখখানা। ভাবা যায় না, মনোবেদনা এত স্পষ্ট আকারে ফুটে ওঠে মুখমণ্ডলে।

তেইশ কি চব্বিশ বছরের তরুণী। তার রূপলাবণ্যের কাছে পূর্ণিমার "আলো"কে মনে হয় ম্লান। দেহাবরণের কাছে পদ্মের পাঁপড়িকে মনে হয় মলিন। তার চোখের দিকে চাইতে লজ্জিতা হয় হরিণী। বিধাতার নিপুন শিল্পী বুঝি তাঁর কল্পনার তুলিতে নিখুঁত করে এঁকেছিলেন শিল্পীর অতিদেহী সত্তাকে। তাই তো নরদেহী শিল্পী যেন কাব্যের অপ্সরী। সেই শিল্পীর চেহারায় ফুটে উঠেছে ক্লান্তি, অভিমান, ঘৃণা ও হতাশার ছাপ। দুই চোখের কোনে ভেসে উঠেছে কাজলের রেখার মত কাল দাগ।

গভীর উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? কোন কাগজপত্রে সই করিস নি তো?

কাতর কণ্ঠে বলল শিল্পী, বুঝতে পারি নি জেঠু। আমি একটুও বুঝতে পারি নি—মাস পাঁচেক আগে, কয়েকখানা ছাপান ফর্ম আমার সামনে রেখে বলল,—টিক্ চিহ্ন দেয়া জায়গাগুলিতে আমার নাম সই ক'রে দিতে। বুঝাল ঐগুলি নাকি রিফিউজী সার্টিফিকেট আর সিডিউল্ডকাস্ট সার্টিফিকেট বের করতে লাগবে। ঐ দুটো সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারলে ওনার অফিসেই আমার ভাল চাকুরী হয়ে যাবে।

কপালে করাঘাত না করে পারলাম না। বললাম, হায়রে হতভাগী! একখানা সাদা পোষ্টকার্ডে পর্য্যন্ত নাম সই করবি না—ব'লে গেলাম। তুই শেষ পর্য্যন্ত অতগুলি ফর্মে সই করলি?

আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল শিল্পী, সেদিন রাত্রে বাসায় ফিরল অফিস থেকে। ওর চোখের চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। চোখগুলি বড়

বড়, লাল। সমস্ত শরীরে কেমন একটা অস্থিরতা। টলতে টলতে ঘরে ঢুকল। আমাকে ডেকে বলল, কাল থেকে তুমি তোমার নিজের পথ দেখে নাও। তুমি আর আমার স্ত্রী নও। তোমাকে ডিভোর্স করেছি। তোমার সব দায়িত্ব থেকে আজ আমি মুক্ত।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, বেইমান! বিশ্বাসঘাতক!! লম্পট কোথাকার!!! ও এক লাফে এসে আমার গলা টিপে ধরল। বেদম মারল। মেঝেতে ফেলে দিয়ে বুকের ওপরে এমন করে চেপে বসল যে প্রাণ যায়। পাঁজরগুলি এখনও ব্যথায় বিষের মত হয়ে আছে। আর একটু দেরি হলে প্রাণেই—আর বলতে পারল না। হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল শিল্পী।

আমিও সহ্য করতে পারলাম না। বেদনামথিত অন্তর থেকে কান্নার ঢেউ বেরিয়ে এল সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত ক'রে। উপস্থিত সবাই কাঁদছে শিল্পীর প্রতি সমবেদনায়।

নিজেকে সামলিয়ে নিল শিল্পী। তার বাঁ হাতে আমার ঘাড়ের দিকটা আগলে নিয়ে, ডান হাতের রুমাল খানায় আমার মুখ চেপে ধরল। বল্‌ল, জেঠু! তুমি কেঁদো না। তোমার প্রেসার [রক্তচাপ] বেড়ে যাবে।

প্রেসার বাড়ে উত্তেজনায়। তাই সবুলী, স্থমস্থমী ও সোনাবুড়ি এগিয়ে এল আমার কাছে। সোনাবুড়ি সন্তর্পনে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। ঘাড়ে ও মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সবুলী ও স্থমস্থমী।

সোনাবুড়ির মা শিল্পীর কানে কানে বললেন, আজ আর ওনাকে কিছু বলো না। বিশ্রাম নিতে দাও একটু। সকাল থেকে বিরাম নেই কথা বলার।

সোনাবুড়ির কাকীমা তাঁর বড় জাকে সমর্থন করে বললেন, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে ওয়ালটেয়ারে রওনা হতে পারবেন না সন্ধ্যায়।

আমি ওয়াল্‌টেয়ার থেকে ফিরে এলে দেখা করবে বলে জানাল রীতা। 'আজ আসি' ব'লে প্রণাম ক'রে বিদায় নিল তিন জনেই। কাছে রইল বাড়ীর মেয়েরা। বলল সবুলী, জেঠু তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।

ঘুমাব কি? চোখ বুঁজলেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে শিল্পীর কান্নাভরা মুখ খানা।

অদ্ভুত মেয়ে এই শিল্পী। তার বুকটা শুধু ভালবাসাতেই ভরা। সে জানে

লেখা-পড়া, জানে সেলাইয়ের কাজ। আর জানে ভালবাসতে আর হাসতে। হাসির রেখা লেগেই আছে তার সুডোল অধর কোনে। সেই মেয়ের চোখে জল! ভাবতে বিস্ময় লাগে, এত ভালবাসার স্পর্শেও নির্মল হল না পরিমলের অন্তর। পরিমল যে শিল্পীকে প্রেমের আগুনে পুড়িয়ে কামের সাঁড়াশি দিয়ে এমন করে পিষে মারবে, তা শিল্পীর সরল মন কল্পনাও করতে পারেনি।

সে প্রায় ন' বছর আগের কথা। শিল্পী তখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী। পরিমল তার গৃহশিক্ষক। তরুণ যুবক। এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিল নিজে নিজে। বেশ দরদ দিয়ে পড়াত শিল্পীকে। দশ বার বোঝাতেও ক্লান্তি ছিল না পরিমলের। শিল্পীকে জলপাণি সে পাওয়াবেই। তাই রবিবারের দিনও পড়াতে আলস্য ছিল না পরিমলের।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করল শিল্পী। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হল। তবে জলপাণির নাগাল পেতে আরও কসরতের প্রয়োজন ছিল।

জেদ চেপে গেল পরিমলের। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করাবেই ছাত্রীকে। দ্বিগুণ উৎসাহে পড়ান শুরু করল শিল্পীকে।

শিল্পীরও কৃতসঙ্কল্প,—প্রথম দশজনের একটি স্থান সে অধিকার করবেই। কিন্তু এদিকে পরিমল যে তার হৃদয়ের সবটুকু স্থান অধিকার ক'রে বসে আছে তা সে এতদিন বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারল সেদিন কলেজ থেকে ফিরে। সবার ছোট বোন পারুল নাচতে নাচতে আনন্দের সংবাদ দিল শিল্পীকে। বলল, এই মেজদি! তোর না বিয়ে। সামনের মাঘ মাসে। কি মজা! মা, বড়দি আর জামাইবাবু টালিগঞ্জে গেছে ছেলেকে দেখতে।

বিশ্বাস করল না শিল্পী। ভাবল তাকে তো কোন পাত্রপক্ষ দেখে যায় নি। আবার সন্দেহ হল মনে—পারুলই বা বানিয়ে বলবে কেন?

মা, বড়দি ও জামাইবাবু ফিরে এল সন্ধ্যার পরে। সন্দেহ দূর হল—পাকা দেখার বন্দোবস্ত হচ্ছে শুনে।

কিন্তু পাক দিয়ে উঠল শিল্পার অন্তরে। পরিমলের কাছ থেকে চলে যেতে হবে বহুদূরে। হৃদয়ের গোপন তন্ত্রীতে পড়ল টান। ম্লানমুখে বসে রইল পড়ার ঘরে।

পরিমল তো পেতেই রেখেছিল তার প্রেমের ফাঁদ। শিল্পীর অন্তর বেদনার সুর শুনতে পেয়েই খুলে দিল সেই ফাঁদের মুখ। সুযোগ বুঝে শিল্পীর মাথাটা টেনে নিল বুকের কাছে। সোহাগের চিহ্ন এঁকে দিল তার কপোলে।

বলল,—তোমার জন্য এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম কেন করছি তা বুঝতে পার না? তুমি যে আমার!

শিল্পী জানিয়ে দিল বাড়ীতে—সে পরিমল ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

খুব রেগে গেলেন রমানাথবাবু। খুবই গোঁড়া লোক। মাহিষ্য ক্ষত্রিয় তেজ, গর্জন করে উঠল ভিতর থেকে। বললেন্ আমার মেয়ে বিয়ে করবে সহায় সম্পদহীণ বেকার ছেলেকে! হোক না কেন সে বামুনের ছেলে। এ বিয়েতে আমার এতটুকু মত নেই।

কিন্তু মত বদলাল না শিল্পী। সিদ্ধান্তে অটল রইল সে। খুব প্রহার করলেন রমানাথবাবু। সাত দিন শয্যাগত হয়ে থাকল শিল্পী। একদিন শেষ রাত্রে পালিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

পাঁচ মাস পরে ফিরে এল শিল্পী—সিঁথিতে সিন্দুর নিয়ে। সঙ্গে পরিমল। প্রণাম করতে এসেছিল মা ও বাবাকে। কিন্তু রমানাথবাবু পাড়ি দিয়েছেন পরলোকে—শিল্পী পালিয়ে যাবার পক্ষকাল পরেই। মানী লোক। মনে লেগেছে মেয়ের ব্যবহারে। থ্রম্বসিসের মৃদু ধাক্কায় মায়া কাটালেন এ পৃথিবীর। শিল্পীর মাও শোকে দুঃখে কাশীবাসিণী হয়েছেন গত মাসে।

বিয়ের পর দুটোবছর বেশ ভালভাবেই কেটে গেল শিল্পীর। কুমারী হৃদয়ে প্রেমের যে মূর্ত্তি গড়ে তুলেছিল শিল্পী তার বাস্তব মূর্তনা পেল পরিমলের মাঝে। তাই তো মহাখুশীতে ঘর বেঁধেছিল মনের সব মাধুরীটুকু ঢেলে দিয়ে।

কিন্তু সে সুখের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল পল্লবী। শিল্পী জানতে পারল—আবার তার প্রেমের ফাঁদ পেতেছে পরিমল। বুঝতে বাকী রইল না শিল্পীর যে, পরিমল ব্যবহারিক অভিব্যক্তিতে মানুষের কাম্য হলেও প্রকৃতিতে [স্বভাবে] সে পূর্ণমাত্রায় কামুক। প্রেমের অভিনয় ক'রে ছাত্রীদেরকে কাছে টেনে নিয়ে কামের সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরে। ইতোমধ্যে আরও তিনটি মেয়ের সর্বনাশ করেছে। যতবার বাধা দিয়েছে ততবারই শিল্পী লাঞ্ছিতা হয়েছে পরিমলের হাতে।

পল্লবী বিবাহিতা। সদ্যবিবাহিত স্বামীকে ডিভোর্স ক'রে বাপের বাড়ী ফিরে এসে পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে গত বছর। সেই পল্লবীর পাল্লায় পড়েছে পরিমল। পল্লবীই নাকি পরিমলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবচাইতে মেধাবী। ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজ বিজ্ঞানে জ্ঞান বাড়াবার জন্য দু'বার এডুকেশন ট্যুর হয়ে গেছে এরই মধ্যে। পরিমলই ছিল সেই ট্যুরের গাইড্।

পল্লবী তার বাপের একমাত্র মেয়ে। মিঃ গুপ্ত, মানে পল্লবীর বাবা একজন অফিসার—আবগারী বিভাগের। তাঁর আয়ের পরিমাপ করা আয়কর অফিসের পাকা অফিসারের পক্ষেই হয়তো সম্ভব। তিনি দ্বারস্থ হলেন পরিমলের। প্রস্তাব দেন তাঁর মেয়েকে বি. এ. পাশ করিয়ে দিতেই হবে। টিউশন্ ফীর জন্য থাকবে ব্ল্যাঙ্ক চেক্। দুশো, তিনশো, খুশীমত বসিয়ে নেবে পরিমল। পরিমল রাজী হয়েছিল।

পল্লবীকে পড়ান শুরু করেছিল পরিমল শুভদিন দেখে। কিন্তু পল্লবী? বি. এ. পাশ করবে কি? বিয়ে করে মা হবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল তীব্রতর ভাবে। তাই গুপ্ত বাড়ীর তেতলার পড়ার ঘরে বাগদেবীর চর্চ্চা হলেও কামদেব তাঁর আনাগোনা বন্ধ করলেন না।

কিন্তু পরিমলের কামনা পূরণের পথে বাধা হল শিল্পী। তাই ছলে বলে কৌশলে সে কাঁটা সরিয়ে ফেলেছে আইনের সাহায্যে। শুধু তাই নয়। বেআইনীভাবে, ভয় দেখিয়ে, ঔষধ খাইয়ে মুছে ফেলেছে শিল্পীর জীবন থেকে তার নিজের শেষ অভিজ্ঞানটুকু।

সব কিছু নীরবে সহ্য করেছে শিল্পী। পাড়ার ছেলেরাও জানে শিল্পীর ওপরে পরিমলের অত্যাচারের কাহিনী। তারা বার বার বলেছে শিল্পীকে—আপনি একবার শুধু ইঙ্গিত দিন। আমরা পরিমলকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনার গায়ে হাত না দিতে পারে কোন দিন। রাজী হয়নি শিল্পী। সে যে ভালবাসে পরিমলকে। দয়িতকে দলন করবে দল লাগিয়ে দিয়ে! প্রিয়কে প্রহার করবে পাড়ার ছেলেরা!! ভাবতেও পারে না শিল্পী। তার দাদাও ডেকেছে বার বার—তুই চলে আয় বাড়ীতে। তোর জন্য বাড়তি খরচ হবে না আমাদের। শিল্পী শোনেনি সে কথা। প্রত্যাখ্যান করেছে শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব। প্রহার সহ্য করেছে একাধিকবার। একটি কথাই বলেছে বার বার, ওকে যে ভালবাসি।

ভাবতে ভাবতে মন বিদ্রোহ করে ওঠে। মনে হয় ছুটে গিয়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আসি পরিমলকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেই—ম্যাকবেথ হত্যা করেছিল ঘুমকে। পরিমল হত্যা করেছে প্রেমকে! পরিণামের জন্য কি বুক কাঁপে না তার? ম্যাকবেথের জীবন থেকে কি শিক্ষা পায় নি—বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি কি?

ম্যাকবেথ ভুল করেছিল ডাইনীদের কথা বিশ্বাস ক'রে। কিন্তু কি ভুল

করেছিল শিল্পী ? সে তো ভালবেসে ছিল পরিমলকে। এখনও ভালবাসে তাকে। তবে তার এ শাস্তি কেন ?

শিল্পীও ভুল করেছিল তার বাবা-মার নিষেধ না শুনে। শিল্পী পাকা আমের লাল রঙ দেখেছে। কিন্তু সিঁদুরে আম যে কাঁচাতেও লাল দেখায় তা সে জানে না। জানেন তার বাবা মা—অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান থেকে। প্রেমের স্বরূপ কি তাও যেমন জানেন, তেমনই জানেন কামনা মথিত মদনের স্বরূপ। তাই তো মানা করেছিলেন প্রেমের মুখোস পরা কামুককে বিয়ে করতে।

আরও একটা ভুল করেছিল শিল্পী। সে ভুলে গেল ঋষির বাণী "ভালবাস, কিন্তু মাখামাখি করো না।"

আত্মদানের আগে মাখামাখি করলে মোহ জেগে ওঠে মনে। মোহগ্রস্থ মন ভুলে যায় যে, ভালবাসা আর বিয়ে এক জিনিষ নয়। ভালবাসলে বিয়ে না করলেও চলে। কিন্তু বিয়ে করলে ভালবাসতেই হবে। ভালবাসা বিহীন বিয়ে অচল। মোহে অন্ধ হলে তো আর কথাই নেই। যাকে বিয়ে করতে মন চায় তার বাকী সবটুকু ঢাকা থাকে অন্ধকারে। দেখতে পায় না। তাই শিল্পীও দেখতে পায়নি পরিমলের মধ্যে লুকান মানুষটিকে। নিষেধ মানেনি মা ও বাবার।

মা-বাবাও ভুল করেছেন বিরাট। তারা শিল্পীকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু নিরোধ করার জন্য করণীয় যা তাতো করেন নি।

ভ্রান্ত নির্বাচন রোধে করণীয়

বাবা হিসাবে রমানাথবাবু কি মেয়ের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করেছিলেন যাতে মেয়ে বাবাতে অনুরাগ মুখর হয়ে থাকে ? তার একাগ্রসম্বেগ বা ভালবাসার টান ছিঁড়ে না যায় ? না, তা তিনি করেন নি। সে প্রমাণ পেয়েছি শিল্পীর মাকে প্রশ্ন ক'রে। শিল্পী যেমন ছিল সুন্দরী তেমন ছিল জেঁদী। তার দুষ্টুমির দাপটে অস্থির হয়ে উঠত গোটা পরিবার। তাই বাবার হাতের কিলচড় তার পিঠে যে কত পড়েছে তার হিসেব কেউ রাখেনি। তাই শিল্পী যে বিকৃত পছন্দের শিকার হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কী ?

তাছাড়া, ফল তো আর একদিনে পাকে না। যে ফল পাকলে বিষফলে পরিণত হতে পারে তাকে কচি অবস্থাতেই ছিঁড়ে ফেলা উচিত ছিল। অবশ্য বিচক্ষণ অভিভাবক হলে বিষবৃক্ষ লাগাবার আগেই ভেবে দেখতেন যে ঐ বৃক্ষ গৃহের পরিবেশকে বিষিয়ে তুলবে কি না !

তরুণ গৃহশিক্ষক না রাখা

পরিমলের মত একজন তরুণ ছাত্রকে তার তরুণী কন্যার গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করবার আগে রমানাথবাবু একবারও ভেবে দেখেন নি যে, এটা 'পেনীওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ' হয়ে যাচ্ছে। আর্থিক অসচ্ছলতার সুরাহা করতে চেয়েছিলেন রমানাথবাবু। তাই অপর দশজন অভিভাবকের মত তিনিও অপেক্ষাকৃত অল্প পয়সায় তরুণ ছাত্ররা, সবে স্নাতক হয়েছে, এমন ব্যক্তিকেই পছন্দ করেছিলেন শিল্পীর গৃহশিক্ষক রূপে। অভিজ্ঞ, বয়স্ক, বিশেষ করে কোন্ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকের বাজার গরম। তাই পরিমলের হাতেই মেয়েকে পড়ানর ভার দিয়েছিলেন অবশেষে।

রমানাথবাবুর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি কেমন ক'রে ভুলে গেলেন যে সাধারণতঃ রজস্বলা হলেই মেয়েদের অন্তরে সমবিপরীত সত্তার প্রতি একটা সহজাত টান গজিয়ে ওঠে। তাতে কামুকতার গন্ধ থাকে না। থাকে পুরুষের কাছে স্বীকৃত ও প্রশংসিত [appreciated and adored] হবার আকাঙ্ক্ষা।

অপর পক্ষে তরুণদের মনেও জেগে ওঠে তরুণীদের কাছে প্রশংসিত ও সম্বর্দ্ধিত হবার আগ্রহ। মেয়েরা তাদের গুণমুগ্ধ হোক, তাদেরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখুক—এই বাসনা স্বতঃই অন্তরে জেগে ওঠে। এখানেও কামুকতার পুতিগন্ধ না থাকতে পারে। থাকে ভাললাগার আমেজ, পূজা পাবার আগ্রহ, আর গৌরবান্বিত হবার আকাঙ্ক্ষা। তাই তরুণ শিক্ষকরা স্বভাবতঃই ছাত্র অপেক্ষা ঐ বয়সী ছাত্রীদের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রবণ, সেবাপ্রাণ, পরিশ্রমী ও দরদী হয়ে ওঠেন। পড়ায় ভুল করলে বা অবাধ্য হলে ছাত্রের জন্য যে শাসন বা শাস্তির বরাদ্দ রাখেন, তা ছাত্রীর প্রতি প্রয়োগ করেন অনুকম্পাজড়িত আবদার মাখা দাবীর আকারে। ফলে পাঠ আরম্ভে গৃহশিক্ষকের প্রতি যে ছাত্রজনোচিত মনোভাব থাকে তা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে থাকে। গৃহ শিক্ষকের আদর সোহাগ অনুকম্পায় এবং শাসনের শিথিলতায় ঐ তরুণ শিক্ষক সম্বন্ধে ছাত্রীর মনে রঙ ধরতে থাকে। ঐ ছাত্রীর গৃহপরিবেশ, বিশেষ ক'রে মা ও বাবা যদি তার কাছে আকর্ষণ বা আগ্রহের পাত্র না হন তাহলে ছাত্রীর মনের ঐ রঙ্ রূপায়িত হয় "রাগে"। পক্ষান্তরে তরুণ শিক্ষক যদি আকারে-ইঙ্গিতে তার ভূমিকা পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে ছাত্রীর অনুরাগ কামনা-লাঞ্ছিত হতে কালবিলম্ব করে না। তাই গৃহশিক্ষিকার অভাবে মেয়ে যদি পরীক্ষায় ফেলও করে সেও ভাল। কিন্তু অন্ততঃ পিতার দেড়গুণ বয়সী অভিজ্ঞ শিক্ষক না পেলে পরিমলের মত তরুণ

গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে দিয়ে জীবনের ফুলমার্কস থেকে মেয়েকে বঞ্চিতা করা যে ঠিক নয় তা রমানাথবাবু দেখে যেতে পারলেন না।

অনেক বাবাই দেখতে পান না, বা চান না যে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালে ছেলেমেয়েদের কি ক্ষতি হয়। তাঁদের মতে সহশিক্ষা তো [Co-education] আজকের অভ্যাতাব আশীর্বাদ। প্রগতির পথে পদক্ষেপ। তাঁরা উদাহরণ দেন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি সুসভ্য বলে কথিত দেশগুলির। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও আর্থিক উন্নতিতে এদের জুড়ি কোথায়। তাই তো সারা ভারত জুড়ে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান—বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে। এতে সাশ্রয় হয় দেশের অর্থের, প্রশ্রয় ও সুযোগ পায় মেয়েরা অর্থকরী বিদ্যা শিখবার। দেশের উন্নতির পথ হয়ে ওঠে প্রশস্ত।

সহশিক্ষা বর্জন করা

কিন্তু এই সকল পিতাকুল কি বিলকুল ভুলে যান যে, মানুষকে স্বাস্থ্যবান দেখাতে পারে দুই কারণে। সুস্থতার পুষ্টতায় যে স্বাস্থ্য তা মানুষকে আতঙ্কিত করে না। অপরপক্ষে নেফ্রাইটিস রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকেও স্বাস্থ্যবান মনে হয়। তার হাত, পা বা মুখে চোখে ফুটে ওঠে ভিটামিন বা প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের প্রভাবের মত প্রভাব। কিন্তু সে ব্যক্তি যে মরণ-প্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে তা বুঝতে পারেন অভিজ্ঞ ডাক্তার।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও আর্থিক উন্নতিতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় দীপ্তিমান হলেও ঐ সকল সভ্য দেশের মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যে ভাঙনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে তা শুনতে পান একমাত্র জনজীবন বিশারদ যাঁরা—তাঁরা। তাই তো প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ কেনেথ হ্যামিলটন লিখেছেন—"আজ আমাদের ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবন যে বিচ্ছিন্নতায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে আমরা ক্রমশঃই সচেতন হয়ে উঠছি। আমাদের জীবনের চতুর্দিকে ঘিরে আছে ভগ্নচুক্তি, ভগ্নসন্ধি, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, ভগ্নগৃহ, ভগ্নমন, এবং ভগ্ন আশাজনিত সমস্যা সমূহ।*

এই সব ভাঙনের কারণ কি? বিশেষ করে পারিবারিক তথা মানসিক ভাঙনের কারণ যে কি তা বিশ্লেষণ করে দেখবার সময় এসেছে।

প্রথমতঃ যে বয়সে ছেলেমেয়েদের যৌন চেতনার উন্মেষ হয়, সেই বয়সে স্বভাবজ আকর্ষণজনিত আকাঙ্ক্ষায় পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাবার জন্য

*Dr. Kenneth Hamilton : What is New in Religion.

আকুল ও উদ্দাম হয়ে ওঠে সেই সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এইরূপ অবাধ মেলামেশার সুযোগ বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে এমন দুর্ভোগকে আহ্বান করে নিয়ে আসতে পারে বা এনে থাকে যা দূর ক'রে মেয়ের জীবনকে বিপন্মুক্ত করতে অনেক খেসারত দিতে হয় মেয়ে ও তার অভিভাবক উভয়কেই।

যে দেশের মানুষের সামাজিক চেতনা ভিন্ন, যাদের যৌন জীবনের নীতি-বোধ প্রাচ্যের নীতিবোধ থেকে স্বতন্ত্র, যে দেশের মায়েরা তাঁদের মেয়েকে "বয়ফ্রেণ্ড"-সহ ব্রেকফাস্ট করতে দেখলে খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠেন, এবং বাবা ছেলের গার্লফ্রেণ্ডকে গেস্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গর্ববোধ করেন, যে দেশের শতসহস্র তরুণ-তরুণী পরস্পরকে জেনে ও যাচাই করে নিয়ে ঘর বাঁধে—সে দেশের দাম্পত্য সুখের ঘরে আগুন জ্বলে ওঠে কেন? কেন শতসহস্র তরুণ-তরণী পার্কে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গাছের তলে বসে অসহায়ের মত হাহাকার করে?

মনীষীগণ এর কারণ যে অনুসন্ধান করেন নি তা নয়। মনীষী জি. এস. হল বললেন—"স্কুল-কলেজে প্রতিদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে যুবক-যুবতী তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণতা ও তারুণ্যের দীপ্তি হারিয়ে ফেলে। এ বিষয়ে মেয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী। কারণ বালিকারা বালকদের অপেক্ষা বেশী সহানুভূতিপ্রবণ এবং তারা একটু বেশী সহজেই অন্যভাবে অভিভূত হয়।"*

স্কুল-কলেজে সহশিক্ষার প্রভাবে বিশেষ ক'রে তরুণীদের সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রবণতা [bloom and delicacy] শুখিয়ে যাবার ফলে বিবাহিত জীবনে পরস্পরকে সুখী করবার জন্য নির্ভর করতে হয় শুধু যৌন সম্বার ও সম্ভোগ-কুশলতার ওপরে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই কেবলমাত্র যৌন সম্ভোগ স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে মধুময় করে তুলতে পারে না। তাই খুঁটিনাটি কারণেই এদের জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরতে দেরি লাগে না।

বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর পুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের প্রশ্নের উত্তরে সহশিক্ষা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বিশ্বের চিন্তাশীল ও লোক-কল্যাণকামী নেতৃবৃন্দকে ভেবে দেখতে বলি। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন:

*"Great daily intimacy between the two sexes especially in schools and colleges, tends to rub off the bloom and delicacy which can develop in each. Girls suffer in this respect more than boys'. Girls are more sympathetic than boys, moreover the girls are more easily prejudiced.
G. S. Hall: 'youth'; Page-307

"কো-এডুকেশনের ফল ভাল হয় না। অতি নৈকট্যে তৃপ্তির সঙ্গে দুর্বলতার প্রশ্রয়ের দরুণ উভয়ের প্রতি উভয়ের আমন্ত্রণী আকর্ষণে প্রত্যেকে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে massoeffiminacy [পুরুষালী নারী-স্থলভতার] এক একটি উদ্ভট সংস্করণ হয়ে দাঁড়ায়। ঐকান্তিক মোহে পুরুষ তার চিন্তা, চলন, হাবভাব, পোষাক-পরিচ্ছদে নারী-স্বারূপ্য লাভের সাধনায় মশগুল হয়। নারীও হয় তেমনই ভাবে অস্বাভাবিক রকমের পুরুষোচিত হাবভাব ও ভঙ্গীওয়ালা [Masculine air, attitude and pose ওয়ালা]।

নারী সম্বন্ধে ক্রমাগত নিষ্প্রয়োজন, অস্বাভাবিক, নিষ্ফল যৌন কল্পনার ফলে [prolonged, unnecessary, abnormal, futile sex imagination] পুরুষের মানসিক পুরুষত্বহীনতা [Psychological impotency] দেখা দেয়। এবং নারী পুরুষোচিত প্রকৃতি আয়ত্ব [masculine nature imbile] করার ফলে দাম্পত্যজীবনে পুরুষের মত পূজা চায় এবং তার ফলে স্বতঃই inferior [নিকৃষ্ট]-এর প্রতি inclined হয় [ঝোঁকবিশিষ্ট হয়] যে কিনা তার হুকুমের গোলাম হয়ে চলবে। এতে দেশে অগণিত নিকৃষ্ট বিকৃত সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যদি সম্মানজনক ব্যবধান না থাকে, উভয়ের সুস্থ, স্বাভাবিক যৌন সম্বেগ লোপ পায়। Lifeless, artificial, debilitated sex-life থেকে [প্রাণহীন, কৃত্রিম, দুর্বল যৌনজীবন থেকে] শক্তিমান জীবন গজায় না। Nation fall করে [জাতির পতন হয়] আমার মনে হয় এতজ্জাতীয় নৈতিক দুর্বলতাই ফরাসীদের পতনের অন্যতম কারণ। সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা আজও যদি এ বিষয়ে সাবধান না হয়, অদূর ভবিষ্যতে সে তার বিষময় ফল বুঝতে পারবে।"

বুঝতে পারেন নি রমানাথবাবু। বাড়ীর কাছে মেয়েদের স্কুল ছিল ঠিকই। কিন্তু মেয়ে বায়না ধরল, "রেজাল্ট ভাল করতে হলে ভাল স্কুলে পড়তে হয়।" তাই ক্লাস নাইনে প্রমোশন পেলে মেয়েকে ভর্তি করে দিলেন দেশপ্রিয় বিদ্যানিকেতনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফল ভাল করল শিল্পী। কিন্তু সারাজীবনের পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল পাস-মার্কস না পেয়ে।

পাশ করতে হলে শিখতে হয় এমন ক'রে যাতে প্রয়োগের সময় ভুল না হয়ে যায়। শিক্ষা এবং তার প্রয়োগ সমার্থক হয় তখন যখন মানুষ শিক্ষা

শিক্ষার প্রয়োজন

করে তার বৈশিষ্ট্যের ওপরে দাঁড়িয়ে। মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে "নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। কুমারী মেয়েদের শিক্ষা এমন হবে যাতে তার বৈশিষ্ট্য বর্দ্ধনশীল, উন্নতিপ্রবণ ও অব্যাহত হয়। তার বোধ ও চেতনা যেন এমনভাবে জাগ্রত হয়ে ওঠে যাতে সে বুঝতে পারে, "বৈশিষ্ট্যকে উল্লঙ্ঘন করে শিক্ষালাভ করা আর জীবনকে নপুংসক ক'রে তোলা একই কথা।" তার জীবনের মূল্যবোধ যেন এমন প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে যাতে সে অনুভব করতে পারে যে তার নির্ভুল ও পরিশুদ্ধ চলনার ওপরে নির্ভর করছে সংসার, সমাজ ও জাতীয় জীবনের বনিয়াদ। তাই বিবাহের ব্যাপারে মেয়েরা যাতে কখনও ভুল না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের মা ও বাবাকে। মা ও বাবার শিক্ষা মজবুত হলেই তো শিশু বেড়ে ওঠে নির্ভুল পদক্ষেপে।

বিবাহের গুরুত্ব সম্বন্ধে সাচেতন করে তোলা

প্রায় সব শিশুই জানে যে মানুষের বিয়ে হয়। বিয়ে বিয়ে খেলাও করে অনেকে। কিন্তু বিয়েটা যে খেলনা নয় তাকি তারা জানে? না তারা জানে না।

আমরা বয়স্ক যারা তারাও সবাই কি জানি বিয়েটা প্রকৃত পক্ষে কি? কেউ ভাবি, বিয়েটা দুটি নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত মিলন আকাঙ্ক্ষার সামাজিক স্বীকৃতি। কেউ ভাবেন, ঘর বাঁধতে গেলে ঘরণী চাই, তাই বিয়ে। কারও কারও ধারণা সংসারের সব কাজ একা করা যায় না। প্রয়োজন হয় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর। তাই বিয়ে। মেয়েদের অনেকের মনে আশঙ্কা—সারাজীবন বাপ ভাইএর গলগ্রহ হয়ে থাকব নাকি! যাতে তাড়াতাড়ি বিয়ের ফুল ফোটে তার জন্য সন্তোষী মার চরণে মানত করতেও ছাড়ে না অনেকে।

কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে এক গ্লাস পানীয় জল গ্রহণ করি কত হিসাব করে: গঙ্গার জল না ডোবার জল, শুদ্ধজল না নোংরা জল, ক্ষরা জল না মৃদু জল, এজল নেয় না পরিত্যাজ্য। কিন্তু একজনের পাণি গ্রহণ করার পূর্বে অত হিসাব করি কি? তাই ডঃ হার্সফিল্ড বললেন:

প্রায় লোকে ব্যবসার অংশীদার পছন্দ করতে গিয়ে যতটা হিসাব করে, জীবনের সহধর্ম্মিনীকে পছন্দ করার সময় তার চেয়ে ঢের কম বিচার করে। মানুষ পাচক নির্বাচন বা একখানা মোটর কার বা একটা গরু কেনায় যতটা

হিসাব করে তার চেয়ে ঢের কম হিসাব করে, স্বামী বা স্ত্রী মনোনীত করার সময়ে।"*

এর কারণ কেবা না বোঝে? পাচক, মোটরকার বা গরুর গুরুত্ব বোঝে সবাই। যার হাতে তৈরী হবে মুখের গ্রাস, তার মুখ ও মেজাজ যদি মিষ্টি না হয়, তবে তার হাতের রান্না যতই ভাল হোক না কেন তা যে মুখে রুচবেনা তা কে না জানে? পাচকের যদি হাতটান দোষ থাকে তবে ভাড়ার ঘরের বাজেট বেড়ে যাবে হাতের বাইরে। তাই তো অত হিসাব করতে হয় পাচক নির্বাচনে।

মোটর কার যদি হাজার মাইল দৌড়াবার পরই পথে অনড় হয়ে বসে পড়ে তবে তাকে পথচারীর মর্জির ওপরে ফেলে রেখে চলে আসতে হবে ঘরে। নিতান্তই মায়া কাটাতে না পারলে খবর দিতে হবে পুলিশকে। 'কার' ঘরে ফিরে পাবেন ঠিকই। তবে আর একখানা নূতন 'কারের' খরিদ দাম বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে। তাই তো অত বিচার, কারের "মেক" ও "মডেল" সম্বন্ধে।

গরু যদি প্রয়োজনানুরূপ দুধ না দেয়, বা যা দেয় তার চাইতে খায় বেশী তবে সেগরু গোয়ালে রেখে লাভ কি? আর দুষ্ট গরু হ'লে তো কথাই নেই। তার চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভাল।

ব্যবসায়ের অংশীদার যদি অসাধু হয়, তাহলে তো খুবই সমস্যা। লাভ এবং আসল দুইই হারিয়ে আপসোস করতে হবে ঘরে বসে। তাইতো মানুষ অত হিসাব করে বিজ্‌নেস-পার্টনার মনোনয়নে।

লাইফ-পার্টনার [জীবন সঙ্গী] মনোনয়নে শুধু মনের ওপরে নির্ভর করতাম না যদি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারতাম জীবনের পার্টনারের [স্বামী বা স্ত্রী] গুরুত্ব কতখানি। বিয়েটা আসলে কি ও কেন তা যদি সঠিকভাবে জানতাম তাহলে আমরা কেউই এত উদাসীন হতাম না এ ব্যাপারে।

সারা দেশ জুড়ে আছে সরকারের রেজিষ্ট্রী অফিস। একটি তরুণ ও একটি তরুণী পরস্পর প্রেমাসক্ত [না মোহগ্রস্ত] হয়ে যখন কোন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে আবেদন করে তখন রেজিষ্ট্রার মহোদয় কি একবারও জিজ্ঞাসা করেন, তাদের উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য কত? তিনি ঐ প্রেমিকের প্রায় সমবয়সী প্রেমিকাকে কি একবারও স্মরণ করিয়ে দেন যে—

* নারীর পথে, P. 23-24.

"তুমি ও তোমার স্বামীর মধ্যে
বয়সের নৈকট্য থাকিলে
যখন এমনতর বয়সের সহিত
সাক্ষাৎ হইবে,

যেখানে ক্ষয়ের প্রাবল্য
জীবনকে পরিচালিত করিতেছে—
তখন উভয়ে উভয়ের জীবনী শক্তি
আকর্ষণ করায়

ক্ষয়ের প্রাবল্য
এত মাথা তোলা দেবে
যে মৃত্যুকে স্পর্শ করা ছাড়া
উপায়ই থাকিবে না।"*

বোধ হয় না। আর স্মরণ করালেই বা শুনছে কে? 'আপনাকে তো উপদেশ দেবার জন্ত রাখা হয় নি! আপনার কাজ রেজিষ্ট্রী করা, রেজিষ্ট্রী করুন।' এমন মন্তব্যও শুনতে হতে পারে।

রেজিষ্ট্রার মহোদয় কি খোঁজ করেন কে কোন বর্ণের বা কোন বংশের? তাদের একজনের কৃষ্টি ও বংশানুক্রমিকতা [Culture and heredity] অন্ত জনের কৃষ্টি ও বংশানুক্রমিকতার সঙ্গে সদৃশ [Compalible] কি না? গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির মিলনের সময় [at the time of mating] মেল ও ফিমেলের "হেরেডিটি" ও "পে-ডিগ্রী" হিসাব করা হয়, অতি সাবধানতার সঙ্গে। কারণ "মেল" থেকে "ফিমেল" অর্থাৎ ষাঁড় থেকে গাভী, মর্দা ঘোড়া থেকে মাদী ঘোড়া এবং কুকুর থেকে মাদী কুকুর যদি উচ্চকৃষ্টি ও উচ্চবংশক্রমিকতা [higher culture and pedegreed] সম্পন্ন হয় তাহলে গরু, ঘোড়া বা কুকুরের বংশধারা যে অপকৃষ্ট হতে হতে আহান্নমে লুপ্ত হয়ে যাবে, তা যে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষিত সত্য। আর এমনতর মিলন ঘটলে গরুর দুধের পরিমাণ পনের সের থেকে পাঁচ সেরে নেমে আসবে, প্রভুভক্ত অ্যালসেশিয়ান কুকুর হয়ে উঠবে প্রভুবিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক।

প্রজনন বিধি [Law of Eugenics] যে উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগত এবং

*শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র : নারীর নীতি

মনুষ্যজগতে এক [Same] তা কি প্রেমিক যুগলকে রেজিষ্ট্রার মহোদয় একবারও বোঝাতে চেষ্টা করেন ? করলেই বা তা মানছে কে ?

মানবার জন্য এলে শুধুমাত্র মনের আবেগের উপর নির্ভর করত না আজকের তরুণ-তরুণীরা। উভয়ের মেজাজ [Temperament] উভয়ের পরিপূরক হবে কিনা তা অন্ততঃ একবার ভেবে দেখত। কিন্তু তারা জানে, ভালবাসাই তো সব। বিয়েতে আবার মেজাজের স্থান কোথায় ? বিয়ে কি তারা দেখে নি নাকি ? বিয়ে মানেই তো ভালবাসা তা কি তারা জানে না ? উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। তাই তো এসেছে প্রজাপতি অফিসে। নাই বা হল সামাজিক বিয়ে।

সামাজিক বিয়েও তারা অনেক দেখেছে। পুরুষ ও নারী—দুটি সমবিপরীত সত্তা হাতে হাত দিয়ে সঙ্কল্প গ্রহণ করে—উভয়ে উভয়কে বহন করবে সারাজীবন ধরে। কনে বলে বরকে :

ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

অর্থাৎ—আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার হোক।*[1]

এই মন্ত্রের সার্থকতা কোথায় ? "আমার হৃদয় তোমার হোক কেন ? আর "তোমার হৃদয়ই বা আমার" হবে কেন ? এর অর্থ, আমার হৃদয়ে যা নাই তোমার হৃদয়ে তা আছে। আর তোমার হৃদয়ে যা নাই, তা আমার হৃদয়ে আছে। তাই পরস্পর হৃদয় বিনিময় ক'রে পরস্পরের দ্বারা পরস্পর পূরিত [fulfilled] হয়ে পরিপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী হতে চায় দুজনে।

জন্ রাস্কীন বললেন, "একজনের যাহা নাই, আর একজনের তাহা আছে। দুজনে দুজনকে পরিপূরণ করে।*[2]

পরস্পর পরস্পরকে পরিপূরণ করে বলেই বহন করে উভয়ে উভয়কে। চলার পথে শ্রান্ত হয়ে পড়ে মানুষ। অভাব, অভিযোগ, আঘাত, সংঘাত স্তব্ধ করে দিতে চায় মানুষের চলার গতি। ক্লান্তি ও নিরাশা ঘিরে ধরে মানুষকে। মানুষ তখন চায় একটু বিশ্রাম, একটু প্রেরণা। এই প্রয়োজনের তাগিদে পুরুষ কামনা করে নারীকে, নারী পুরুষকে। "নারী ও পুরুষের মিলন একটা প্রাকৃতিক ক্ষুধা। উভয়ে উভয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে [Induced]

*1 পুরোহিত দর্পন।
*2 Jhon Ruskin—Sesaure & Lyly.

উভয়ের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে পাকা ও নিরবচ্ছিন্ন [Solid and Continuous] করতে চায়।"*১ তাই এই মিলনকে বলে 'বিবাহ'—বিশেষ ভাবে বহন করা। স্ত্রী বহন করে স্বামীকে—তার মত ক'রে। তাই তো তাকে বলা হয় 'বধূ'। স্বামী বহন করে স্ত্রীকে—তার সকল অভাব পূরণের মাধ্যমে। তাই সে তার স্ত্রীর পতি। অর্থাৎ, পূরণ করে যে। তাই বিবাহে নারী তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আমায় ধর।' আর পুরুষ তার পাণি গ্রহণ ক'রে বলে—

"আমি তোমার হাত ধরলাম
যাতে সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠতে পারি।
আর তুমি তোমার স্বামীর পার্শ্বচারিণী হয়ে
বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চল।"*২

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতা কে না স্বীকার করবে? একজনের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া অন্যজন যে অচল তা চলতে গিয়ে ঠেকে ঠেকে শিখেছে মানুষ। একজন ছাড়া অন্যজনের জীবন সার্থক হতে পারেনা তা সকলেই জানে। একজন যেন মাটি, অন্যজনা বীজ। মাটির কাজ বীজকে ফুটিয়ে তোলা। আর বীজের কাজ মাটি থেকে তোষণ ও পোষণ পেয়ে বেড়ে ওঠা। একজন আশ্রয় দেয়, আর একজন আশ্রয় নেয়।

"মাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বীজকে ধারণ করা, পোষণ দেয়া ও তাকে উদ্গাত ক'রে তোলা। তেমনই বীজাকারে যে সত্তা থাকে [existence in the form of sperm] তাকে ধারণ, পোষণ ও বিবর্ত্তনে বাড়িয়ে তোলার প্রকৃতি [tendency] কেবল নারীতেই মুখর হয়ে উঠেছে।"*৩ তাই ঋষি পরাশর বললেন: "যথা ভূমিস্তথা নারী"।

ভূমি ও বীজ যদি সর্বতোভাবে পরস্পর সদৃশ [compatible] না হয়, তাহলে ফসল যে কখনও ভাল হয় না তা সব চাষীরাই জানেনা। জমি যদি বীজের প্রয়োজনানুপাতে বেশী উর্বরা হয় তাহলে হয় বীজ জ্বলে যায় না হয় গাছ নিষ্ফলা হয়। গ্রাম্য ভাষায় ঐ গাছকে যে বাঁঝা গাছ বলে, গৃহস্থ ঘরের মেয়েরাও তা জানে। তারা এও দেখেছে যে একই কুমড়োর বীজ একজমিতে

*১ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র:
*২ ঋক্ বেদের অনুবাদ। The History of Sauskrit Literature. Page—124.
*৩ আলোচনা প্রসঙ্গে, Vol. X

পুঁতলে দশসেরী কুমড়ো হতে পারে, আবার উপযুক্ত জমিতে না পুঁতলে সেখানকার কুমড়ো কুঁকড়েও যেতে পারে। তাই বিবাহ ব্যাপারে জৈবিক সাদৃশ্যকে [Biological Compatibility] মানতেই হবে। "ভালমানুষ যদি জগতে আনতে হয় তবে Bio-vigoured Seed*[1] পড়া চাই Proper Bio-eagered soil-এ*[২-৩]

এই 'জীবনদীপ্ত বীজ' কাকে বলে আর 'আগ্রহদীপ্ত মাটি' বলতেই বা কি বুঝায় তা কি আমরা ভেবে দেখেছি ? আমরা দেখি যারা বিয়ে করবে তাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আগ্রহ কতখানি।

তরুণ-তরুণী বা প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরে পরস্পরকে কাছে পাবার আগ্রহ যতই প্রবল থাক না কেন, তারা বর্ণ, বংশ, বয়স, ও মেজাজে [Temperament] যদি পরস্পরের পরিপূরক এবং সদৃশ না হয় তবে বিয়ের পর ঐ আগ্রহ যে গলগ্রহরূপ চরম অশান্তি ডেকে আনবে তার প্রমাণ তো ভুরি ভুরি।

প্রমাণ পেয়েছিলেন রাশিয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলষ্টয়। টলষ্টয় এবং তাঁর স্ত্রীর মেজাজ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। তাই ডেলকার্ণেগী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখলেন :

"লিও টলষ্টয়ের জীবন খুবই দুঃখজনক এবং করুণ। এই দুঃখের কারণ হচ্ছে তাঁর বিবাহ। তাঁর স্ত্রী পছন্দ করতেন বিলাসিতা। কিন্তু টলষ্টয় বিলাসিতাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজে যশ ও প্রতিষ্ঠার। কিন্তু টলষ্টয়ের কাছে এই সকল তুচ্ছ যশ ও প্রতিষ্ঠা ছিল নিরর্থক। স্ত্রী চাইতেন অর্থ এবং ঐশ্বর্য্য। কিন্তু টলষ্টয় বিশ্বাস করতেন যে সম্পদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি একটা পাপ বিশেষ।"*[4]

স্বামী ও স্ত্রীর ভিন্ন মুখী টেম্পেরামেণ্ট প্রেমের পসরাকে তুচ্ছ ক'রে এমন সংঘাত সৃষ্টি করেছিল যে জীবনের সায়াহ্নে—৮২ বৎসর বয়সে ঘর ছেড়ে পথে দাঁড়াতে হয়েছিল বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিককে। যাঁর হৃদয় ছিল উষ্ণ প্রেমে পরিপূর্ণ তাঁকেই মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল প্রচণ্ড শীতের কোলে সকলের অগোচরে।*[5]

1* Bio-vigoured Seed=জীবনদীপ্ত বীজ।
২* Proper Bio-eagered soil=উপযুক্ত জীবন আগ্রহদীপ্ত মাটি।
৩ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র : আলোচনা প্রসঙ্গে, Vol. X. P. 124-730
4* Dale Carnegi : How to win friends and influence People. Page 257
5* Dale Carnegi : How to win friend and influence people. Page 257-258

সকলের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র ছিলেন আমেরিকার স্বনামধন্য রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কণ। তিনি নিহত হয়েছিলেন আততায়ী বুথের হাতে। কিন্তু সারা জীবন ধরে নিগৃহীত হয়েছেন নিজের স্ত্রী মেরী টডের হাতে। দীর্ঘ তেইশ বৎসরের প্রত্যেকটি প্রভাতে অঞ্চল ভরে কুড়িয়েছেন দাম্পত্য তিক্ততার জ্বালা। তার কারণও তো ঐ ভিন্নমুখী টেম্পেরামেণ্ট।*[1] বললেন ডেল কার্ণেগী :

"আব্রাহাম লিঙ্কণ ও মেরী টড ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী—শিক্ষায়, বংশমর্য্যাদায়, রুচী, দৃষ্টিভঙ্গী এবং টেম্পেরামেণ্টে। তাঁরা পরস্পরকে উত্যক্ত করেছেন অবিরাম ভাবে।"*[2]

"টেম্পেরামেণ্টের" বাংলা প্রতিশব্দ "মেজাজ"। তবে "অত মেজাজ দেখাচ্ছ কাকে?" বলবার সময় যে "মেজাজে"র সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে সেই "মেজাজ" টেম্পেরামেণ্টের সবটুকু বুঝায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন, :

Temperament

is the inner climatic temperature of Personality."*[3]

অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বের ভাবব্যঞ্জনার অভিব্যক্তিকে বলে টেম্পেরামেণ্ট, বা ধাতুপ্রকৃতি বা মেজাজ। এই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় মানুষের কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা, পছন্দ অপছন্দ, রুচী-চাহিদা, শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠের প্রতি তার মনোভাব ও অপরকে সয়ে বয়ে নেবার ক্ষমতার মাধ্যমে।

শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদেরকে সেই ক্ষমতায় তুলে ধরতে হবে যাতে কোন পুরুষ দু-দশটা মিষ্টি কথা ব'লে বা বিনীত ব্যবহার দেখিয়ে তাদেরকে প্রলুব্ধ করতে না পারে। যাতে তারা সহজেই পুরুষের টেম্পেরামেণ্টকে বিচার করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

যেমন, কোন পুরুষের কথা মিষ্টি। তার ব্যবহার ও কর্মকুশলতা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তার বিভব প্রাচুর্য্যও লোভনীয়। সেই পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হলেও বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হবার আগে ভালভাবে হিসাব করে দেখতে হবে ঐ পুরুষ আর দশজনকে নিয়ে চলতে পারবে কি না। তার মা, বাবা বা কোন

1* Ibid—P. 258
2* Ibid—P. 259
3* S. S. Thakur : The Massage, Vol. VI, P. 37.

মহৎ আদর্শের প্রতি আনুগত্য আছে কি না তা হিসাব না করে কোন অবস্থাতেই ঐ পুরুষে আত্মদান না করা।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক তরুণ প্রেমিক তার প্রণয়ীকে প্রস্তাব দিয়ে বসে,—"মা, বাবা বিয়েতে মত দিচ্ছেন না। তাঁদের অমতে বিয়ে করলে ঘর থেকে বিদায় নিতে হবে চিরদিনের জন্য। কুছ্‌পরোয়া নেহি। তোমাকে নিয়ে চলে যাব জব্বলপুরে।"

সাবধান হতে পারে যেন মেয়েরা—এমনতর উদার প্রেমিক থেকে। মেয়েরা যেন ভুল বুঝতে পারে, ঐ প্রেমিকের ভালবাসা তীব্র হলেও তা সত্তার পোষণ দিতে পারবে না কখনও। কারণ সত্তার খোরাক হচ্ছে প্রেম, কাম নয়। প্রেমে আছে এককে নিয়ে বহুকে খুশী করার আবেগ। আর কামনা-লাঞ্ছিত ভাললাগায় থাকে একের জন্য বহুকে ত্যাগ করার তাগিদ। তাই, জব্বলপুরে যাবার প্রস্তাবে রাজী হলে অচিরে জব্দ হবার সম্ভাবনা সাথে নিয়েই যেতে হবে। তাই মন দিলেও এমনতর বিয়েতে মত না দেবার ধৈর্য্য যেন ধরতে পারে মেয়েরা।

তাছাড়া, মন দেবার আগেই হিসাব করে দেখতে দোষ কি? দিতে তো আর সময় লাগে না। পেতেই তো কসরৎ করতে হয় সারাজীবন ধরে। ভাবতে হয়, যাকে মন দিতে চাই সে মনের মত হবে তো? আর, রোমান্সের রঙে মনকে রাঙিয়ে রাখতে নেই—অন্ততঃ বর নির্বাচনের সময়। তাতে সিঁদুরে কাঁচা আমকে পাকা আম ভেবে ভুল করার সম্ভবনা। যৌবনের প্রথম উন্মাদনার আবেশ কেটে গেলেই রোমান্স রূপায়িত হয় রিজ্‌ন্‌-এ (reason)। তাই কাওকে বিয়ে করতে মন চাইলেও 'রিজ্‌ন্‌' প্রয়োগ করে দেখতে হয়—মন যাহা চায় তাহা ভুল করে চায় না তো? আর যাহা চায় তাহা পায় তো?

বর্ণে, বংশে, বিদ্যায় ও বয়সে সর্বতোভাবে যোগ্য ও বরণীয় হয়েও যদি কোন পুরুষ কোন মেয়েকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য আগ্রহ-আকুল ও উদ্দাম হয়ে ওঠে, তবে সে পুরুষ সন্দেহ যোগ্য। তার ধাতুতে বা চরিত্রে আবিলতা ও অস্থিরতা চোরের মত লুকিয়ে থাকে। সে ঐ মেয়েকে শারীরিক ভাবে বহন করলেও মেয়ের অন্তর জগত বিক্ষিপ্ত হবে সারাজীবন ধরে। আর অমনতর পুরুষ ঐ মেয়েতে আনত হলে যে সন্তান কোলে আসবে সে কোলকে ভরে রাখলেও দিলকে ভরে তুলবে দিগদারিতে। তাই সাবধান হওয়া ভাল নয় কি?*[1]

*1 শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ; নারীর নীতি : P. 114

সাবধান করেছেন মণীষীগণ। তাঁদের মতে প্রকৃতিকে [Nature] কাজে লাগান যেতে পারে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে চললে সে ছেড়ে কথা বলে না। বার্নাড্‌ শ' বললেন, "পুরুষ ছুটবে গৌরবের পেছনে। আর নারী ছুটবে পুরুষের পেছনে।"[1] এই তো স্বভাবজ প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে তাচ্ছিল্য করলে বিকৃতি যে জীবনে প্রতুল হয়ে দেখা দেবে তা কি চোখে পড়ে না?

দেখলেই হয় পাশ্চাত্য সমাজে। সেখানে "উ" [woo]*[2] করে ছেলেরা। আর বিয়ের পর "স্যু" [sue]*[3] করে মেয়েরা। তাই আজকাল পাশ্চাত্যের বহু প্রেমিক প্রেম করতে রাজী, কিন্তু প্রেমিকাকে বিয়ে করতে নারাজ। কারণ "স্যু"-এর রায় বেরুলেই "অ্যালিমনি [Alimony=খোরপোশ] দিতে দিতে স্বামী বেচারার আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার জোগাড় করে। আমার বন্ধুবর অধ্যাপক স্মিথ যখন তৃতীয়বার বিয়ে করলেন তখন তাঁর মাসিক বেতনের তিন ভাগের দুই ভাগই কেটে নিত তাঁর আগের দুই স্ত্রীর মাসোহারা বাবদ। অহো ভাগ্যম। প্রাচ্যে প্রবাদ আছে, স্ত্রীভাগ্যে লক্ষ্মী [ধন]। আর পাশ্চাত্যে বিশেষ করে অধ্যাপক স্মিথের মত হতভাগ্যদের জীবনে স্ত্রী ও শ্রী [লক্ষ্মী] দুইই চঞ্চলা।

স্ত্রী ও শ্রী দুইই যদি চঞ্চলা হন তাহলে জীবনের অঞ্জল যে ভরে উঠবে ব্যর্থতায়। ব্যর্থ জীবন কি বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে? জীবনের লক্ষ্য যে ভূমান্বিত আনন্দলাভ, আধ্যাত্মিক চেতনায় অভিদীপ্ত হয়ে ওঠা, তা কি সম্ভব হবে?

কাউন্ট হারম্যান্‌ কাইজার লিং বললেন "বিবাহটা মানুষের জৈবিক ক্ষুধা পরিপূরণের সুবিধাদান মাত্র নয়। জীবনের সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নয়নের অন্যতম উপায়।"*[4]

সুইডেনবর্গ বললেন, "বিবাহ সম্বন্ধ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম সম্বন্ধ। ঐহিক জীবনের পরপারেও এই মিলনের একটা সার্থকতা আছে।"

পরপারের সার্থকতা পরে বিচার করলেও চলবে। তবে বিয়েতে যদি

*1 Bernerd Shaw: The Superman: Man should run after glory, and woman after man.

*2 Woo—পাণি প্রার্থনা করা, প্রণয় নিবেদন করা।

*3 Sue—মোকদ্দমা করা, নালিশ করা।

*4 Quoted in the footnotes in নারীর পথে—by Sri Sri Thakur Anukul Chandra P.73.

গণ্ডগোল হয় তবে আধ্যাত্মিক উন্নতি যে ঘোল খাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আধ্যাত্মিক মানে তো অধি-আত্মিকতা। যে নীতি-বিধি জীবনের আত্মিকতা বা গতিশীলতাকে ধরে রাখে বা বজায় রাখে তাইতো আধ্যাত্মিকতা। জীবন যাতে ভূমার পথে এগিয়ে চলে তাই করাই তো আধ্যাত্মিক সাধনা।

Spiritualism মানেও তো সেই 'ism' যা পরিপালন করলে spirit অর্থাৎ আত্মিক শক্তি dispirited বা ম্লান কিম্বা মলিন হবে না।

এই আধ্যাত্মিকতার মূল কথাই হচ্ছে আত্মার অন্তর্নিহিত যে সুরত বা লিবিডো তাকে ইষ্টে অর্থাৎ ঈশ্বরের মূর্ত্ত বিগ্রহে [God in Person] ভালবাসার মাধ্যমে যুক্ত করা।

কিন্তু ইষ্ট বা ঈশ্বরকে ভালবাসা কি মুখের কথা? তার জন্য চাই পাকা ভালবাসা অর্থাৎ ভক্তি। ভাগ্যবান তিনি যিনি ধ্রুব বা প্রহ্লাদের মত পাকা ভালবাসা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন।

পাকা ভালবাসা চাইলেই কি পাওয়া যায়? প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ভালবাসার আবেগ ও আগ্রহ আছেই। পোষণ ও পুষ্টি পেতে পেতে পাকে সে ভালবাসা। গাছ যেমন মাটি থেকে রস নিয়ে ফলকে পুষ্ট করে এবং পাকিয়ে তোলে, জীবনও তেমনই প্রথমে বাৎসল্য [পিতামাতার সহিত] এবং পরে দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে প্রেম ও প্রেরণার পোষণ ও পুষ্টি নিয়ে তার ভালবাসাকে পাকিয়ে তোলে। কোন বিশেষ ভূমির গভীরে শিকড় না গাড়লে গাছ যেমন রস সংগ্রহ করতে পারে না, তেমনই কোন বিশেষ ব্যক্তিতে [সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীতে এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীতে] সম্পর্কের শিকড় মজবুত ভাবে না গাড়তে পারলে তাদের ভালবাসা পুষ্ট হবে কি করে? সাত-পাকে বাঁধা জীবন যদি বার বার পাক খেতে থাকে তবে ভালবাসা তো পাকবার সুযোগ পাবে না কোন দিনই। আধ্যাত্মিক জীবন রয়ে যাবে আঁধারে ঢাকা।

তাই প্রজাপতি অফিসেই হোক আর পুরোহিত মশাই-এর সম্মুখেই হোক, বিয়ের গাঁটছড়া বাঁধবার আগে খোলা-মনে ভেবে দেখতে হয়, যাকে পাচ্ছি তাকে চাই তো? যাকে গ্রহণ করছি সর্বান্তকরণে তাকে ত্যাগ করবার তাগিদ আসবে না তো কোনদিন? আজ যাকে সবচাইতে আপন ব'লে মনে

হচ্ছে, চোখের আলোয় যার থেকে বেশী সুন্দর আর কাউকে দেখছি না—সে আমার কাছে চিরসুন্দর হয়ে থাকবে তো? এই উত্তর বিশেষ করে প্রতিটি মেয়ে যাতে তাব নিজের কাছেই পেতে পারে সেই দক্ষতায় দীক্ষিত করে তোলাই তো মা ও বাবার দায়িত্ব। মা ও বাবা যদি তাঁদের মেয়ের প্রতি এই দায়িত্ব পালন করেন তবে ঐ মেয়ে যখন তার দায়িত্বের হাত ধরে শ্বশুর গৃহে প্রবেশ করবে তখন সে তার স্বামীকে সুখী করতে কসুর করবে না। তার সেবা, সৌকর্য্য, ভালবাসা ও ভাললাগার সংসর্গে তার স্বামীর জীবন হয়ে উঠবে স্বস্তি প্রসন্ন। আর সে? তৃপ্ত স্বামীর সোহাগ রাগে রঞ্জিত হয়ে বিচ্ছুরিত করবে দেবী রূপের দৈবী প্রভা। চিরবসন্ত বিরাজ করবে তাদের দাম্পত্য-জীবনের বেলাভূমিতে। প্রস্বস্তির সামছন্দে দেবতারা গেয়ে উঠবেন:

অয়তু লক্ষ্মী স্বরূপিনী মে!

সুখে সংসার করবে বলেই তো বিয়ে করেছিল বলরাম। বলরাম চৌধুরী। তালপুকুরের চৌধুরী পরিবারের ছোট ছেলে। যেমন লেখাপড়ায়, তেমন খেলাধুলায়। গান-বাজনা, যাত্রা-থিয়েটার, এমন কি সিনেমা-শো-এর ব্যবস্থা করে মাতিয়ে রাখত গ্রামের ছেলে বুড়োকে।

দাম্পত্য জীবনে অশান্তি আসে কেন?
(১) স্বামীর প্রত্যাশা পূরণ না হলে

সবাই ভালবাসত বলরামকে। ছোটরা একজোটে হাজির হতো বলাইকাকু ডেকেছে শুনলে। সমবয়সী, এমনকি বড়রাও কথা বলত না বলরামের কথার ওপরে। তাই বলরামও ভালবাসত সবাইকে। তাদের আপদে বিপদে সাহায্য করত যখন যা পারে তাই দিয়ে।

কিন্তু পেরে উঠল না স্ত্রী ইন্দুমুখীর সঙ্গে। মুখের ওপরে জবাব দেয় সে। সইতে পারে না বলরাম। ভাবে, আমি পুরুষ মানুষ। নানা ঝামেলায় মেজাজ গরম হয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। রাগের মাথায় দু-চারটে গরম কথা না হয় বলেই ফেলি। তাই ব'লে স্ত্রী কথা বলবে মুখের ওপরে মুখ নেড়ে!—তার এতদিনের পুষে রাখা অহং আহত হয়ে ওঠে।

এই তো সেদিন বিয়ে হল বলরামের। বিয়ে বাড়ীর ব্যস্ততা স্তিমিত হয়ে এল। বাসর ঘরে ইন্দুমুখীর সলজ্জ মুখখানা আলতো ক'রে তুলে ধরল বলরাম। সোহাগ জড়িত কণ্ঠে বলল, তুমি আমার ইন্দুমুখী। আর কা-রু-ও না। তাই না?

সন্ত সিঁদুর ছোঁয়া সিঁথির মতই জলজল ক'রে উঠল ইন্দুমুখীর মুখ খানা। কণ্ঠে আওয়াজ ছিলনা সেদিন। বোধহয় মৌন ভাষায় বলেছিল,—আমি তোমারই।

আর ও 'আমার'-বোধে ইন্দুমুখীকে কাছে টেনে নিল বলরাম। ফুলশয্যার সৌরভের সাথে মনের সৌরভকে মিশিয়ে দিল ইন্দুমুখীকে বুকের কাছে পেয়ে। খুশীর ডানায় ভর করে এসে দাঁড়াল অতীতের সেই কল্পনা মন্দিরে। এই মন্দিরেই সে বহুবার দেখেছে তার নায়িকাকে।

সিনেমার রূপালী পর্দায় দেখা নায়িকা। গৃহে প্রবেশ করল নায়ক। শশব্যস্তে এগিয়ে এল নায়িকা। শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, হেঁটে এলে বুঝি? ঘেমে যে নেয়ে উঠেছ! শাড়ীর আচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে হাওয়া দিতে লাগল স্বামীকে।

আর নায়ক? মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার স্ত্রীর দিকে। চোখের বিজলী রেখায় ফুটে উঠেছে খুশীর আমেজ। আদর করে কাছে টেনে নিল স্ত্রীকে। বলল,—আমার রূপালী!

বলরাম কল্পনায় দেখত তার বিবাহিত জীবনকে। ভাবি পত্নীকে কাছে টেনে নিত আদর করে। তার অন্তর আবেগ অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠত, আমার সো-না-লী।

রাম [না জন্মাতেই রাম নাম। পাণিগ্রহণের পূর্বেই পত্নীকে আদর! ভাবত, আদর সোহাগে ভরপুর ক'রে রাখবে তার স্ত্রীকে। অনুকম্পায় শুধুরে নেবে তার অনুযোগ ও অপারগতাকে। ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবে সোনালীর সকল অপরাধকে।

দৃষ্টান্তরে ভেসে উঠল নায়কের প্রতি নায়িকার পরিচর্য্যা। নায়ক খেতে বসেছে। কত যত্নসহকারে পরিবেশন করছে তার স্ত্রী। পাখার বাতাস করছে কাছে বসে। সোহাগ করে বলছে, পেট ভরে খাও। এটুকু না খেলে কি হয়?—কত রকমের আপ্যায়না। খুশীর জোয়ার বয়ে চলেছে নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য জীবনে।

বলরামও কল্পনায় রচনা করেছিল এমন একটি ছোট্ট সংসার। পরিশ্রমান্তে খেতে বসবে সে। তার সোনালী রূপালী পর্দায় দেখা নায়িকার মত আদর আপ্যায়নে ভরপুর করে তুলবে তাকে। আর সে? ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, গরিমা,

পৌরুষ, ও প্রাপ্তি দিয়ে প্রতুল ক'রে তুলবে স্ত্রীকে। তার কল্পনার সোনালী হবে তার হৃদয়ের রাণী।

কিন্তু দুমাস যেতে না যেতেই হৃদয়ে আঘাত খেল বলরাম। তার অহং দীপ্ত পৌরুষ আহত হলো ইন্দুমুখীর ব্যবহারে। রূপালী পর্দায় দেখা আপ্যায়নার একটি কণাও ঝরে পড়ল না তার জীবনে। দুঃখ ক'রে বলল বলরাম:

"অফিস থেকে ফিরি বিকেল পাঁচটা নাগাদ। নিজেই পোষাক বদল করে বসি খোলা হাওয়ায়। ইন্দুমুখী এগিয়ে আসে না শার্টের বোতাম খুলতে। সে তার পড়া লেখা নিয়েই ব্যস্ত। শোবার ঘর থেকে হুকুম করে রাঁধুনী কমলাকে, মাসী! বাবুর খাবার দিয়েছ? বেগুনী গুলি গরম গরম ভেজে বাবুকে দিয়ে, পরে চা দিও।

বেগুনী খাব কি? তেলে-বেগুনে মন জ্বলে ওঠে ইন্দুমুখীর উদাসীনতায়। ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠি, বেগুনী আর লাগবে না। শুধু চা হলেই হবে।

কেন? লাগবে না কেন? পড়ার টেবিলে বসেই উত্তর দেয় ইন্দুমুখী, আমি নিজে নুন-চিনি মেখে রেখেছি সেই তিনটের সময়।

নুনের ছিঁটে পড়ে আমার আহত অহং-এর ক্ষত স্থানে। ভাবি, জলখাবার টুকুও নিজে হাতে দিতে পারে না? প্রত্যাশাপীড়িত অহং গর্জে উঠতে চায় আক্রোশে। কিন্তু আক্রোশ চাপা দিয়ে রাখি অশান্তির আশঙ্কায়। তাই খাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ি। গরম বেগুনী নরম হতে থাকে টেবিলে।"

হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে গঙ্গার ধারে। পরিচিতদের এড়িয়ে এসে ব'সে পড়ে নির্জন গাছের নীচে। আক্রোশ ও সমবেদনার ঝড় ওঠে মনে। আক্রোশ আসে ইন্দুমুখীকে মনের মত না পেয়ে। সমবেদনা আসে তার সরল চাহনী, আর মিষ্টি কথার সুর মনে পড়লে। কিন্তু রাগ হয় তাকে রেগে কিছু বলতে পারে না ব'লে। বন্ধু নিষেধ করেছে বার বার: "দেখ বলু! মেয়েদের কষ্ট বেশী। মা, বাবা সব ছেড়ে নূতন পরিবেশে আসে নেহাতই অপরিচিত মানুষের হাত ধরে। নিজেকে অভ্যস্ত করতে হয় সম্পূর্ণ অজানা এক পরিবেশে। বদলাতে হয় আচার, আচরণ, পিতৃকুলের প্রথা বা শিষ্টাচার। এমন কি বাপের বাড়ীর খাওয়ার অভ্যাস পর্য্যন্ত বদলাতে হয় মেয়েদেরকে।—নিজের বোনের জীবনেই দেখলাম। ছোটবোন শ্যামলী। সাতটা বাজার আগেই সারা হত তার সকালের জলখাবার। কিন্তু বিয়ের পরে? শ্বশুর বাড়ীতে

সোয়া ন'টা পর্য্যন্ত শুকিয়ে থাকে শুধু এক কাপ চা খেয়ে। এটা নাকি ওদের বাড়ীর রীতি। বাড়ীর পুরুষ মানুষ নেয়ে খেয়ে রওনা হবে অফিস আদালতে। তারপর শুরু হবে মেয়েদের ভরপেট জলযোগ।

"নূতন পরিবেশে কেউ সহজেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কারও সময় ও কসরত দুইই লাগে বেশী। যে মেয়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, শ্বশুর বাড়ীর অন্ন তার জন্য জোটে না বেশী দিন। হয় অন্যত্র সরে পড়ে, ছোট্ট সংসার পাতে শুধু স্বামীকে নিয়ে, না হয় বিড়ম্বিত জীবনের অভিশাপ মাথায় নিয়ে ফিরে আসে বাপের বাড়ীতে। তাই স্ত্রী মনের মত যদি নাই-ই হয়, তবুও স্বামী যদি একটু মানিয়ে নেয়, ক্ষুব্ধ না হয়ে, স্ত্রীর অহংকে আশ্রয় দিয়ে তার অনিচ্ছা বা অপারগতাকে যদি সহ্য করে নেয়, তাহলে স্ত্রীর প্রতি প্রীতি কখনই বিরক্তিতে রূপায়িত হবে না। অনুকম্পা অনুযোগের রূপ নেবে না কোনদিন। দাম্পত্য জীবনের মসৃন পথ দুটি অহং-এর সংঘাতে বন্ধুর হয়ে উঠবে না কখনও।"

"পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি বুঝতে পারে যে স্বামীর কাছে ভুলত্রুটী, অপারগতার ক্ষমা আছে, শুধরাবার অবকাশ আছে, তাহলে তার অহং স্বভাবতই স্বামীর কাছে নতজানু অভিবাদনে দেবদাসীর মত ব'লে উঠবে :

এসেছি দেবার জন্য পেয়েছি অঢেল,
ধন্য করেছ এ দাসীরে আশ্রয় দানে।"

আশ্রয় তো দিয়েছে অগ্নিসাক্ষী রেখে। কিন্তু প্রশ্রয় তো দিতে পারে না আর। ভাবতে ভাবতে গাছতলা থেকে উঠে দাঁড়ায় বলরাম। রাগ হয় বন্ধুর ওপরে। অজ্ঞাতে বলরামের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—"বৌ ম'রে গেছে কি না, তাই মুখে অত বড় বড় কথা, উপদেশের ফুলঝুরি। আসুক দেখি ঘরে এমন একটা বৌ যে সামান্য জলখাবারটুকুও হাতে ধরে দেবে না। নিজে থেকে বুঝে স্বামীর প্রয়োজনে সাড়া দেবে না। দেখি কেমন উদার হতে পার। কেমন বলতে পার :

'নাই বা হলে মনের মত
তাই ব'লে কি মনে রাখব না' ?"

ঘরে ফিরে আসে বলরাম। কোন কথা বলে না ইন্দুমুখীর সঙ্গে। ইন্দুমুখীও বুঝতে পারে না, মুখ ভার কেন বলরামের। সাহসে ভর ক'রে চুপি চুপি এগিয়ে আসে কাছে। পেছন থেকে পেশল বাহুযুগলে জড়িয়ে ধরে

স্বামীকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'বেগুনী খেলে না যে? এত রাগ কেন বাপু!

বলরামের রাগ জল হতে চায় অনুরাগের স্পর্শে। কিন্তু অভিমান উসকে তোলে বলরামকে। তাই মুখ ফুটে বলতে পারে না ইন্দুমুখীকে,—"তুমি নিজে হাতে জলখাবার দিলেই পার।"

মন যদি বা বলতে চায়, কিন্তু ক্ষুব্ধ অহং বেঁকে বসে। বলে: চেয়ে নেব সেবা?—রাগ ও অনুরাগের দ্বন্দ্বে ঝাঁঝাল সুরে বলে ওঠে বলরাম: যাও, নিজের কাজ করগে। এসব করার সময় কোথায় তোমার?

সত্যই তো, সময় কোথায় ইন্দুমুখীর? বি. এ. পরীক্ষার আর মাত্র একটা মাস বাকী। ক্ষুব্ধ মনে ফিরে আসে পড়ার টেবিলে। ভাবে: পড়া ছেড়ে উঠে গেছি বলেই বোধ হয় রাগ।

মনে পড়ে যায় ছোট ননদ সুনন্দার কথা। বৌদি, পড়ার বিষয়ে দাদা কিন্তু খুব কড়া। একটু গাফিলতি দেখলেই চড় বসিয়ে দিতে পারে কষে! বৌ ব'লে খাতির করবে না দাদা! মাষ্টার যখন তখন মাষ্টারই।—নিজের গাল দেখিয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছে সুনন্দা। বলেছে: এই গালে কি কম চড় পড়েছে? একেবারে চড়া প'ড়ে গেছে! মনে রেখো কিন্তু।

ভালভাবেই মনে রেখেছে ইন্দুমুখী। ফুলশয্যার রাত্রে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল বলরাম: ইন্দু! বি. এ.তে ডিস্টিংশন তোমাকে পেতেই হবে। আমার বড় সাধ তুমি এম. এ. পাশ কর।

স্বামীর সাধ পূরণের সাধনাতেই তো মসগুল হয়ে আছে ইন্দুমুখী। বিয়ের আগে অসুখে নষ্ট হয়েছে একমাস। তারপর বিয়ের হুজ্জত ও হানিমুনের ইজ্জৎ রক্ষা করতে যেয়ে খেসারত দিতে হয়েছে অনেক কটা দিনের। বই খুলতেও পারেনি। তাই বলরামের পরিচর্য্যার ভার 'ভুতো' আর কমলা মাসীর হাতে ছেড়ে দিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে ইন্দুমুখী।

কিন্তু গোঁসা করে শুয়ে প'ড়ে থাকে বলরাম। মন খুলে কথা বলে না ইন্দুমুখীর সঙ্গে। বুঝতেও চায় না ইন্দুমুখীকে। ইন্দুমুখীও বুঝতে পারে না যে বলরামের প্রত্যাশাপীড়িত অহং বলতে চায়: যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? স্বামীর চাইতে বি. এ. পাস করাটাই বড় হল?

ক্ষুব্ধ মন নিয়ে বলরাম বেরিয়ে যায় কাজে। ফিরে আসে অমনতর ক্ষুব্ধ মন নিয়ে। নিত্য চলতে থাকে তার অহং ও বিবেকের দ্বন্দ্ব। দীর্ণ অন্তরের

ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে ক্ষুব্ধ মনের জ্বালা। ভাষায় ফুটে ওঠে বিরক্তি ও অনুযোগের সুর।

ইন্দুমুখীও অভিজাত ঘরের মেয়ে। প্রাচুর্য্য পরিবেষ্টিত পরিবেশে লালিত। চোখ রাঙিয়ে তার ওপরে কোন দিন কথা বলে নি কেও। তাই বলরামের অকারণ চোখ রাঙানীতেও ক্ষুব্ধ হতে থাকে ইন্দুমুখী। একদিন ফোঁস ক'রে ওঠে বলরামের মুখের ওপরে।

বলরামও গর্জন করে ওঠে সিংহের মত। বলে: এত বড় স্পর্দ্ধা। এ কথা বলতে পারলে? দেখতে তো নিরীহ গোবেচারী। আজ দেখি মুখে খৈ ফুটছে।

ফুটবেই বা না কেন? ঠাণ্ডা বালিতে কি আর খৈ ফোটে? বলরামের ভাষার উত্তাপে ইন্দুমুখীর অহংও যে উত্তপ্ত হতে পারে তাতো ভেবে দেখেনি বলরাম। তাই তো সামান্য কথাতেই মুখরা হয়ে উঠল ইন্দুমুখী। ক্ষোভ ও অসন্তোষের বর্ষণ এক পশলা হয়ে গেল তাদের দাম্পত্য জীবনের আঙ্গিনায়।

শান্তির আশায় বলরাম ছুটে এল আমার কাছে। বলল,—দাদা, আজ পর্য্যন্ত একটা লোকও কথা বলেনি আমার কথার ওপরে। যেমন চেয়েছি তেমন পেয়েছি গ্রামের মানুষকে। কিন্তু পেলাম না ইন্দুমুখীকে। সে মুখের ওপরে জবাব দেয়।—বিস্তৃত বর্ণনা করল কবে কি ঘটেছে দুজনের মধ্যে।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—ভয় নেই। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতেই যখন এসে পড়েছেন তখন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তবে, কাউকে মনের মত করে পেতে গেলে তার মনের মধ্যে যে ডুব দিতে হয় তা কি জানেন না? নিজের অহংকে একটু নরম করে ইন্দুমুখীর মনের কথা যদি জানতে চেষ্টা করতেন তাহলে অযথা এই পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি হতো না। আর শুনে নিতে হয় কখন, কোথায় কি ভাবে বললে স্ত্রী মনের মত হয়ে সব কথা শুনবে।

আদ্য-প্রান্ত শুনে গেল বলরাম। বলল: সুযোগ মত প্রয়োগ করব আপনার দেয়া তুক্।

সুযোগ জুটে গেল একমাস পার হতে না হতেই। ছুটে এসে বর্ণনা করল সমস্ত ঘটনা। বলল:

সহজ হয়ে গেলাম ইন্দুমুখীর কাছে। নিজেই উঠে গেলাম পড়ার টেবি । পেছন থেকে চোখদুটি টিপে ধরে বললাম, আর পড়তে হবে না, আর পড়তে হবে না। পড়তে পড়তে চোখ মুখ যে বসে গেল!

সহজভাবে উত্তর দিল ইন্দুমুখী, কি করব? স্বামীদেবতার সাধ ডিস্টিংশন পেতেই হবে। তাই তো কোন দিকে না তাকিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছি।

নিজের কাছেই লজ্জা পেলাম ইন্দুমুখীকে ভুল বুঝেছিলাম ব'লে। কিন্তু আরও লজ্জা হল তাকে বলতে, আমার জন্যও কিছু ক'রো। তবে সুযোগ জুটে গেল এক সপ্তাহ পরেই।

সে দিন রাত্রে। আহারান্তে বিছানায় এলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। যথাসময়ে পাশে এসে শুয়ে পড়ল ইন্দুমুখী। একথা-সেকথা, আদরে-সোহাগে রাত্রি বেড়ে চল্ল। হঠাৎ বললাম: আজ রায়বাবুদের বাড়ীতে একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখলাম।

কি দেখলে গো? আগ্রহ ভরে মুখ তুলে চাইল ইন্দুমুখী।

অন্যদিকে তাকিয়ে হালকাভাবে বললাম: ও তেমন কিছু নয়। তবে বড় ভাল লাগল তাই! আজকের দিনেও—

আমার পিঠে একটা আলতো ধাক্কা দিয়ে বলল ইন্দুমুখী: ধোৎ! শুধু ভূমিকাই করছে। কি দেখলে তাই বল না।

কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে বললাম, শুনে তোমার লাভ নেই। তুমি শুয়ে পড়।

আর যত দোষই থাক, ইন্দুমুখী জানে না অভিমান কাকে বলে। আবদার করে বলল, লাভ না থাক। শুনতে দোষ নেই। বল না কি দেখলে।

খুব আগ্রহ ভরে বর্ণনা করলাম সন্ধ্যার দেখা ঘটনাটি:

রায়বাবুর নাতনিকে পড়াচ্ছি। দোতলায় কোনের ঘরে। পাশের ঘরেই থাকেন রায়বাবুর মেজ ছেলে বিমান বাবু। দুই ঘরের মাঝখানে কাঁচের জানালায় পর্দা ঝুলান। পর্দার পাশ দিয়ে অনেক কিছুই দেখা যায় ও-ঘরের।

বিমানবাবু উঠে এলেন দোতলায়। তাঁর স্ত্রী মনোরমা দেবী তাঁর শার্ট কোট খুলে নিয়ে রাখলেন হ্যাঙ্গারে। জুতো জোড়া রেখে দিলেন যথাস্থানে। বাসন্তী রঙের একখানা লুঙ্গি বিমানবাবুর হাতে দিলেন। বিমানবাবু প্যাণ্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরলেন। বাথরুম থেকে মুখ হাত পা ধুয়ে এসে বসলেন একখানা টুলে। মনোরমা দেবী গামছা দিয়ে তাঁর মুখ হাত পা মুছিয়ে দিলেন। বিমান-বাবু তাঁর বিছানায় উঠে বসলেন।

মনোরমা দেবী ভেতরের ঘরে গেলেন। একটু বাদেই ফিরে এলেন। হাতে একখানা প্লেটের ওপরে একটা বাটি। বিমানবাবুর দিকে এগিয়ে ধরলেন হাতের বাটি। বিমানবাবু চামচ দিয়ে খাবার তুলে খেতে লাগলেন।

বিমানবাবুর টিফিন হয়ে গেল। ডান হাতের তিনটি আঙুলের ডগা ভিজিয়ে বিমানবাবুর ঠোঁটদুটি মুছিয়ে দিলেন মনোরমা দেবী। মমতা মধুর কণ্ঠে বললেন, এবার তুমি বিশ্রাম কর। আমি দেখি রান্নাঘরে রাত্রের ব্যবস্থা কি হচ্ছে।

বিমানবাবু বালিশে হেলান দিয়ে খবরের কাগজে চোখ বুলাতে লাগলেন। আমিও ছাত্রীর অঙ্কের খাতায় চোখ বুলাতে বুলাতে ভাবতে লাগলাম, স্বপ্ন না সত্য? ঝি-চাকর রাঁধুনী আছে। মেয়েরাও বড় হয়েছে। তবুও মনোরমা দেবী কেমন মমতার সঙ্গে নিজে হাতে স্বামীর পরিচর্য্যা করলেন। বিমানবাবুর স্ত্রীভাগ্য কি সুন্দর! কি বল?

বলবে কি! চেয়ে দেখি, ইন্দুমুখীর মুখ গম্ভীর। একদৃষ্টে চেয়ে আছে দেয়ালে ঝুলন্ত আমাদের যুগল ছবির দিকে। বোধ হয় সে তাঁর স্মৃতির সাগরে মনোরমাকে খুজে বেড়াচ্ছে।

পরিবেশকে হাল্কা করবার অভিপ্রায়ে বল্লাম,—ঘুমিয়ে পড় সোনালী। রাত্রি হয়ে গেছে।—পাশ ফিরে শুলাম আমিও।

পরদিন ফিরে এলাম অফিস থেকে। ঘরে ঢুকতেই হাজির হলো ইন্দুমুখী। চেয়ে দেখি তার চেহারায় ফুটে উঠেছে গতকালের দেখা সেই মনোরমা। কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললাম,—এ আমার রোজকার দেখা ইন্দুমুখী না গত সন্ধ্যার দেখা মনোরমা?

আমার বুকের ওপরে নিজের মাথাটা এলিয়ে দিয়ে বলল ইন্দুমুখী,—আমার বড় ভুলো মন। যেমনটি চাও মনে করিয়ে দিয়ে গড়ে নিও তোমাব মনের মত ক'রে।'

খুশীতে ডগমগ হয়ে বলল বলরাম,—দাদা! নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। আহত আহং-এর আক্রোশ যদি ফুলঝুরির মত ইন্দুমুখীর ওপরে ঝরে পড়ত, মমতা ও অনুকম্পার স্পর্শে তার অহংকে যদি সহ্য করে না নিতাম, তাহলে ইন্দুমুখীর আচরণে মনোরমা দেবীর প্রকাশ কোনদিন হতো কি না সন্দেহ। আজ বুঝতে পেরেছি যে কাউকে মনের মত করে পেতে গেলে তার মনটাকে জয় করতে হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনার সন্ধান পেয়েছিলাম। তা না হলে বিবাহ জীবনটা দুঃখের সাগরে ডুবে যেত।

তাইতো দুঃখ ক'রে জানাল বিমলেন্দু,—বিয়ে করে জীবনটা যে এমন "হেল" হবে তাতো ভাবতে পারি নি। মানুষ বিয়ে করে, সুখে সংসার করার জন্য। কিন্তু আমার জীবনটা এমন বিষময় হবে জানলে 'দিল্লীকা লাড্ডু' বরং না খেয়েই পস্তাতাম।

অহংক্ষুব্ধ হলে—
(২) স্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণ না হলে

সে কি?—বিস্মিত হলাম। বললাম,—বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র তুমি। মিলে মিশে, ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়ে বিয়েও করেছ কৃতী ছাত্রীকে। তোমার পছন্দের প্রতিফলন তোমার সখের বৈশাখী।

বিমলেন্দু বিরক্ত প্রকাশ ক'রে বলল,—বৈশাখী যে কালবৈশাখী হয়ে দেখা দেবে তা তো ভাবিনি।

অস্ফুটকণ্ঠে বেরিয়ে এল মুখ থেকে,—কি রকম?

রুমাল দিয়ে চোখের কোন্‌টা মুছে নিয়ে বিমলেন্দু বলতে লাগল,—বিয়ের আগে কত হাসিখুশী ছিল। ছুটির অবকাশে যখনই ওদের বাড়ীতে যেতাম, খুশীর ফোয়ারা ছুটত বৈশাখীর চোখে মুখে। অত বড় লোকের মেয়ে। ঠাকুর চাকরের অভাব নেই। তবুও আমার জন্য খাবার তৈরী করত নিজে হাতে। বিশেষ নিমন্ত্রণের দিনে তো নিজের মাকেও ঢুকতে দিত না রান্নাঘরে। নানা পদ রান্না করত। নিজে হাতে পরিবেশন করত সবাইকে। ওর এই সেবাপ্রাণতা, প্রিয়জনকে পরিতৃপ্ত করার সহজ স্বভাব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভেবেছিলাম, বৈশাখীর মত মেয়ে যদি আমার জীবনে আসে, তাহলে আমার ছোট্ট সংসারে খুশীর জোয়ার বয়ে যাবে। কিন্তু আজ দেখছি বিপরীত।

বুড়ো বাবার ভাগ্যে খাবার জোটে বেলা-দুটোয়। আমাকে তো অফিসে যেতে হয় প্রায়ই না খেয়ে। তবুও বৈশাখীর মুখে সে হাসি নেই। চোখে সে আপ্যায়ণ নেই। অন্তরে সে আবেগ নেই। কেমন যেন রাগ-রাগ ভাব লেগেই আছে।

প্রশ্ন করলাম,—কি চায় সে?

ক্ষুব্ধমনের বিকৃতি প্রকাশ ক'রে বলল, বিমলেন্দু,—বৈশাখী যা চায় তা দেয়া আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। সে চায় শুধু আমাকে নিয়ে সংসার করতে। শ্বশুর-শাশুড়ির ঝুট ঝামেলা পোয়াতে রাজী নয়। শুধু কি তাই? একবারও বায়না। ছুটির দিনে উইক-এণ্ড করতে নিয়ে যেতে হবে। অফিস থেকে সকাল সকাল সোজা ঘরে ফিরে আসতে হবে। দশটা বাজান চলবে

না। কত বলব আপনাকে? তার মনের মত করতে না পারলেই তার অভিমান, রাগ। সেই রাগের ঝাল যখন ঝাড়ে তখন আমার অহং-এ লাগে। আমিও যা ইচ্ছা তাই বলি। সেদিন রাগের মাথায় বলেছি—এখানে যদি না পোশায় তবে বাপের বাড়ী চলে যেতে পার।

মুখের ওপরে জবাব দিল বৈশাখী,—হ্যাঁ, তাই যাব। এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। চলেও গেল সে দুদিন পরে। তার এত বায়না। কোন্‌টা সামলাই বলুন?

সহানুভূতি প্রকাশ করে বললাম,—মেয়েরা স্বামীর কাছ থেকে আসলে যা চায় তা পায় না বলেই পাঁচরকমের বায়না ধরে। তুমি যাই বল বাপু! তোমারও দোষ আছে। তা না হলে অমন মেয়ে বিয়ের পরে এমন হল কেন?

মুখ নীচু ক'রে স্বীকার করল বিমলেন্দু, আমার দোষ অস্বীকার করি না মাষ্টার মশাই। আমি ওর সব সইতে পারি, কিন্তু পারি না ওর অহংভাবকে। বড়লোকের মেয়ে; বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী। রূপলাবণ্যের দেমাক যে নেই তা নয়। তা থাক। কিন্তু বৈশাখী চায় আমি তার তাঁবেদার হয়ে থাকি। ও যা বলবে তাই আমাকে মেনে চলতে হবে—তা তো পারব না।

তা না হয় না পারলে। কিন্তু অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয় কেন—রাত্রি দশটা বাজে কেন?

সে আর বলবেন না। একটু নড়ে বসল বিমলেন্দু।—সৌমেনবাবু, মানে আমাদের রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার সৌমেন রায়ের মেয়েকে পড়াতে হয়। তিনি ধরেছেন বাবাকে। বাবা বলেছেন আমাকে। বিয়ের এক বৎসর পরে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে বাপের ঘরে। তাকে বি. এ. পাশ করিয়ে দিতে পারলে তিনি মেয়েকে কোন লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেতে পারেন—এই আর কি। তাই অফিস ছুটির পর বাড়ীর জন্য টুকটাক কেনা-কাটা সেরে সোজা চলে যাই সুমিত্রাকে পড়াতে, তাই বাড়ী ফিরতে প্রায়ই দশটা বেজে যায়। তাতেও বৈশাখীর রাগ।

অনুমান করলাম, ঐ রাগই শিথিল করেছে বৈশাখীর অনুরাগকে। বিমলেন্দুকে প্রশ্ন করে জেনে নিলাম তার নাতিদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের ইতিহাস। বললাম,—তুমি ভালবাস ঠিকই। কিন্তু তুমি বৈশাখীর অহংকে আশ্রয় না দিয়ে আঘাত দিয়ে আহত করেছ বার বার। তাই আজ এই বিপত্তি।

কাতর দৃষ্টিতে চাইল বিমলেন্দু। বলল—বলুন মাষ্টার মশাই, আমাকে কি করতে হবে।

বিমলেন্দুর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—ভেবো না! সময় কালে সব বলব।

পরদিন যথাসময়ে হাজির হলাম একডালিয়া রোডে বিমলেন্দুর শ্বশুর-বাড়ীতে। আগেই ফোন করেছিলাম বৈশাখীকে। মহাখুশী সে আমি যাব শুনে।

দোতলার ব্যালকোনীতে দাঁড়িয়ে ছিল বৈশাখী। দূর থেকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে নেমে এল নীচে। 'আসুন মাষ্টার মশাই' ব'লে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে বসাল সোফাতে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল আমাকে—ঠিক যেমন করত পরীক্ষা দিতে যাবার আগে। পড়ান না থাকলেও প্রণাম নিতে আসতে হত প্রত্যেক পরীক্ষার অন্ততঃ প্রথম দিনটিতে। কোন ওজর আপত্তি শুনত না বৈশাখী।

আবদার ক'রে বলল,—না খেয়ে কিন্তু যেতে পারবেন না মাষ্টার মশাই। কতদিন হয়ে গেছে রান্না করে খাওয়াই না আপনাকে।

রাজী হলাম। মহাখুশী হ'ল বৈশাখী। তার মাকে আমার কাছে গল্প করতে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল রান্না ঘরে।

মাঝখানে একবার এসে তর্জনী উঁচিয়ে ব'লে গেল, যত পদ রান্না হবে সব খেতে হবে। পেটে জায়গা নেই বললে শুনছি না কিন্তু। কৃত্রিম শাসনের স্বর। মা যেন শাসন করছে তাঁর ছোট্ট ছেলেকে।

হেসে বললাম, আচ্ছা মা আচ্ছা। তুমি যা যা রান্না করবে তোমার এ পেটুক ছেলে সব খাবে।

সে যে খুশী হয়েছে তা চোখের ইশারায় জানিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল বৈশাখী।

নবম শ্রেণী থেকে বি. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়েছে আমার কাছে। বৈশাখী আমাকে শুধু তার গৃহশিক্ষকই মনে করে না। নিতান্ত আপনার জন ব'লে জানে।

দুঃখ ক'রে বললেন বৈশাখীর মা সাবিত্রী দেবী, অমন হরিণ শিশুর মত স্ফূর্তিবাজ মেয়ে কেমন মন মরা হয়ে পড়েছে। আপনি আসবেন শুনে গতকাল থেকে কি আনন্দই না করছে!

পাশের দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন বৈশাখী আসছে কি না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে গেলেন বৈশাখীর মনোবেদনা ও অভিযোগের কাহিনী। নিজেই সিদ্ধান্ত টেনে বললেন, তা বাপু মেয়ে মানুষের কি অত দেমাক থাকা ভাল? আমি তো আগেই ওকে বলেছিলাম—ছেলে হিসেবে বিমলেন্দু খুবই ভাল। বংশও ভাল। কিন্তু তুমি যে প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষ হয়েছ তা সেখানে পাবে কেন? তবে বিয়ে যখন হয়েছে তখন শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা যেমনই হোক তাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। কি বলেন? তা না ক'রে বাপের বাড়ীর প্রাচুর্য্য উল্লেখ ক'রে খোঁচা দিলে কি চলে?

চলে না বলেই তো বৈশাখী নিজেই চলে এসেছে শ্বশুর বাড়ী থেকে। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আপনি ভাববেন না। এখন ও ছেলেমানুষ। সময় কালে নিজেই বুঝবে।

কিছুটা আশ্বস্ত হলেন সাবিত্রী দেবী। বললেন, আপনার আশীর্বাদে তাই যেন হয়। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, ওমা বারটা বাজতে চল্‌ল যে। আপনার স্নানের বেলা হয়ে গেল।

স্নানাহারের পর বিশ্রাম হল। আমার অনুরোধে পিয়ানো খুলে নিয়ে বসল বৈশাখী। যে দুটো গান আমাকে প্রায়ই শোনাত তারই একটা গান গাইল সব শেষে। অপূর্বকণ্ঠে গাইল গানটি:

হে করুণা পারাবার
করুণা তোমার পূরণ করে যে
সাধ সবাকার।
এ জীবনে আমি চেয়েছি যত
পেয়েছি তাহার শতগুণ কত
তব ভুবনে আনন্দ অপার
বাজে যদি তব সুর হৃদয় মাঝে।

গানটি শেষ হ'লে ইচ্ছা করেই জিজ্ঞাসা করলাম, মনে হচ্ছে অনেকদিন পরে এ গানটি গাইলে, না মা?

কেন মাষ্টারমশাই?—পূর্বের মত আজও আশা করেছিল আমি তার তারিফ করব। তাই জিজ্ঞাসা করল—সুরের কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

একটু আমতা আমতা ক'রে বললাম, না, মানে বলছিলাম কি, এই গানের সঙ্গে তোমার অন্তরের যে দরদ থাকত তা যেন পেলাম না।

কি করে আর পাবেন বলুন,—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল বৈশাখী। আগে আমি যা গাইতাম তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এই গানের মর্মার্থ আর বিশ্বাস হয় না।

বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কিরে মা? তোমার মুখে এরকম কথা! এই তো সবে জীবনের শুরু। এর মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাবার কি এমন কারণ ঘটল?

একটু নীরব থাকল বৈশাখী। বলল, আপনি যে এসেছেন এ বোধ হয় ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। সব কথা খুলে বলব আপনাকে।

আমি তো এই স্থযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম। মনোবেদনায় ভুগছে যে সে নিজে থেকে মন না খুল্লে তার মনের গহনে নামা যায় না। তার মনের ব্যথাও দূর করা সম্ভব হয় না। তাই বললাম, বল মা!

পিয়ানো বন্ধ ক'রে বৈশাখী উঠে এল আমার কাছে। হাত ধরে টেনে বসালাম আমার পাশে। মুখ নীচু করে একটানা বলে গেল শ্বশুর বাড়ীর জীবনের ইতিবৃত্ত। হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে আবেগ ভরে বলল, আপনিও তো বিয়ের আগে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। মনের মত বর পেয়েছি ব'লে খুশী হয়ে কত আদরই না করেছিলেন আমাকে। কিন্তু মাষ্টারমশাই। স্বামীকে ঘিরে যে সাধ আহ্লাদ ও স্থখের জীবন রচনা করেছিলাম তার কণামাত্রও পেলাম না বাস্তবে।

বিমলেন্দু লোক ভাল। কিন্তু স্বামী হ'তে জানে না। মানুষের মন বুঝতে চায় না। পারেও না বোধ হয়। আমার জীবনেও যে একটু বৈচিত্র্য দরকার তা ও বুঝতে চায় না। বাড়ীর মধ্যে ঐ দুটো বুড়ো-বুড়িকে নিয়ে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। ওর উগ্র মাতৃ-পিতৃ ভক্তি আর আমার প্রতি উদাসীনতা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই অসহিষ্ণু মনের জ্বালা কখনও কখনও ভাষায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন বিমলেন্দু এমন আঘাত দেয় যা ভাবতেও পারি না। সহানুভূতি বা অনুকম্পা দেখায়নি এতটুকু। শুধু দিয়েছে প্লেটোর মত উপদেশ। সেদিন আমায় বলে কি না, নিজের পথ দেখ। আমি ওকে পর ভাবি? আমার···।

আর বলতে পারল না। বেদনার অভিভূতিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কোন কথা আমিও বলতে পারলাম না। বৈশাখীর বুকের বেদনার

ঢেউগুলি আমার পাঁজরার ওপরে যেন আছড়ে পড়তে লাগল। মুখ নীচু করে ভাবতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। ঘড়িতে বেজে উঠল —চং—চং—চং।

বৈশাখীর মনের ভাব হালকা করার উদ্দেশ্যে বললাম,—তোমার সেই স্পেশাল চা হবে না কি মা?

এক্ষুনি দিচ্ছি মাষ্টারমশাই। অবিন্যস্ত বসন গুটিয়ে নিয়ে উঠে গেল বৈশাখী। পাশের ঘরে পা দিয়েই ফিরে চাইল আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করল, চিনি ছাড়া তো?

মৃদু হেসে বললাম, দিও, তবে বেশী নয়।

'আচ্ছা' ব'লে আড়াল হয়ে গেল চোখের পলকে।

ভাবতে লাগলাম, অদ্ভুত মেয়ে। এখনও মনে রেখেছে যে আমি চায়ে চিনি খেতাম না। আহা! কি সরল মন! কি বললে বিমলের ওপরে বিরূপ মনোভাব দূর হবে?

চা নিয়ে এল বৈশাখী। ইশারা করতে বসল আমার পাশে—যেমন বসত যখন পড়ত আমার কাছে। চায়ে চুমুক দিয়ে বলে উঠলাম, পার্ফেক্ট। অপূর্ব চা হয়েছে। হাল্কা ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা সোনা মা! তুমিই না একদিন বলেছিলে, আমি যা বলি তা সত্যি হয়?

হয়ই তো। অনেকবার প্রমাণ পেয়েছি। শিশুর মত আবদার করে বলল বৈশাখী,—বলুন না মাষ্টার মশাই, আমার ল-এর [আইন পরীক্ষার] রেজাল্ট মনের মত হবে কি না। ফার্স্ট ক্লাস পাব তো? আপনি যা বলবেন তা ঠিকই হবে।—আহ্লাদভরে আমার আরও কাছে এগিয়ে এল বৈশাখী।

বৈশাখীর কানের পাশের চুলগুলি বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বললাম,—ল'তে তো তোমাকে পড়াই নি মা। তাই "অ্যাসেস" করি কি ক'রে বল? তবে এইটুকু বলতে পারি যে লাভ-লাইফের রেজাল্ট যার মনের মত, তার ল-পরীক্ষার রেজাল্ট যেমনই হোক না কেন, সে জীবনটাকে ল-ফুলি চালাতে পারবে। তার জীবন লাভের অঙ্কে ভরে উঠবেই কি উঠবে।

কিন্তু সেখানেই তো আমি "ফেলইওর" মাষ্টার মশাই! ফ্রাস্ট্রেটেড! তাহলে?—বৈশাখীর কান্না-ঝরা চোখের কোনে ফুটে উঠল জানবার ব্যাকুলতা।

জোরের সঙ্গে ব'লে উঠলাম,—না। কখনই না। যে মেয়ে তার বাবাকে

ভালবাসে যে কখনই লাভ-লাইফে অকৃতকার্য্য হতে পারে না। এ একটা সাময়িক সেট্-ব্যাক [বিপর্য্যয়]। আমি বলছি, তুমি কৃতকার্য্য হবেই হবে। তবে মা আমি যা বলি তা শুনতে হবে।

আমার মুখোমুখী ঘুরে বসল বৈশাখী। আগ্রহভরে বলল,—শুনব ব'লেই তো আপনাকে সব কথা খুলে বললাম। বলুন, আমি কি ভাবে চলব!

চোখের ইশারা মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—বিমলেন্দুকে খুব ভালবাস, না সোনা?

সলজ্জ বৈশাখী মুখ নীচু করে উত্তর দিল,—আপনি তো সবই জানেন। তবে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে প্রাণই যে ওষ্ঠাগত হবে তা কে জানত?

রহস্যচ্ছলে বলার মত করে জিজ্ঞাসা করলাম, বিমলেন্দুর কি ভালবাস? তার চেহারা, স্বাস্থ্য, রূপলাবণ্য, কণ্ঠ, বাগ্মিতা না পাণ্ডিত্য?

আমার প্রশ্নে হেসে ফেল্ল বৈশাখী। বলল,—বস্তু বাদ দিয়ে কি কোন গুণ ভাবা যায়? গোটা মানুষটাকে ভালবাসি। সেই আমার "অবজেক্ট অফ লাভ"—ভালবাসার পাত্র!

একটু গম্ভীর ভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম,—বিমলেন্দু ব্যক্তিটাকেই যখন ভালবাস, সেইই যখন তোমার প্রাণের মানুষ, তখন তার অহং যদি তোমার মনকে বুঝতে না চায়, তোমার পরামর্শ মত যদি তাকে চলতে না দেয়, তবে বিমলেন্দু লোকটির ওপর বিরক্ত হও কেন? বিরক্ত হতে পার বিমলেন্দুর অহং-এর ওপরে।

বিস্মিত হল বৈশাখী। বলল,—দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি এসব কি বলছেন মাষ্টার মশাই! বিমলেন্দু মানুষটার ওপরে রাগ না করে তার অহং-এর ওপরে রাগ করব? সে আবার কেমন কথা?

মৃদু হেসে বললাম,—শোন! শোন! তুমি যেদিন প্রথম তাকে ভালবাসলে, যে গুণের জন্য তাকে ভাল লাগল সে গুণ কি তার ভেতরে এখন নেই?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল বৈশাখী—তা সবই আছে।

আমি বললাম,—বরং নূতন যা দেখছ তা হচ্ছে তার কতকগুলি দোষ—এই তো? সে বড় একরোখা, ইগোইষ্টিক, তাই না?

ঠিক বলেছেন।—আগ্রহভরে তাকাল বৈশাখী। সে যা বলবে তাই মানতে হবে।

সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে বললাম, সব মানুষই দোষে গুণে মেশান। তার গুণ দেখে ভালবেসে ছিলে! এখন দু-চারটে দোষ দেখেই তার ওপর থেকে ভালবাসা তুলে নেবে?

আবেগভরে বলল বৈশাখী,—কিন্তু মাষ্টারমশাই, আমি তো ওকে খুবই ভালবাসি। এখনও ভালবাসি। ও আমাকে যে আঘাত দেয়! কি ক'রে সহ্য করব বলুন?

বৈশাখীর হাত দুখানা চেপে ধরে বললাম, শোন লক্ষী। মানুষ তাকেই ভালবাসে যার কাছে তার অহং আশ্রয় পায়। তুমি যদি ওর অহংকে ধাক্কা না দিয়ে আশ্রয় দাও তাহলে সে তোমাতে অনুরক্ত হয়ে উঠবে।

একটু নীরব থেকে নীচু গলায় বললাম,—বিমলেন্দুর জীবনেও তো তুমি ছাড়া দ্বিতীয় আশ্রয় কেউ নেই। বাবা পঙ্গু। মা বৃদ্ধা। ও পুরুষ মানুষ। ও কার কাছে আশ্রয় নেবে বল? ওর দোষ, ত্রুটী, অহং সব কিছু নিয়ে তোমার কাছে যদি আশ্রয় না পায়, প্রেরনা না পায় তাহলে অন্তরে যে দেউলিয়া হয়ে যাবে! জীবনে ছন্নছাড়া হয়ে পড়বে! লক্ষী মা আমার! ওকে তুমি এভাবে দূরে সরিয়ে দিও না।

আমার আবেগমাখা কথা ও গলার স্বরে বৈশাখী কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল। আমার চোখের কোণে জল দেখে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল। মুখে কোন কথা বলল না। তবে মনের মৌন আবেগ ও কণ্ঠের অস্ফুট ভাষা শুনে মনে হল আমার কথাগুলি তার অন্তরে ঝড় তুলেছে। বলল, আমি ফিরে যাব মাষ্টারমশাই।

আনন্দে বৈশাখীর মাথাটা আমার কোলের ওপরে নামিয়ে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বললাম,—এই তো আমার সোনা মার মত কথা! —একটু চুপ করে থেকে বল্লাম,—বিমলেন্দু নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেয় না। বুড়ো বাপ-মাকে মাথায় ক'রে রেখেছে। ওর ছেলে যে আরও বেশী পিতৃমাতৃ ভক্ত হবে তাতো ঠিক! তুমি কি চাও না, তোমার ছেলে পিতৃ-মাতৃ ভক্ত হোক? তোমাদের বৃদ্ধ বয়সে তোমাদেরকে মাথায় করে রাখুক?

চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে বৈশাখীর। চোখের জল মুছতে মুছতে বলল,—কোন মা এমন ছেলে না চায়?

বেশ জোরের সঙ্গে বললাম,—তা যদি চাও, তবে স্বামীর চরিত্রের ঐ গুণটিকে তোমায় পোষণ দিতেই হবে। বাবা মার স্বস্তি ও তৃপ্তির ব্যাবস্থা

করতে যেয়ে বিমলেন্দু যদি তোমার প্রতি উদাসীন হয়েও ওঠে, তবুও তুমি তার প্রতি বিরূপ হইও না। বরং সহযোগিতা ক'রো। দেখবে, প্রকৃতিই তোমাকে সন্তান সৌভাগ্যে ভরপুর ক'রে তুলবে। লক্ষ্মী মা আমার! আমি বলছি, তুমি সুখী হবেই।

সুখী হয়েছিল বিমলেন্দুও। করনীয় যা তার একটিও বাদ দিতেই হয় নি তাকে। শুধু উপদেষ্টার ভূমিকা থেকে নেমে সমব্যথী বন্ধুর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ছিল বিমলেন্দু। বিস্তৃত বর্ননা ক'রে বলল,—ওর খোঁচা মারা কথা শুনলে রাগ হতো। আপনি বলার পর আর রাগ করতাম না। সুমিত্রাকে নিয়ে কটাক্ষ করলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতাম। ইদানীং বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসে আর তেমন কটাক্ষ করেনি। একদিন মাত্র করেছিল। অমনি ওর মুখখানা আমার বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলেছিলাম,—তোমার নিজের জিনিষকে এত ছোট ভাব তুমি? চুপ করে থাকল। আবেগের বহিঃপ্রকাশে মনে হল, আর সে এমন কথা বলবে না। ও যাই বলুক না কেন ওর অহং-এ আঘাত দিতাম না। বরং নিজের মনের অর্গল খুলে দিয়ে সরল-ভাবে বৈশাখীর সহযোগিতা চেয়েছিলাম। অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি ও পাচ্ছি বৈশাখীর কাছ থেকে। ও—ও আর বাপের বাড়ীর কথা তুলে দেমাক দেখায় না। বেশ সুখে আছি!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে বৈশাখী ও বিমলেন্দু দুজনেই আমার পরামর্শের মর্য্যাদা দিয়ে ছিল। তাই তাদের দাম্পত্যজীবন আকাশে বিচ্ছেদের কালো মেঘ ভেদ ক'রে ব্যক্ত হয়ে উঠেছিল মিলনের মধুচন্দ্রিমা!

কিন্তু মৌসুমীর জীবনটা দুর্বিসহ হয়ে উঠল তার স্বামীর ভালবাসার অভিব্যক্তির অভাবে।

ভালবাসার অভিব্যক্তির অভাব

বিষ্ণুপুরের উৎসব শেষ হল। আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বড়ালদের বাড়ীতে। গৃহকর্ত্তা অরুণাভ বয়সে তরুণ। চেহারায় আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। অরুণাভের স্ত্রী মৌসুমী। চোখে-মুখে শিশুর সারল্য। প্রাচীন ও নবীনের এক অপূর্ব সমাবেশ তার আচার আচরণে। তিন শিশুর মা সে।

আমি এদের অতিথি। একঘরে শুয়েছে অরুণাভ ও তার দুই নবাগত বন্ধু। আমার শোবার ব্যবস্থা অন্যঘরে। মৌসুমী তার মেয়েদের নিয়ে

শুয়েছে চৌকিতে। আমার বিছানা পাতা হয়েছে মেঝেতে—ফ্যানের তলে। কারণ ভাত না হলে যদিও বা চলে, ফ্যান না হলে একেবারে অচল।

সবে তন্দ্রা এসেছে। হটাৎ কোমল করের স্পর্শে তন্দ্রা ছুটে গেল। চোখ মেলে দেখি মৌসুমী আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

সস্নেহে বললাম, তুমি শোওগে মা। আমাব পায়ে হাত বুলাতে লাগবে না।

মৌসুমী শুনলে না। বলল,—সাবাদিন অক্লান্ত পবিশ্রম কবেছেন। আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দেই, আপনি ঘুমিয়ে পড়ন। আমাব বাবা প্রফেসব ছিলেন। যেদিন সন্ধ্যায়ও ক্লাস নিতেন, সেদিন তাব সহজে ঘুম আসত না। আমায় বলতেন তাঁব পায়ে, পিটে হাত বুলিয়ে দিতে।

দবকাব হ'লে আমি নিজেই তোমাকে বলব। তুমি এখন শোওগে। রাত্রি অনেক হয়েছে।—আমি পাশ ফিবে শুলাম।

কাতব কণ্ঠে বলল, মৌসুমী,—আমি পা ছুঁলে কি অন্যায় হবে, জেঠু?

কণ্ঠেব আবেগ উপেক্ষা করতে পাবলাম না। বললাম—ঠিক আছে। দাও হাত বুলিয়ে। তবে চাব পাঁচ মিনিট সময় দিযে তোমার জায়গায় উঠে যেও। কেমন?

"আজ্ঞে" ব'লে মৌসুমী আমাব পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আবাব তন্দ্রা নেমে এল চোখেব পাতায়, নাকের গর্জন শুরু হবাব তোড-জোড হচ্ছে। ঠিক সেই সময় কয়েক ফোঁটা চোখেব জল ঝবে পডল আমার ডান পায়েব পাতার ওপরে। চকিতে উঠে বসলাম বিছানায়। নাইট ল্যাম্পেব অনুজ্জ্বল আলোতেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল মৌসুমীব জলভবা চোখ দুটি।

বিস্মিত হলাম। যে মৌসুমী সারাটা দিন হৈ-হুল্লোড, কর্ম্মব্যস্ততা, অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়নে—আনন্দে মসগুল হয়ে ছিল, তার চোখে জল কেন! জিজ্ঞাসা কবলাম,—কি হয়েছে মা? কাঁদছ কেন?

চাপা কণ্ঠে বলল মৌসুমী,—আমার জীবনে বড় ব্যথা জেঠু! দশ বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু দশটা দিনও অনুভব করতে পারি নি স্বামীর ভালবাসা কেমন? মনে হয় আমার এ জীবনটা অভিশপ্ত।

বিস্মিত হলাম। বললাম,—সে কিরে মা! তোমার মত সুন্দরী, সেবা-

প্রাণা, বুদ্ধিমতী প্রাণচঞ্চলা স্ত্রীকে অরুণাভের মত তরুণ স্বামী ভালবাসে না— এতো ভাবতেও পারছি না।

আঁচলটা কাঁধের ওপরে তুলে দিয়ে বলল,—আমার সব কথা আপনাকে বলব বলেই তো উৎসব কমিটিকে অনুরোধ করেছিলাম, আপনার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের বাড়ীতে করতে। এত কষ্টে থাকতে রাজী হয়েও যে এই গরীব মেয়ের বাড়ীতে উঠেছেন, এ পরমপিতারই অশেষ দয়া!

ওকথার জবাব না দিয়ে বললাম,—অরুণাভ কি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে?

না, তা করে না। কোন জিনিষেরও অভাব রাখেনি। মুখ দিয়ে বলতে যেটুকু দেরি। তিনটি শিশুর মাও তো হয়েছি, বলুন! কিন্তু—একটু নীরব থেকে বলল মৌসুমী,—ওর সঙ্গে ঘর না করলে ধারণা করা যাবে না যে, কোন মানুষ এত নীরস হতে পারে। এমন কি ঠাট্টা-তামাসার ভেতর দিয়েও ওর ভালবাসার উত্তাপ আমার অন্তরকে স্পর্শ করে নি কোন দিন।

একটু নীরব থেকে আবার বলতে লাগল,—ও যেন একটা মেসিন। ঘুম থেকে উঠল। রুটীনমত কাজ সেরে খেয়ে নিল। টিফিন বাক্সটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল অফিসে। কোনদিন যাবার সময় ইঙ্গিতেও বলেনি, 'আসি।' অফিস থেকে ফিরে এসেও তো সে জানায় নি যে সে এসেছে। কত আশা নিয়ে নানা পদ রান্না করেছি। সাগ্রহে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কাছে বসে হাওয়া করেছি, চেটেপুটে খেয়ে গেছে সব। অথচ একবারও বলেনি, বাঃ তরকারিটা ভাল হয়েছে তো! অবশ্য নুনেপোড়া হলেও বিরক্তি প্রকাশ করেনি। তার নিতান্ত দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া সারাদিনে একটা কথাও বলে না আমার সঙ্গে। কোন বিষয়ে আমি দশবার জিজ্ঞাসা করলে সংক্ষিপ্ত একটা 'হুঁ' বা 'না' বলে চলে যায় নিজের কাজে। পাশের বাড়ীর নন্দীবাবুকে দেখি ছুটির দিনে স্ত্রীর সঙ্গে কত গল্প, কত রঙ্গরস করেন।

আপনাকে কি বলব বলুন। যখন দেখি, রাস্তাঘাটে, ট্রেনের কামরায় নববিবাহিত কোন দম্পতি সোহাগভরা চাহনীর চকিত বিনিময়ে পরস্পর পরস্পরের অন্তরকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, উভয়ের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির গোলাপী আভা, তখনই আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন ক'রে ওঠে। মনে হয়, আমারও তো বিয়ে হয়েছে। কৈ, স্বামীর কাছ থেকে এমনটি তো কোনদিন পাই নি। তাই, এত সব থেকেও নিজেকে কেমন যেন নিঃস্ব মনে হয়।

আমার নিজের বুকে কোন ভালবাসা আছে ব'লে বুঝতে পারি না। সব বুঝি শুখিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সারাটা জীবন কি এমনভাবে শুখনো বুক নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব? আপনি বলেদিন জেঠু, আমি কি ভাবে চলব!

কি যে বলব তাই তো ভাবছি। অরুণাভের অক্ষমতা যে, সে তার অন্তরের ভালবাসা অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত করতে পারে নি। এটা তার অপরাধ নয়, অপারগতা। মৌসুমী জানেনা যে কোন কোন পুরুষের ভেতরে অনুরাগ-উদ্দীপী-সংবেদনশীলতা [Love-inspiring-responding sensitivity] খুব কম থাকে, বা একেবারেই থাকে না। বিশেষ বিশেষ কারণে মুখে অরুচী হলে মানুষের খাবার আগ্রহ একেবারে উবে যায়। ঠিক তেমনই জৈবিক কোন অসংগতির কারণে মানুষের ভেতরে অনুরাগউদ্দীপী সংবেদনশীলতা কমে যায় বা একদম শুখিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসার ফলে রুচী যেমন ফিরে আসে, উপযুক্ত পরিচর্য্যা পেলে পুরুষের ভেতরে অনুরাগ-উদ্দীপী-সংবেদনশীলতা বেড়ে যায়। হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানে কি বলে তা জানা নেই। তবে স্ত্রীর তরফ থেকে অপ্রত্যাশিত একতরফা আদর, সোহাগ ও ভালবাসার বিভিন্ন অভিব্যক্তি স্বামীর অনুরাগ-উদ্দীপী-সংবেদনশীলতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু মেয়েদের প্রকৃতিগত সমস্যা এই যে, সাধারণতঃ তাদের বুক ফাটে, তবুও মুখ ফোটে না। দয়িতের প্রতি টান আকারে, ইঙ্গিতে, চলনে-চাহনীতে ব্যক্ত হবার জন্য বুকের ভেতরে আঁকু পাঁকু করতে থাকে। কিন্তু প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করে, যতক্ষণ না তার স্বামী তাঁর বুকের ভালবাসাকে অভিব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেন।

বিষয়টি বুঝিয়ে বললাম, মৌসুমীকে। কেমন ক'রে কখন, অরুনাভের প্রতি ভালবাসা একতরফাই ব্যক্ত করতে হবে শিখিয়ে দিয়ে বললাম,—তুমি এমনতর করতে থাক। আমিও দেখছি অরুণাভের ভিতরে পরিবর্তন আনতে পারি কি না।

বলা বাহুল্য অরুণাভের জীবনে যে পরিবর্ত্তন এসেছিল তা মৌসুমী নিজেই একদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানাল,—জেঠু! মানুষের অজ্ঞতার অন্তরালে যে তার দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ লুকিয়ে থাকে তাতো আগে বুঝিনি। আজ বুঝতে পারছি ঠাকুর কেন বলেছিলেন,—

তুমি তোমার স্বামীর ভালবাসার
ভিক্ষুক সাজিও না

বরং তুমি তাহার প্রতি
সেবা, যত্ন, ভক্তি-ভালবাসার
উৎস হইয়া দাঁড়াও—
দেখিও—
দুঃখ ও দোষ-দৃষ্টি হইতে
কতখানি রেহাই পাও।

[শ্রীশ্রীঠাকুর। নারীর নীতি : P-149]

স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হলে

কিন্তু রেহাই পেল না কৌশিক। কৌশিক মুখার্জ্জী। এম. এ.-তে প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব নিয়ে পাস করে আই. এ. এস. পরীক্ষাতে বসেছে গত মাসে। আশা করছে ইণ্ডিয়ান অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসেও ভাল রেজাল্ট করবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে হোম-সার্ভিসে —অর্থাৎ গৃহপরিবেশে গৃহিনী শতাব্দীকে নিয়ে। সেদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসল আমার চেম্বারে। বলল,—দাদা! শতাব্দী যে এমন চরিত্রের মেয়ে তা যদি আগে জানতাম তাহলে লাখ টাকা দিলেও বিয়েতে বসতাম না।

হেসে বললাম,—তোমার আবার কি হলো?

নিজে জেনে শুনে বিয়ে না করলে যা হবার তাই হয়েছে। চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বলল কৌশিক,—জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম,—তুমি ইতিহাসের ছাত্র। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে বিংশতি খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এতগুলি শতাব্দীর ইতিহাস অধ্যয়ন করেছ আর মাত্র একটা 'শতাব্দীর' জীবন ইতিহাস বিয়ের আগে উল্টে দেখ নি?

নিজেকে সমর্থন ক'রে বলল কৌশিক—বাবা বললেন, ভাল বংশ। তাছাড়া খুবই জানা-পরিচিত পরিবার। মেজমাসী ও তাঁর মেয়ে উর্বশী তো পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছিল শতাব্দীর। কিন্তু এখন দেখছি খুবই নোংরা স্বভাবের মেয়ে।

প্রতিবাদের কণ্ঠে বললাম,—বল কী কৌশিক? শতাব্দীকে তোমার বিয়ের আগেও দেখেছি। অমন শোভন স্বভাবের মেয়ে খুব কমই দেখা যায়।

অপ্রতিভ হল কৌশিক। বলল আমার ভাষাটা একটু কড়া হয়ে গেছে। তবে যা সে শুরু করেছে তা শুনলে বলবেন, সে শতাব্দী আর নেই!

অন্য একটি মেসিনে নূতন ক্যাসেট সেট করাই ছিল। কৌশিকের অগোচরে টেপরেকর্ডার অন্ করে দিয়ে বললাম,—বল না সব খুলে।

টেবিলের ওপরে দুই কনুই ভর দিয়ে নিজের মাথাটা আল্‌তো ক'রে চেপে

ধরে কৌশিক বলতে লাগল,—আমার প্রতি উদাসীন। এমন কি চা জলখাবারের ভার পর্য্যন্ত রাঁধুনী আর চাকর রামুর হাতে। নিজে কোন্ এক গানের স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। সকাল ন'টায় সঙ্গীত শিখতে যায়। তার আগে পর্য্যন্ত তো রেওয়াজ করা নিয়েই মসগুল থাকে। বেশীর ভাগ দিন সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায় আমার মাসতুতো ভাই প্রলয়ের সঙ্গে। যখন খুশী বাড়ী ফেরে। কোথায় গেছিল জিজ্ঞাসা ক'রলে বলে—ফাংশনে। বড় বড় শিল্পীরা নাকি এসেছিলেন। তাঁদের আসর অ্যাটেণ্ড করলে নাকি তাড়াতাড়ি ভাল গান শেখা যায়। অথচ আমার প্রয়োজন অ্যাটেণ্ড করার, বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার।—কথাগুলি বলতে বলতে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল কৌশিক। আমার দিকে তাকিয়ে আবেগ ভরে বলল,—ও তো এমন ছিল না। প্রলয় এ বাড়ীতে আসবার পর থেকেই ওর পরিবর্ত্তনটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার কোন কিছুই ওর পছন্দ হয় না। কেমন একটা চাপা ক্ষোভ। কোন কিছু বললে মুখের ওপরে জবাব দেয়। এমন মন্তব্য ক'রে বসে যা অসহ্য। বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে ডিভোর্স হলেই বোধ হয় ভাল। শতাব্দীও মনে হয় তাই চায়।

হেসে বললাম,—তোমাদের ডিভোর্স আর ডেন্টিস্টদের একস্‌ট্র্যাকশন বোধ-হয় একই দেবতার দান। দাঁতে যন্ত্রণা নিয়ে ডেন্টিস্টের কাছে যাও—সঙ্গে সঙ্গে দাওয়াই—তুলে ফেলুন! বাকী দাঁতগুলিতে যে যন্ত্রণা হবে না তার গ্যারান্টী তাঁরা দেন কি? শতাব্দীকে ডিভোর্স করে আবার যাকে ঘরে আনবে সে তোমাকে ঘর ছাড়া করবে না তার গ্যারান্টী দিতে পার?

অসহায়ের মত চাইল কৌশিক। বলল,—তাহলে কোন পথে যাব?

মনে মনে ভাবলাম,—স্বামী হিসাবে যে পথে চলা উচিত ছিল সে পথে চল নাই বলেই আজ পথের সন্ধানে বেরুতে হয়েছে। বললাম,—প্রদীপের শিখা ম্লান হয়ে আসে কখন?

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। বলল,—কেন, তেল ফুরিয়ে গেলে!

তাহলে তেল দিয়েই ম্লান দীপশিখা আবার প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে?

'অফকোর্স'! তেল দিলে তো শিখা আবার জ্বলে উঠবেই।—প্রশ্ন ক'রে যেন ঠকান যাবে না—এমনতর ভাব কৌশিকের চোখে মুখে।

ঠিক বলেছ!—কৌশিকের পিঠে একটা থাবা মেরে বললাম,—শতাব্দীর

হৃদয় প্রদীপে তোমার ভালবাসারূপ তেল ঢেলে দাও গে ; দেখবে তার অন্তরের প্রেমশিখা যেমন প্রোজ্জল ছিল ঠিক তেমনই জ্বল জ্বল করছে।

বিস্মিত হল কৌশিক। বলল,—শতাব্দীর প্রতি কর্তব্যের কোন অবহেলা তো আমি করি নি। আমি ওকে সত্যিই ভালবাসি। কিন্তু ওই আমার ভালবাসার দাম দিল না। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা—।

বাধা দিয়ে বললাম,—যা ভেবেছ তা সে নয়। তুমি তাকে ভালবাস ঠিকই। কিন্তু বর্ণচোরা। বাইরে তার রঙ ফুটে বের হয় নি। তাই শতাব্দী তা মনে প্রাণে অনুভব করতে পারে নি।

তাতে আর আমার কি দোষ বলুন ?—নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করল কৌশিক।

তোমার অজ্ঞতাই তোমার একমাত্র দোষ। তুমি জান না, স্ত্রী স্বামীর কাছে, কি চায়! তারা যা চায় তা পায় না বলেই অন্য বায়না ধরে ;

স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে কি চায় দাদা ?—চেয়ার খানা আর একটু এগিয়ে এসে সাগ্রহে চেয়ে রইল কৌশিক।

বিজ্ঞের মত ভঙ্গী করে বললাম,—প্রত্যেক স্ত্রী চায় স্বামীর আদর, সোহাগ, ভালবাসার জীবন্ত অভিব্যক্তি। তারা প্রতিনিয়ত অনুভব করতে চায় যে স্বামী তাকে সবচাইতে বেশী ভালবাসে।

সবচাইতে বেশী !—হেসে উঠল কৌশিক। বলল—স্ত্রী ভাল হোক, আর মন্দ হোক, সুন্দর হোক বা কুৎসিৎ হোক, তাকেই ভালবাসতে হবে সব চাইতে বেশী ? শুনেছি, ইংরাজ কবি চসার নাকি বলেছেন, Woman wants to predominate over her husband—অর্থাৎ নারী তার স্বামীর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আর আপনি বলছেন—!

হেসে বললাম, তার মানেই তাই। প্রত্যেক স্ত্রীই তার স্বামীর কাছ থেকে লাভ-লাইফে সিকিওর্ড (Sccured=নিরাপদ) হতে চায়।

নীরব কৌশিক। বোধ হয় মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে স্মৃতির সাগরে ডুব দিয়ে।

বাঁদিকের টেপরেকর্ডারের সুইচ্‌টা টিপে দিয়ে বললাম,—মন দিয়ে শোন নারী কি চায়।

আরে! এ যে শতাব্দীর গলা! সাগ্রহে শুনতে লাগল শতাব্দীর বিবৃতি।

"আপনিই বলুন দাদা। মানুষ কি শুধু খাওয়া পরা নিয়ে বেঁচে থাকতে

পারে? গা-ভরা গহনা পরলেই কি মনের স্বাদ মিটে যায়? ছেলে কোলে এলেই বুঝি সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল? এসব ছাড়াও স্ত্রীর জীবনে যে আরও কিছু প্রয়োজন আছে তা আপনার ভাই কিছুতেই বুঝতে চায় না।

আজ দেড় বছর বিয়ে হয়েছে। ও তখন এম. এ. ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সঙ্গে আই. এ. এস.ও দেবে ব'লে তৈরী হচ্ছে। ভোর বেলায় পড়ার ঘরে ঢোকে। দুপুর বারোটায় নেমে আসে খেতে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার দেখা পাওয়াই দায়। চা, কফি, কখনও এক কাপ দুধ কিম্বা দুটুকরো আপেল দেওয়ার অছিলায় ওর পড়ার ঘরে গেলাম। ও বই-এর পাতা থেকে মুখ তুলেও চায় না। যদি বলি—'চা', গম্ভীর স্বরে বলে, রেখে যাও। দুধটুকু খেয়ে নাও বললে বলে, ঢেকে রাখো। আপনিই বলুন, একটা বিড়াল কাছে যেয়ে মিউ মিউ ডাকলে মানুষ তার প্রতুত্তোর করে। অথচ অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি, আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে না। তখন কেমন লাগে বলুন?

বাড়ীতে তো চারটে প্রাণী। বুড়ো শ্বশুর, শাশুড়ি আর আমরা দুজন। রাঁধুনী রান্না করে, আর রামু সামলায় বাইরের ঝুট ঝামেলা। শ্বশুরের প্রয়োজনে শাশুড়ি যেন সদা জাগ্রত। বেশ শক্ত আছেন তিনি! আমার তো সময় কাটতে চায় না। দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয় ওর মুখখানা একটু দেখে আসি। কিন্তু সে কি উপায় আছে? কলমটা কিম্বা দুখানা পোষ্টকার্ড নেবার অছিলায় টেবিলের কাছে গেলেই ব'লে ওঠে,—এখন ডিস্টার্ব করো না। তখন কেমন লাগে বলুন!···রাতদিন পড়ে। ভাবি মাথায় একটু হাত দিলে, কিম্বা চুলগুলি আস্তে আস্তে টেনে দিলে পড়ার ক্লান্তিটা কম হতে পারে। সেদিন দুপুরে না ঘুমিয়ে পা টিপে টিপে ওর ঘরে ঢুকেছি। মজা করার জন্য পেছন থেকে ওর ঘাড়ে খুব জোরে একটা ফুঁ দিয়েছি। ও চমকে লাফিয়ে উঠেছে। বোধ হয় ভয় পেয়েছে ঘাড়ে হঠাৎ এভাবে ফুঁ লাগায়। চোখ-মুখ বিকৃত ক'রে বলে উঠল,—ন্যাকামী করবার সময় নেই আমার। নিজের কাজ করগে। কাজ, কাজ আর কাজ! কাজ ছাড়া উনি কিছুই বোঝেন না। আপনিই বলুন, স্বামী-স্ত্রী কি মজা-মস্করাও করে না? আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি। তখন মনে হল, পড়ছে না, ছাই পাঁশ করছে। বই-এর গাদার দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছা করল, আগুন লেগে সবগুলি ছাই হয়ে যায় না কেন? এমন একটা নীরস, হাড়মাংসের ঢেলার সঙ্গে কি ঘর করা যায়?

টেপে আমার কণ্ঠ বেজে উঠল,—ভাল রেজাল্ট করবে ব'লেই প্রাণপণে পড়শোনা করছে। তোমার সঙ্গে রঙ্গ-রস করবার সময় কোথায়?

বিরক্তির স্বরে বলল শতাব্দী,—শিল্পী, অনুভা, মিঠু প্রভৃতিরা যখন আসে তখন তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুটুর পুটুর করতে তো সময়ের অভাব হয় না!

শতাব্দীর কথায় না হেসে পারলাম না। সে নিজেও হাসতে লাগল আমার সঙ্গে।

নিবিষ্ট মনে শুনছিল কৌশিক। টেপ বন্ধ করতে মাথা নেড়ে, বলল,—এখন বুঝতে পারছি, স্কুল-কলেজের পাঠ পড়লেই হয় না। ব্যবহারিক জীবনের পাঠও পড়া লাগে। আমার উদাসীনতাই যে তাকে আমার প্রতি উদাসীন করে তুলেছে তা ঠিকই।

বুঝিয়ে বললাম কৌশিককে,—মানুষের অন্তরের ভাব পুষ্ট হয় অন্যের কাছ থেকে অনুরূপ ভাবের পোষণ পেলে। স্বামীর কাছ থেকে অভিব্যক্তির মাধ্যমে আদর সোহাগ ভালবাসার পোষণ যদি না পায়, তবে স্ত্রীর অন্তরের স্বামী সোহাগরূপী [স্বামীর জন্য সোহাগরূপী] ফল্গুধারা শুখিয়ে যায়। সে তখন স্বভাবতঃই শতাব্দীর মত হয়ে ওঠে।

ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল কৌশিক ,—এখন কি করব বলুন।

কবে, কোথায় কি ভাবে শুরু করতে হবে তা বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে বললাম,—এতদিন যা দাওনি, যার অভাবে শতাব্দী তোমাব ওপরে এমন বিরূপ হয়ে উঠেছে—তা দাওগে। তবে খুব সাবধানে ও সন্তর্পণে। অভিব্যক্তি দেখাতে যেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্ব যেন হারিয়ে না যায়। তোমার আচরণ যেন ছ্যাবলামীর পর্য্যায়ে না পড়ে।

পাশ্চাত্যের কোন কোন শহরের রাস্তাঘাটে; ট্রেনের কামরায়, বা বিমান বন্দরের লাউঞ্জে কোন কোন স্বামী-স্ত্রী বা বয়ফ্রেণ্ড-গার্লফ্রেণ্ড ভালবাসার অভিব্যক্তি দেখাতে যেয়ে প্রকাশ্যে যে আচরণ করে তা দেখে মনে হয় ওরা সুগন্ধী গোলাপকে অদূরে রেখে তার রূপ-রস-গন্ধকে উপভোগ করতে জানেনা, তারিফ করতেও পারে না। তাকে নাকের ডগায় চেপে ধরে চটকাতে চায়। এতে কি আর গোলাপের মাধুর্য্য উপভোগ করা যায়?

চোখের কিম্বা নাকের সাথে আয়না ধরলে যেমন মুখ দেখা যায় না, একটা যুক্তিসঙ্গত দূরত্ব চাইই। ঠিক তেমনই পরস্পরকে সাত্বিক ব্যঞ্জনায় উপভোগ

করতে হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা একান্ত অপরিহার্য্য, তা না হলে, অতিমাত্রায় চপলতা ও ছ্যাবলামি দাম্পত্য সম্পর্ককে শেষ পর্য্যন্ত কামনা প্রপীড়িত ন্যাক্কারজনক "গেমে" পরিণত করে তুলতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা বলতে বোঝায় পরস্পরের ব্যক্তিত্ব, ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণে রাখা।

পিতা যেমন তাঁর শিশুপুত্রের সংগে মাঝে মাঝে পুত্রের সমবয়সী বন্ধুর ন্যায় আচরণ করেন। হয়তো মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে নিজেই পরাজয় বরণ করেন—অথচ পিতা যে পুত্রের ইয়ারের পাত্র নন সে সচেতনতা পুত্র বা পিতা কেউই হারান না। ঠিক তেমনই বন্ধু বা সখার মত স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-তামাসা, রঙ্গ-রস, কৌতুক বা খেলাধূলা করলেও কেউই এমন পর্য্যায়ে নামবেন না যাতে একজন আর একজনকে 'আ-দেখলে, হ্যাংলা, বা কামাতুর ভাবতে পারে। উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা সম্মানজনক দূরত্ব যদি বজায় থাকে তাহলে দাম্পত্য প্রেমের মাধুয্য কোন দিনই ম্লান হবে না।

আর কখনও ম্লান হয় নি কৌশিক ও শতাব্দীর দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য্য। কৌশিক বুঝতে পেরেছিল, শুধু খাওয়া-পরা বা গহনা কিম্বা সন্তান দিলেই স্বামীর কর্তব্য শেষ হয় না। স্বামীর ভালবাসার উষ্ণতায় স্ত্রীর অন্তরে যখন অনুরাগউদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখনই দাম্পত্য-মাধুয্য প্রগাঢ় হয়ে ওঠে পারস্পরিক সহযোগিতায়।

শতাব্দীও সহযোগিতা করেছিল আমার সঙ্গে। তাকে যেমন বলেছিলাম তেমনই অভিনয় করেছিল কৌশিকের সঙ্গে। কৌশিক বুঝতেই পারেনি যে গান শেখার অছিলা, এবং প্রলয়ের সঙ্গে মেলা-মেশার ঘনিষ্ঠতা একটা ছল মাত্র যাতে, তার ভেতরের নিষ্ক্রিয় অথচ বিজ্ঞ অনুরাগ-উদ্দীপী-সংবেনশীলতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঈর্ষা (Jealousy) কৌশিকের অন্তরের অনুরাগেরর কুঁড়িকে বাস্তবে ফুটিয়ে তুলেছিল।

স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে অনুরাগের কুঁড়ি যখন প্রেমরূপ কুসুমে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তখন উভয়ে উভয়কে উপভোগকরে অন্তরের সব মাধুরীটুকু ঢেলে দিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক তাচ্ছিল্যের তাণ্ডব নর্তনে তিক্ত হয়ে ওঠে না কোন দিন।

তিক্ত হয়ে উঠেছিল অলোকেশের জীবন। তরুণ কেমিষ্ট অলোকেশ। স্ত্রী

স্ত্রীর বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বকে তাচ্ছিল্য করলে

মণীষা ও এক নবজাতক শিশুকে নিয়ে তার সংসার। মণীষা শিক্ষিতা ও সুন্দরী। চোখের চাহনীর সাথে তার মুখের কথা এত মিষ্টি যে তার বাবা মাত্র একজন পাত্রপক্ষকেই মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। অলোকেশের পিতা পাত্রী দেখতে এসে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন,—সব কিছু ছেড়ে কেবল তোমার কথাই শুনতে ইচ্ছা করে মা। ভারী মিষ্টি তোমার কণ্ঠটি।

কিন্তু একটা কথাও শোনে না অলোকেশ। অভিযোগ করে বলল মণীষা,—জেঠু! মেয়ে মানুষের কি কোন দাম নেই? ও (অলোকেশ) আমার একটা কথারও দাম দেয় না। আমি যেটা বলি সেটাই তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দেয়। এই নিয়ে যত অশান্তি। এই তো সেদিন—আপনি আসবার দুদিন আগে, তুমুল বেধে গেল দুজনে। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই তুচ্ছ। অথচ তার ফল, আজ চার দিন কথা বন্ধ। টের পান নি যে, ও আমার সঙ্গে কথা বলে না?

টের পেতাম না যদি অলোকেশ ক্লসিটে তার টেরিকটনের পাঞ্জাবীটা খুঁজে পেত।

ক্লসিট থেকে একরাশ জামাকাপড় মেঝের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে অলোকেশ। ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘরে ঢুকেছি আমি। আমাকে দেখে একটু লজ্জা পেল অলোকেশ। নিজেকে সমর্থন করে বলল,—দেখুন জেঠু! আমার জীবনে কোন অশান্তি নেই। যত অশান্তি আপনার বৌমাকে নিয়ে। যে কোন কারণে মনোমালিন্য হলেই আর কথা বলবে না আমার সঙ্গে। দিনের পর দিন কথা বন্ধ করে থাকবে। আমার কোন প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখবে না। সব কিছু তাচ্ছিল্য করবে। টেরিকটনের পাঞ্জাবীটা যে কোথায় কোন্ কোণে ফেলে রেখেছে তা কে বলবে?

জামাকাপড়গুলি একসাথে দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে দিল ক্লসিটে। চোখমুখের ভাব দেখে মনে হল, মণীষাকে হাতের কাছে পেলে একহাত দেখে নিতে দ্বিধা করত না অলোকেশ। নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে বলল,—ওর সব ভাল। কিন্তু বড় জেদী। আমি যা কিছু করতে যাব তাতেইত বাধা দেবে। স্বাধীন-ভাবে কিছুই করতে দেবে না। ওর রাগ, ওর কথা শুনি না ব'লে। সংসারের সব কাজ ওর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করি না কেন, এই হচ্ছে তার অভিযোগ। আপনিই বলুন, প্রতিপদক্ষেপে কি মেয়েমানুষের পরামর্শ মত চলা যায়?

যায় না বলেই তো ক্ষেপে আছে মণীষা। ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল,—

আপনি এখানে আসবেন, বিশেষ করে অমোদের বাসায় থাকবেন,—কি আনন্দ। ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছি, গোছগাছ করছি। ওরও খুব আনন্দ। বার বার বলছে,—জেঠু এসে আমাদের কাছে থাকবেন। কি মজা! বেশী ক'রে পাব জেঠুকে। হঠাৎ বেধে গেল গোল। আশী টাকা দিয়ে এক বেড কভার কিনে এনে হাজির। আপনি আসবেন। তাই নূতন বেড-কভার। আমি বললাম,—জেঠুর বিছানা তো ঢাকা আছেই। এছাড়াও বাক্সে একশ পাঁচটাকা দামের নূতন বেড-কভার আছে। তুমি বরং ওটাকে ফেরৎ দিয়ে ঐ আশী টাকায় এই টার্মের প্রিমিয়ামটা শোধ দিয়ে দাও। তা কিছুতেই দিলো না। আমি জানি এর পর যখন লাষ্ট ডেট্ চোখে পড়বে, আমার যা আছে তা কুড়িয়ে নিয়ে যাবে, না হয়, কারও কাছে হাত পাতবে। তাই আমি বেড-কভার রাখতে দেব না। সেও তা ফেরৎ দেবে না। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। ছুটে এসে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিল আমার গালে।—কেঁদে ফেল্ল মণীষা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল,—যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর!

শ্বশুর, শাশুড়ি থাকেন দেশের বাড়ীতে। চাল, ডাল, চিড়ে, মুড়ি, কিছুই কিনতে হয় না। জমিতে হয়। শ্বশুর পেনসন্ পান মোটা টাকা। এ-ছাড়া ছোট দেবর পাঠায় প্রত্যেক মাসে। খানেওয়ালা তো মাত্র তিন জন—কাজের লোকটাকে নিয়ে। কত বলি বাবা-মাকে দেওয়া ভাল। মাসে একশ টাকা পাঠাও—প্রণামী বাবদ। আপদ বিপদ হলে, কি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে, বেশী পাঠাবে বৈকী! তা সে শুনবে না। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাববে না। আমি বেশী বলতে গেলে আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলবে। বলবে—তোমার ছোট মন। আমার মা বাবাকে তুমি দেখতে পার না। এসব কথা শুনলে কার না রাগ হয় বলুন! মনে হয় এ সংসার ছেড়ে চলে যাই। এ সংসারে থেকে লাভ কী?—অশ্রুসজল নয়নে চেয়ে রইল আমার দিকে।

সত্যই লাভ নেই। অলোকেশ বা মণীষা—কারও লাভ নেই। অলোকেশ বুঝতে চায় না যে, সংসারের অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে স্ত্রীর পরামর্শ নেয়া ভাল। তার বুদ্ধি ও পরামর্শের গুরুত্ব দেয়া উভয়ের পক্ষে মঙ্গলের। স্ত্রীর পরামর্শ থেকে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে যাতে স্বামী যা করতে চাইছে তা নিষ্পাদনেয় পথ আরও সুগম হতে পারে। এতে স্ত্রীও বুঝতে পারে যে তার স্বামী তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের দাম দেন। সংসারে তারও একটা

মূল্য আছে। তার অহং (ego) নরম ও অনুগত হয়ে ওঠে। ফলে স্ত্রী স্বামীতে আরও অনুরাগ নিবদ্ধ হয়ে ওঠে।

কিন্তু অলোকেশ তা পারে না। তাই যখন তখন অনুরাগের লেজ খসে যায় মণীষার। রাগের আগুনে দগ্ধ হতে থাকে দুজনে—কমপক্ষে পক্ষকাল পর্য্যন্ত।

রাগ যদি বা কমে, রাগ মানে না মণীষার মন। তার শুধু মনে হয়,—ওর ভালোর জন্যই তো বলি। তবুও মানতে চায় না আমার কথা।

মানবে কী! স্বামীর কাছে যেমন ক'রে বললে স্ত্রীর মানায়, তেমন ক'রে একদিনও বলেনি মণীষা। বলেছে, কিন্তু উপদেশ দিয়ে। উপদেষ্টার ভূমিকায় স্বামীকে ভাল কথা বললেও, দাম্পত্যজীবনে কাল মেঘের ছায়া যে নেমে আসতে পারে, তা মণীষা নিজেই গল্প করল আমার কাছে। মিসেস ত্রিপাঠীর অশান্তির কথা বলতে গিয়ে বলল,—ব্যাটাছেলের মুখের ওপরে মুখ নেড়ে কথা বলা কি ভাল?

অথচ নিজে কিছুতেই বিনীতভাবে কথা বলতে পারে না, স্বামী অলোকেশের সাথে।

অলোকেশের নিজস্ব টেবিলের ওপরে ঝুলছে কাঁচের কভারে বাঁধান মণীষার হাতের শেলাই। তাতে লেখা আছে:

"করণেষু দাসী, কার্যেষু মন্ত্রী
স্নেহেষু মাতা, ক্ষময়া ধরিত্রী
রঙ্গে সখি, শয়নেষু রামা
সা সীতা পিয়া মে লক্ষণ।"

পত্নী সীতার স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলেছেন যে সীতার একটা স্বভাব মন্ত্রীর স্বভাবের মত। রাজা রাজ্য পরিচালনায় কোন ভুল করেছেন দেখলে, বা সে বিষয়ে কোন পরামর্শ চাইলে মন্ত্রী তা ধরিয়ে দেন বা পরামর্শ দেন। তবে তা দেন খুবই বিনয়ের সঙ্গে, হয়তো বলেন: আমি আর কি বলব? আপনি বিচক্ষণ সম্রাট। তবে আমার মনে হয়, এই রকম করলে ভাল হতে পারে। কখনও নিজের মতামতকে রাজার ওপরে চাপিয়ে দেন না। রাজা তাঁর পরামর্শ মেনে না নিলেও মন্ত্রী মনে কোন দুঃখ বোধ করেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষ ঠেকে শেখে।

মণীষাও ঠেকে শিখল। এতদিন তো নিজের ধারণা মত চলছিল। আমা

কথা দিল,—জেঠু! আপনি আমায় যেমন যেমন বলে গেলেন, আমি ঠিক তেমন ভাবে চলব।

আমি চলে এলাম সেখান থেকে। দীর্ঘ এক বছর পরে ফিরছি কাটনী থেকে। সাতনা ষ্টেশনে দেখা অলোকেশ ও মণীষার সঙ্গে। নূতন কর্মস্থল অলোকেশের। মিসেস ত্রিপাঠীর চিঠিতেই জানতে পারে যে আমরা আজ এই ষ্টেশন হয়ে আশ্রমে ফিরব। তাই ছুটে এসেছে দেখা করতে।

আমাদেরকে প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে বসিয়ে রেখে বাজারে গেল আমাদের জন্য খাবার কিনতে।

ট্রেন আসবারও দেরি আছে। মণীষারও যেন দেরি সইছে না। আঁকু-পাঁকু করছে তার মনের কথা বলবে ব'লে। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার ছাপ। চেয়ার খানা আমার দিকে টেনে নিয়ে বলল,—জেঠু! খুব সুখে আছি আমরা।

মৃদু হেসে বললাম,—বাক্ বন্ধ থাকে না তো?

সলজ্জ মণীষা আমার হাত দুখানা চেপে ধরল। বলল,—তোমার পাগলী মেয়েকে আর লজ্জা দিও না।

আচ্ছা, আচ্ছা। আর বলব না। তুমি বরং তোমার কথা বল। সাগ্রহে চেয়ে রইলাম মণীষার মুখের দিকে।

মণীষা বলতে লাগল,—এখন বুঝতে পারছি, প্রতিপদে স্বামীর পিছনে অভিভাবকের মত ঠুকতে থাকলে স্বামীর মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যদি বুঝি, ও [অলোকেশ] যা করতে যাচ্ছে তা ভুল, করলে সংসারের ক্ষতি হবে, তাহলেও সরাসরি বাধা দেই না। বিশেষ মুহূর্ত্তে, তার মন মেজাজ বুঝে, বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তিতে—আপনি যেমন বলেছিলেন—বিনয়ের সঙ্গে বলি,—আমি তো মেয়েমানুষ। কি বা আর বুঝি? এটা না করে ওটা করলে, বেশী ভাল হতে পারে ব'লে মনে হয়। প্রথম প্রথম আমার কথা শোনে নি। পরে যখন বুঝতে পারল যে, আমি যেটা বলেছিলাম সেটা করলেই বেশী ভাল হতো—তখন আর আমার কথা ফেলত না। এখন যে কোন কাজ করার আগে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে। ও কিভাবে কি করতে চায় তা আগে জেনে নেই। ভাল মনে হলে তো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি, তার তারিফ ক'রে বলি। ভাল না মনে হলেও সরাসরি 'না' বলি না, বা বাধা দেই না। আমার মতটা টুক ক'রে ব'লে বলি,—তোমার যেটা ভাল মনে হয় তাই করো।

তাই করে অলোকেশ। মণীষার বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বকে আর তাচ্ছিল্য করে না। যা কিছু করে মিলে মিশে করে।

এক বোঝা খাবার নিয়ে ফিরে এল অলোকেশ। আমাদের সামনে রেখে বলল,—রাস্তায় খাবেন জেঠু! আপনার মেয়ে চেয়েছিল, খাবার তৈরী করে আনতে। আমিই বললাম,—যদি এ ট্রেনে জেঠু না আসেন? বোম্বে মেলেও তো যেতে পারেন। তাহলে তো খাবারগুলি নষ্ট হবে। বরং এই ভাল হলো, বলুন?

হেসে বললাম, তাহলে মণীষা আর তোমার কাজে বাধা দেয় না।

হাসতে লাগল অলোকেশ। সে খুশীর হাসি। ছোট্ট ক'রে বলল,—আর কথা কাটাকাটি করে না।

এরা দুজনে কথা কাটাকাটি করে না বটে, কিন্তু সেণ্টিমেণ্ট কাটাকাটিতে ক্ষত বিক্ষত মিঃ রায় ও মিসেস রায়ের সংসার জীবন।

স্বামীর সেণ্টি-মেণ্টে আ'হত হলে

মিঃ গৌরীশঙ্কর রায়। কলকাতার এক সরকারী সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত। স্ত্রী সুতপা ও দুটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাঁর ছোট সংসার। পয়সা কড়ি যা পান, তাতে এরকম তিনটি সংসার চলে যায় চোখ বুঁজে। আহারাদির পরিপাটি দেখলে লোকে ভাববে রায়বাড়ী সবদিনই নিমন্ত্রণ বাড়ী। কিন্তু রাত্রে চোখ বোঁজেন না একজনও। ঘুম আসে না কারও চোখে।

দুঃখ ক'রে বললেন মিঃ গৌরীশঙ্কর রায়,—অফিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে দিনান্তে যখন বাড়ী ফিরি, তখন প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। মনে হয় কোথাও চলে যাই—যেদিকে দুচোখ যায়। কিন্তু যাব কী? চোখ থাকলে তো যাব? রাত্রে খেতে বসতেই গিন্নী খেঁকিয়ে উঠলেন,—চোখের মাথা কি একেবারেই খেয়েছ? কিছুই দেখতে পাওনা? ঢেঁড়োসগুলো বুড়ো; করলাগুলো পোকার ডিপো।—কানে এল শেষ কথাটা—বুড়ো হা-ব-রা।

মানুষ পরিশ্রমান্তে বাড়ী আসে বিশ্রামের আশায়। আমার পরিশ্রম আরও বেড়ে যায়। জলখাবারটাও বেশীর ভাগ দিন জোগাড় করে নিতে হয় নিজেকে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—কেন? আপনার স্ত্রী কি কাজে ব্যস্ত থাকেন?

মিঃ রায় বললেন,—কাজে ব্যস্ত থাকলে তো মনকে প্রবোধ দিতে

পারতাম। কিন্তু বাড়ীতে পা দেয়ামাত্র এমন সব চোখা চোখা বান ছাড়েন যে ভয়ে বোবা হয়ে থাকি। বোবার তো শত্রু নেই!

এতখানি বিরূপ মনোভাবের কারণ কি? মিসেস রায় তো বেশ স্মার্ট এবং সুইট্!—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম মিঃ রায়ের মুখের দিকে। বড় মায়া হল মিঃ রায়ের মত জাঁদরেল অফিসারের চোখে মুখে কাহিল চেহারা দেখে।

একটু নীরব থেকে মিঃ রায় বললেন,—বাইরে সবার সঙ্গে সুইট। কিন্তু আমার কিছুই যেন ওনার পছন্দ হয় না। কত আহ্লাদ করে পূজোয় শাড়ি কিনে এনেছি। কোনদিন তা খুশী মনে গ্রহণ করেনি। আমার পছন্দ সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য করেছে যে শেষ পর্য্যন্ত কাপড় দোকানে ফেরৎ দিয়ে নিজের মান বাঁচাই। কিন্তু মন বড় বিষিয়ে উঠেছে। সুতপাকে ঘিরে অন্তরে যে রোমাণ্টিক থ্রিল ছিল তা সব শুখিয়ে গেছে। ওকে আর বুকের মানুষ বলে ভাবতে পারি না। যখন যা হুকুম করে টাকা ফেলে দিয়ে তা তামিল করা ছাড়া আর কিছু করনীয় নেই আমার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও প্রীতির বিনিময় [exchange of love and romance] একেবারে বন্ধ। এমন ড্রাই লাইফ নিয়ে কি বাঁচা যায় বলুন?

বলব যে কি তাইতো ভাবছি। মিঃ রায় নিজেও জানেন যে গাছ মাটি থেকে রস টানে তার শিকড় দিয়ে। শিকড় কেটে গেলে রস টানতে না পারলে গাছ তো নীরস হবেই। তেমনই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বুক থেকে ভালবাসার রসটানে, একের প্রতি অপরের সেন্টিমেণ্ট দিয়ে। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীর ব্যবহারে, স্ত্রী বা স্বামীর সেন্টিমেণ্ট যদি কেটে যায়, তাহলে পরস্পরের বুক থেকে ভালবাসার রস টেনে পুষ্ট হতে পারে না। তাই পরিণত বয়সে শুকনো বোঝা হয়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবন।

কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? সুতপা দেবীর স্বভাব, না মিঃ রায়ের কোন ব্যবহার?

ডিক্টাফোনের সুইচ্‌টি অন্ করে দিয়ে বললাম,—বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছরে আপনাদের দুজনের মধ্যে যা যা ঘটেছে তার বিশেষ বিশেষগুলি যদি বলেন তাহলে রোগের কারণ নির্ণয় করা সহজ হতে পারে। তবে লজ্জায় বা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু গোপন রাখবেন না।

মিঃ রয়ের চোখ-মুখ দেখে মনে হল, সব কথা খুলে বলবার জন্যই তিনি

এসেছেন। বললাম—আপনি বলতে থাকুন। ততক্ষণে আমি অন্য একটা কাজ সেরে আসি।

ফিরে এসে দেখি মিঃ রায়ের বলা শেষ হয়েছে। আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। বললাম,—আজ আর আপনাকে কিছু বলব না। সময় মত আপনাকে সংবাদ পাঠাব।

সংবাদ পাঠালাম যথাসময়ে। কিন্তু মিঃ রায় তাঁর স্ত্রীকে আমার কাছে পাঠাতে পারলেন না কোন দিনই। তাই মিঃ রায়ের মামলার সুষ্ঠু রায় দিতে পারলাম না। কারণ যাঁর ব্যবহারে মিঃ রায়ের সেণ্টিমেণ্টের সূক্ষ্ম তারগুলি কেটে গেছে, সেই সুতপা দেবীই পারেন পুরশ্চরনের মাধ্যমে ভুলগুলি সংশোধন ক'রে নিয়ে মিঃ রায়ের শুখনো হৃদয়কে রসে ভরিয়ে তুলতে। মিঃ রায়ও পারতেন আত্মরক্ষা করতে, যদি সুতপা দেবীর ভেতরে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার গোড়াতেই প্রতিষেধক প্রয়োগ করতেন।

রোগের লক্ষণ ধরা গেল ডিক্টাফোনের জঠর থেকে যে বিবৃতি বেরিয়ে এল তা বিশ্লেষণ ক'রে। স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো :

সুতপা দেবী খুবই উচ্চাভিলাষী মেয়ে। স্বামী কেমন হবে, বিবাহোত্তর জীবন কেমনভাবে রচনা করবেন তার একটা পরিকল্পনা কল্পনাতেও এঁকে রেখেছিলেন। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে তার পিতা যে পাত্রে পাত্রস্থ করলেন তিনি তার মনের মত হলেন না।

মিঃ রায় তখন মার্চেণ্ট অফিসের একজন এল. ডি. সি. মাত্র। মাসান্তে যা বেতন পান তাতে মাসের শেষ সপ্তাহকে বেত্রাঘাতে তাড়াতে পারলে যেন ভাল হয়। মাস যেন আর শেষ হয় না।

সুতপা দেবী স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকবার পাত্রী নন। তাঁর আগ্রহ বিলাস-ব্যসন ও বাহুল্যের দিকে। মিঃ রায় ভালবাসেন 'প্লেন লিভিং, হাই থিঙ্কিং'। সাধারণভাবে সুস্থ থাকাই তাঁর কাছে যথেষ্ট। সুতপা দেবী চান, সমাজের মাথা যাঁরা তাঁদের মাথায় টোকা দিয়ে দশের একজন হতে। কিন্তু নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা ঘৃণার চোখে দেখেন মিঃ রায়।

রুচি ও মেজাজের [Taste and Temperament] বৈশাদৃশ্য, দুজনকে দুজনের অন্তর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

বিয়ের অষ্টমঙ্গলার গাঁটছড়া খুলতে না খুলতেই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত গ্রহণ করলেন সুতপা দেবী। বায়না ধরলেন স্বামীর কাছে তোমাকে বি. এ. পাশ

করতেই হবে। গ্র্যাজুয়েট না হলে যখন তোমার প্রমোশনের সুযোগ নেই তখন কেন পরীক্ষা দেবে না? সারাজীবন এল. ডি. সি. থেকে লাভ কী? তুমি পরীক্ষা দাও; আমি বলছি, মা মঙ্গল চণ্ডীর দয়ায় তুমি ঠিক পাশ করবে।

দশ বছর আগে কলেজ ছেড়েছেন মিঃ রায়। এতদিন পরে কেঁচে গণ্ডূষ করার ইচ্ছা নেই তাঁর। কিন্তু সুতপা দেবী নাছোড়বান্দা। প্রেরণা দিতে থাকেন মিঃ রায়কে। আদর, সোহাগ ও সহযোগিতা দিতেও কার্পণ্য করেন নি। তবে মাঝে মাঝে সেন্টিমেণ্টে আঘাত দিয়ে কোনঠাসা করতেও ছাড়েন নি তিনি। স্বামীকে প্রায়ই বলতেন,—হাই অ্যাম্বিশন যার নেই সে আবার পুরুষ মানুষ নাকি?

পৌরুষে আঘাত লাগে গৌরীশঙ্করবাবুর। দিনরাত পরিশ্রম ক'রে বি. এ. পাশ করেন ডিষ্টিঙ্কশন নিয়ে। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে? আবার তাগিদ এল সুতপা দেবীর কাছ থেকে। এবারে ইনকাম-ট্যাক্স-ল নিয়ে পড়তে হবে। প্রেরণা দিতে যেয়ে অন্তরে পরিশ্রান্ত করে তোলেন স্বামীকে। সুতপা দেবীর কথাবার্ত্তা চালচলনে প্রকাশ হতে থাকে তাঁর বাপের বাড়ীর শিক্ষা-সংস্কৃতির অহংকার আর শ্বশুরবাড়ীর পরিবার পরিজনের প্রতি তাচ্ছিল্য।

'ল' পাশ করলেন মিঃ রায়। তবুও লিগ্যাল অ্যাডভাইসারের পদটি তাঁর ভাগ্যে জুটল না। সুতপা দেবীর একই কথা: ধরাধরি কর। যাকে ধরলে কাজ হয় তার কাছে যাও—। বার বার জিদ ধরেন সুতপা দেবী।

গৌরীশঙ্করবাবু নারাজ। না খেয়ে থাকবেন তাও ভাল, তবুও কারও অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য তোষামোদ করতে পারবেন না তিনি। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন সুতপা দেবীকে: মরে গেলেও ওকাজ করতে পারব না। আমার আভিজাত্য ও আত্মসম্মানে বাধে।

খোঁচা দিয়ে বললেন মিসেস রায়,—পয়সা যার নেই তার আবার আভিজাত্য কিসের। অমন মিথ্যামানের মূলে ছাই!

মনের [গাছ] মূলে ছাই পড়লে মান যে আরও বেড়ে ওঠে তা জানা ছিল না সুতপা দেবীর। দিনে দিনে অভিমান বেড়ে উঠল গৌরীশঙ্কর বাবুর। ফলে সুতপা দেবীর প্রতি সূক্ষ্ম সেন্টিমেণ্টগুলি গেল শুখিয়ে। মনের দিক থেকে মিঃ রায়ের অবস্থা হল: "সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ যোজন ফাঁক।"

সুতপা দেবীও ক্ষুব্ধ হতে থাকেন স্বামীর কাছে যা প্রত্যাশা করেন তা না পেয়ে। মিঃ রায়ের শুখনো কর্ত্তব্য ভীষণভাবে পীড়া দেয় সুতপা দেবীকে। সুযোগ পেলেই অভিযোগ করে বলেন সমবয়সীদের কাছে—যা কিছু করেছি ওরই ভালর জন্য। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক থেকে আজ অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! আর আজ আমাকেই দেখতে পারে না।

দেখবে যা দিয়ে সেই মনই তো বিষিয়ে গেছে মিঃ রায়ের। চোখের দেখায় তো আর দেখা হয় না। অন্য পাঁচটা মেয়ের মত সুতপা দেবীও ভুলে গেলেন যে স্বামীর যা আছে তাতে তৃপ্ত থেকে স্বামীকে প্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে আবোব পথে তুলে ধরাতেই স্ত্রীর সুখ। তার অহং-এ আঘাত দিয়ে, সেন্টিমেণ্টগুলিকে ভোঁতা ক রে ফেলে, ইন্‌ফিওরিটি কম্‌প্লেক্‌সে সুড়সুড়ি লাগিয়ে স্বামীকে বড করার মাধ্যমে গাড়ী, বাড়ী, ফ্যান্, ফোন্, ফ্রিজ সবই হয়তো জুটতে পারে। কিন্তু ক্ষুব্ধ স্বামীর 'ফ্রোজন' [Frozen = নিরুত্তাপ] বুকে মুখ রেখে শুয়ে, সুখ পাওয়া যায় না কোনদিনই। সব থেকেও ফাঁকা মনে হয় সংসার।

স্ত্রীর সেণ্টিমেণ্ট আহত করলে

তাই ভরা সংসারও ফাঁকা মনে হয় বিন্দুবাসিনীর। স্বামী, পুত্র ও দুই মেয়ে নিয়ে বিন্দুবাসিনীর সংসার। স্বামী শিবপ্রসাদ একজন তরুণ সমাজসেবক। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়,—গোঁয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, গোলা ভরা ধান—শিবপ্রসাদের সংসারের অবস্থা। কিন্তু বিন্দুবাসিনীর অন্তরটা ভরে আছে হতাশা ও অশান্তিতে।

বিন্দুবাসিনীর মনে যে সুখ নেই তা অতিথি হিসাবে এ বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি বলেই তো আজ তিন দিন ধরে ভাবছি: কি এমন কারণ? শিবপ্রসাদ সুন্দর, সুদর্শন যুবক। স্বভাব চরিত্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সবার শ্রদ্ধার পাত্র। স্ত্রীকে যে সে ভালবাসে না তাও তো দেখে মনে হয় না। ছেলেমেয়ে একটিও না হলে, না হয় অন্য কিছু সন্দেহ করতাম—যার জন্য বিন্দুবাসিনী ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সংসার করে। তবে আর কি কারণ হতে পারে?

কারণ বুঝতে পারলাম চতুর্থ দিন দুপুরে। সবে মাত্র উঠেছি দুপুরের বিশ্রাম সেরে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল বিন্দুবাসিনী। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল,—এর মধ্যেই আপনার ঘুম হয়ে গেল?

—হ্যাঁ মা। তোমার খাওয়া হয়েছে?—প্রশ্ন করলাম আগ্রহভরে।

ছোট্ট টুলখানা চৌকির কোনে টেনে নিয়ে বসল বিন্দুবাসিনী। বলল,—আপনার ভাইরা তো এগারটার মধ্যে খেয়ে বেরিয়ে গেছে। তাই রান্নাঘরের পাট সকাল সকাল মিটে গেছে।

বুঝলাম, শিবপ্রসাদ তার সহকর্মীদের নিয়ে সুদর্শনপুর গ্রামে গেছে—আজ সন্ধ্যায় সেখানে যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হবে তারই ব্যবস্থাপনার তদারকী করতে।

টুলখানা খাটের আরও কাছে টেনে নিয়ে বসল বিন্দুবাসিনী। বলল,—দাদা! এই অবসরে আমার দুটো দুঃখের কথা বলতে চাই। এখন না বললে, আর বলার সুযোগ পাব না। কালই তো চলে যাবেন এখান থেকে।

কি কথা মা!—মাথার কাছের বালিশের পাহাড়টাকে সরিয়ে পেছনে রাখলাম। বললাম,—বল।

বাইরে থেকে কেউ আসছে কি না একবার দেখে নিল উঁকি মেরে। বলল,—আজ সাত বছর বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে আপনার ভাই একদিনের জন্যও আমাকে বাপের বাড়ী যেতে দিলেন না। নিজেতো নিয়ে যাবেনই না, কারও সঙ্গেও যেতে দেবেন না। সব চাইতে খারাপ লাগে উনি যখন আমার বাবার সম্বন্ধে কটূক্তি করেন। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু বাবা-মার অপমান সহ্য করতে পারি না। কত মিনতি ক'রে বলেছি,—যা বলার আমাকে বল। আমার মা বাবাকে কিছু বলো না। তা উনি শুনবেন না। কি বলব, ঘৃণায় মন ভরে ওঠে। চেষ্টা করি, ওনাকে শ্রদ্ধা করার, ভালবাসার। কিন্তু পারি না। ভেতর থেকে কেমন যেন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে।—চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল দুই গাল বেয়ে।

বিস্মিত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার বাবা-মার ওপরে শিবপ্রসাদ বিরূপ কেন?

চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বলল বিন্দুবাসিনী,—বাবা নাকি বলেছিলেন পনের ভরি সোনা দেবেন। কিন্তু জোগাড় ক'রে উঠতে পারেন নি। এগার ভরি দিয়েছিলেন। বিয়ের সময় বাবা আমার শ্বশুর মশায়ের হাত ধ'রে কাতরভাবে বলেছিলেন যে, পরে ধীরেসুস্থে দিয়ে দেবেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে বাবা ঐ চার ভরি সোনা আর দিতে পারেন নি। তাই রাগ। বাবাকে ঠগবাজ, ধাপ্পাবাজ, যা মুখে আসে তাই বলে। এই নিয়ে আমার সঙ্গে তুমুল বেধে যায়। আপনি যদি আপনার ভাইকে একটু বুঝিয়ে দিয়ে যান।—কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—তুমি কেঁদো না মা। অযাচিত কিছু বলতে গেলে শিবপ্রসাদ ভাববে তুমি আমার কাছে নালিশ করেছ। তাতে ফল ভাল হবে না। তুমি বরং এক কাজ ক'রো। জুলাই মাসে কর্মীসম্মেলনে যোগ দিতে শিবপ্রসাদ নিশ্চয়ই আশ্রমে যাবে। তখন আমাকে চিঠি লিখে দিও—'আপনার ভাই গেল।' আর কিছু লিখতে হবে না। সেখানে সুযোগ করে নিয়ে যা বলার আমি বলব।

সুযোগ অবশ্য মিলে গেল তিনদিনের মাথায়। হরিহরপুর গ্রাম। মুখিয়া বংশীধর মোহন্তের বাড়ীতে ধর্মসভা। গ্রামের বিশিষ্ট মানুষেরা উপস্থিত। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী শুরু হল প্রশ্নোত্তর। শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝখান থেকে এক-একজন হাত তুলছেন ও আমার ইঙ্গিত পেলে প্রশ্ন করছেন।

হঠাৎ এক এলোকেশী, গেরুয়া-বসনা, ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার ক'রে বললেন,—বাবাঠাকুর! আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?

সবিনয়ে বললাম,—হ্যাঁ মা! তবে আমি যদি জানি তবে উত্তর দেব।

ভৈরবী আর একবার তাঁর করযুগল একত্র ক'রে কপালে ঠেকালেন। বোধহয় নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করলেন। ধীরে ধীরে বললেন,—আজ তিনমাস এই গ্রামে আছি। ভিক্ষার জন্য অনেক বাড়ীতে যেতে হয়। বেশীরভাগ মায়েরা আমার কাছে দুঃখ করেছেন যে দাম্পত্যজীবনে তাঁরা বড় দুঃখী। অনেকে আমার কাছে জড়িবুটী বা তাবিজ-কবচও চেয়েছেন যাতে তারা স্বামীর মন জয় করতে পারেন। তাবিজ-কবচে স্বামীর মন বশ করা যায়, এ আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে আপনি যদি কিছু বলেন তবে বহু মানুষের উপকার হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী মায়ের সমর্থনে গুঞ্জন উঠল শ্রোতৃমণ্ডলের মাঝখান থেকে! খুব ভাল বিষয়বস্তু।

প্রায় একঘণ্টা ধ'রে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির প্রধান প্রধান কারণগুলি ও তা নিরাকরণের উপায় বিশ্লেষণ করলাম। প্রসঙ্গক্রমে বললাম,—স্ত্রীর ব্যবহারে স্বামীর সেন্টিমেণ্ট আহত হলে যেমন দাম্পত্য জীবনে অশান্তি হয়, ঠিক তেমনই স্বামীর আচরণে স্ত্রীর সেন্টিমেণ্ট আহত হলে শত প্রাচুর্য্যের মধ্যেও স্ত্রী সুখী হতে পারে না। ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ বললাম,—অনেক সময় কোন কোন স্বামী রাগের বশে নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য ক'রে বসেন। "তুমি একেবারেই গেঁও ভূত";

"তুমি যে-এমন ক্যাবলা তা জানতাম না"; "এমন অপদার্থ মানুষ নিয়ে কি সংসার করা যায়?" "সামান্য দায়িত্বটুকু দিয়েও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই!" —ইত্যাদি ধরণের মন্তব্য অনেক স্ত্রীর ভাগ্যেই জুটে থাকে। কথাগুলি খুবই মামুলী। হয়তো স্বামীরা যা বলেন তা বোঝাতে চান না। এটা তাদের ক্ষুব্ধ অহং-এর অসুস্থতার একটা অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু ছোট্ট ঘুণপোকা যেমন শক্ত কাঠের কাঠামোকে জীর্ণ করে তোলে, ঐ ছোট ছোট মন্তব্যগুলিও স্ত্রীর সেন্টিমেণ্টকে, বিশেষ ক'রে স্বামীর প্রতি সূক্ষ্ম সেন্টিমেণ্টকে জীর্ণ করে তোলে। যে কোন মুহূর্তে তা ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

অনেক স্বামী কারণে অকারণে স্ত্রীর বাবা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার উক্তি বা কটূক্তি করেন। বিবাহের যৌতুক হিসাবে হয়তো আঠার ভরি সোনা দেবার কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রদানের সময় দিয়েছেন মাত্র বার ভরি। পরে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন জামাই-এর বাবার হাত ধ'রে। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে ঐ সোনা আর দিয়ে উঠতে পারলেন না। জামাই বাবাজী তো রেগে অগ্নিশর্মা। শ্বশুরের অপরাধের সাজা পড়ল স্ত্রীর ওপরে। স্ত্রীকে বাপের বাড়ী যেতে দেয় না। নিজেও যায় না। উপরন্তু শ্বশুর সম্বন্ধে ক্ষণে অক্ষণে কটূ মন্তব্য করতে থাকে। এইসব স্বামীকুল বিলকুল ভুলে যান যে, কোন মেয়েই তার বাবা-মা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার উক্তি বা মনোভাব সহ্য করতে পারে না। কারণ, যে বিশেষ মা-বাবা থেকে ঐ মেয়ে জন্মায় তাঁদের সঙ্গে তার সূক্ষ্ম ভাবানুভবতার তারগুলি [Finer tendrils of sentiment] ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। স্বামীর মুখে অশ্রদ্ধা ও বিরূপ মন্তব্যে ঐগুলিতে টান পড়ে। তাই মেয়েরা মনে মনে স্বামীর ওপরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কখনও কখনও ঐ তারগুলি কেটে যায়। ফলে নিজের স্বামীকেও শ্রদ্ধা করতে পারে না। তার অবস্থা হয় আঁকশী ছেঁড়া লাউলতার মত।

লাউ গাছ তার আঁকশী দিয়ে ডালপালাকে জড়িয়ে ধরে ও আগের দিকে এগিয়ে চলে। ঐ আঁকশীগুলি কেটে দিলে লাউলতা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। লাউগাছের লতা মুচড়ে যায় বা থেঁতলে যায়। ঐ চোট খাওয়া লতায় নিখুঁত নিটোল লাউ কখনও ফলে না। কোন না কোন বিকৃতি থাকবেই। ঠিক তেমনই স্ত্রীর সেন্টিমেণ্টরূপ আঁকশী কেটে গেলে, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাহারা স্ত্রীর গর্ভে কখনও সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘায়ু এবং শ্রদ্ধালু সন্তান জন্মাতে পারে না। "স্বামীর প্রতি টান যেমনই, ছেলেও জীবন পায় তেমনই।" এই টানই যদি

কেটে যায় তবে ছেলেমেয়ে কেমনতর জীবন নিয়ে জন্মাবে তা সহজেই অনুমেয়। তাই স্ত্রীর বাবা-মা অন্যায় ব্যবহার করলেও, সুখী দাম্পত্যজীবন ও সুস্থ বংশধরের স্বার্থে তা সহ্য করাই শ্রেয়। তাই শত রাগ হলেও স্ত্রীর সম্মুখে তাব বাবা-মা সম্বন্ধে কটূক্তি করা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা দু'দিক থেকেই লোকসানের। তা করলে প্রথমতঃ প্রতিশ্রুত সোনা না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ শ্রদ্ধাহারা অপগণ্ড সন্তান নিজেরই বংশের কলঙ্ক রূপে দেখা দেয়।

কথাগুলি বলছি আর বার বার আড় চোখে দেখছি শিবপ্রসাদকে। তার ভেতরে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে।

তাই তো শেষ রাত্রেই আমার ঘরে উঠে এসেছে শিবপ্রসাদ। কাতর চোখে চেয়ে বলল,—দাদা! আমি তো মস্ত ভুল করেছি এতদিন। আপনার বৌমাকে আজ সাতবছব তার বাপের বাড়ী যেতে দেই না। আনুপূর্বিক ঘটনার বর্ণনা করে বলল,—বিন্দুবাসিনী মেয়ে হিসাবে খুবই ভাল ছিল। খুবই টান ছিল আমার ওপরে। আমার ভুলেই যে, সে আজ আমার প্রতি উদাসীন ও খিটখিটে মেজাজের হয়েছে তা বুঝতে পারছি। এর থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি দাদা?

উপায় হাতের কাছেই জোগাড় করে রেখেছিলাম। বালিশের তলা থেকে ডঃ প্যাটেলের লেখা "ভুলের স্বীকৃতি" বইখানা বের করে শিবপ্রসাদের হাতে দিলাম। বললাম,—বইখানা পড়ে দেখ। বিশেষ ক'রে ৩৭ পৃষ্ঠার স্বীকৃতিটা আগে প'ড়ো।

পাতা উল্টিয়ে পড়া শুরু করে দিল ৩৭ পৃষ্ঠায় লেখা ঘটনা। বেশ জোরে পড়তে লাগল শিবপ্রসাদ: শেষ পর্য্যন্ত নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। যে ড্যানী খুশীর ডানায় ভর ক'রে সংসারের সব কাজ করত সে কেন অমন বিষাদ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল; আমাকে খুশী করার প্রচেষ্টায় যে সর্বদা সক্রিয় থাকত সে কেন খিটখিটে মেজাজের হ'ল তা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ড্যানীর সঙ্গে "ডিলিংসে"র [ব্যবহারের] 'পোজ' [রকম] দিলাম ঘুরিয়ে। আর তার সেন্টিমেণ্টে আঘাত দেই না। ভুলেও তার বাবা-মার নিন্দা করি না। বরং বিয়ের রাত্রে তার বাবা বরযাত্রীদের আপ্যায়ণের যে সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন তার ভূয়সী প্রশংসা শুরু করলাম। বেশ কিছুদিন পর ড্যানীকে একটা গল্প বানিয়ে বললাম: আমাদের অফিসে তোমাদের গ্রাম থেকে এক ভদ্রলোক

এসেছিলেন। তোমার বাবার নাম উল্লেখ করতেই ভদ্রলোক আমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বললেন,—ওহো! আপনি বিপ্রদাসবাবুর জামাই! পরিচয় পেয়ে ভালই হল। বিপ্রদাসবাবুর মতো অমন সজ্জন ও মিষ্টিলোক হয় না মশাই। আমাদের গ্রামে বোধহয় এমন লোক কমই আছে যে বিপ্রদাসবাবুর কাছে উপকার পায় নি। তবে ভদ্রলোক বেশী সরল ব'লেই ভাইয়েরা জমিজমা প্রায় সবই ফাঁকি দিয়ে নিয়ে তাঁকে বেকুব বানিয়ে দিয়েছে। —তোমার বাবাকে খুব ভাল ভাবেই চেনেন ভদ্রলোক।

অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম ড্যানীর চোখে-মুখে। মাঝে মাঝে ঐ কল্পনার ভদ্রলোকের উল্লেখ ক'রে শ্বশুরমশাই-এর এক-একটা গুণ তুলে ধরতাম প্রসঙ্গক্রমে। একদিন অভিমান আর অনুযোগের সুর মিশিয়ে ড্যানী বলল,— কিন্তু বাবা যে তোমায় ফাঁকি দিলেন? সেই ছ'ভরি সোনা তো দিলেন না?

ড্যানীর মুখখানা আমাব বুকের ওপরে চেপে ধ'রে বললাম,—ও কথা ব'লে লজ্জা দিও না, লক্ষ্মী। ভাগ্যের ওপরে আর কার হাত আছে বল? বাবা ঠিকই দিতেন যদি তোমার কাকারা ঐ ভাবে ফাঁকি দিয়ে সব না নিতেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চকিত হরিণীর মত ড্যানী চেয়ে রইল আমার দিকে। বোধহয় খুঁজে দেখল, আমার চোখে কপটতার ছাপ আছে কি না!

দুদিন পরেই ছাপান কার্ড পেলাম শ্বশুর বাড়ী থেকে। সুযোগ জুটে গেল ভুল সংশোধন করবার। ড্যানীকে বললাম,—তোমার দাদার বিয়ে। নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে। তা তুমি যাবে না?

বিস্ময় ও সন্দেহের চিহ্ন ফুটে উঠল ড্যানীর মুখমণ্ডলে। বলল,—আমায় যেতে দেবে!

কেন দেব না? দাদার বিয়ে। তুমি না গেলে কেমন দেখায়? বুকের কাছে টেনে নিলাম ড্যানীকে। কপালে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম,—তবে আমায় কথা দিয়ে যাও যে বৌভাতের পরদিনই চ'লে আসবে।

বুকের মাঝে মুখ গুঁজে আধো-আধো সুরে বলল,—তুমি যেমন ব'লে দেবে তেমনই করব। তুমি যাবে না?

আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বললাম,—শালার বিয়ে কার না যেতে ইচ্ছা করে? তবে ঐ সময় জরুরী কাজ পড়ে গেছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ড্যানীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম, উপহার সামগ্রী সঙ্গে দিয়ে। বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে ফিরেও সে এল যথা সময়ে।

এরপর থেকে প্রতিবছর, কখনও বা দু-বছর অন্তর ড্যানী বাপের বাড়ী যেত। যাবার সময় শশুর শাশুড়ির জন্ত কাপড়, শালার ছেলেমেয়ের জন্ত মিষ্টি, কখনও গাছের নারকেল বা খেজুরে পাটালী কিম্বা আঙ্গুর বা খেজুর কিনে সঙ্গে দিয়ে দিতাম। আর এমন ভাব দেখাতাম যে সে বুকের কাছে না শুলে আমার ঘুম হবে না। তার হাতে না খেলে আমার পেট ভরবে না। ড্যানী মনে করত আমি তাকে ছাড়া এক রাত্রিও থাকতে পারি না। তাই নিজে তিন রাত্রি থেকে চলে আসত। আসবার দিন, তারিখ আমায় ব'লে দিতে হত না।

শিবপ্রসাদকেও আর কিছু বলতে হলো না। তার চোখেমুখে ফুটে উঠল অনুশোচনার অভিব্যক্তি। বলল,—ভদ্রলোকের ট্রীটমেণ্ট [চিকিৎসা] বড় সুন্দর। এই ট্রীটমেণ্ট যে সত্যিই বড় সুন্দর তা শিবপ্রসাদ নিজের জীবনেও প্রমান পেয়েছিল পরবর্ত্তী কালে। বিন্দুবাসিনী ও শিবপ্রসাদ দুজনেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছিল : দাদা! আপনার মাধ্যমে ডঃ প্যাটেলের সন্ধান না পেলে আমাদের সংসার জীবনে শান্তি কোনদিনই ফিরে আসত কি না সন্দেহ।

সন্দেহ এলে তার নিরাকরণ করলে—

"সন্দেহকে প্রশ্রয় দিলে সে ঘুণপোকার মত মনকে আক্রমণ করে, শেষে অবিশ্বাসরূপ জীর্ণতায় চরম মলিন দশা প্রাপ্ত হয়।" তাই সন্দেহ আসলে তৎক্ষণাৎ তা নিরাকরণের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সন্দেহ নিরাকরণ ক'রে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছিলেন মৃদুলবাবু।

মৃদুল সেন। বয়স বত্রিশ বছর। শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন ভদ্রলোক। স্ত্রী অঞ্জনা। বয়স তেইশ বছর। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও প্রেমের সম্পর্ক খুবই গভীর। তরুণ দম্পতির সুখের সংসার মহল্লার অনেকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল।

সেদিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন মৃদুলবাবু.—আমার সুখের সংসার যে এমন চাপা আগুনে ধিক ধিক করে জলবে তাতো স্বপ্নেও ভাবিনি। সারাদিন বুকটার মধ্যে জ্বলে যাচ্ছে।

সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম,—কেন? মিসেস সেনকে নিয়ে কিছু হ'ল নাকি?

চেয়ারখানা আমার সামনে আর একটু এগিয়ে এনে চাপা কণ্ঠে বললেন,— এর মূলে হচ্ছে আমার বন্ধু মৃণাল। ওর ফ্যামিলি এখানে নেই। আজ কয়েকমাস হল আমার বাসাতেই থাকে। আমরা দুজনে এক সাথে খেতে

বসি। আমি অফিসে রওনা হয়ে যাই, ও যায় স্কুলে পড়াতে। অঞ্জনা আমাদেরকে পরিবেশন করে। প্রতিদিন লক্ষ্য করি, বিশেষ করে ছানার ডানলা, কপির রোস্ট বা বিশেষ কোন ফরমাজী তরকারী যেদিন রান্না হয়, সেদিন অঞ্জনা মৃণালকে জিজ্ঞাসা করবেই: আর একটু দেব নাকি? মৃণাল, 'লাগবে না' বল্লেও অঞ্জনা তার নিজের বাটি থেকে কিছুটা তাকে ঢেলে দেবেই। ভাল জিনিষ কার না খেতে ইচ্ছে করে বলুন? কিন্তু আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করবে না। মনে মনে ক্ষোভ হয়। যখন দেখি অঞ্জনা নিজে তেল লবন লঙ্কা মাখিয়ে ভাত খাচ্ছে। তখন ওর ওপরে ভীষণ রাগ হয়। একজনকে বেশী বেশী খাইয়ে নিজে শুকনো খাওয়ার কি কোন যুক্তি আছে? মনে নানা প্রশ্ন এসে হাজির হয়। মৃণাল সম্বন্ধে অঞ্জনার মনে কোন দুর্বলতা আছে নাকি?

নানা কারণে এই প্রশ্ন জট পাকিয়ে ওঠে। ক্রমশঃ সন্দেহ উঁকি মারতে থাকে মনের ভেতরে, একটা বিশেষ ঘটনায় সন্দেহটা আরও জমাট বেঁধে উঠেছে। অঞ্জনাকে কিছু বলতেও পারছি না, সইতেও পারছি না। গতকাল ভোরে বুকের চাপা রাগ সামান্য একটু প্রকাশ করেছিলাম মাত্র। তাতেই তো আমাদের সুখের সংসার তুষের আগুনের মত জ্বলছে। তাইতো ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আপনার—

বাধাদিয়ে বললাম,—সেই বিশেষ ঘটনাটি কি জানতে পারি?

—জানাব বলেই তো এসেছি। বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মৃদুলবাবু বললেন,—রোজ বাসায় ফিরি রাত্রি নটা নাগাদ। সেদিন ফিরেছি পৌনে আটটায়। গেটে ঢুকেতেই দেখি মৃণাল আমার ঘরে সেল্‌ফের কাছে দাঁড়ান। অঞ্জনা তার গা ঘেঁসে—একদম বুকের কাছে দাঁড়ান। আমার যেন মনে হল,—থাকগে। বলতেও মুখে বাধে। আমার সাইকেলের আওয়াজ পেতেই মৃণাল অঞ্জনার হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দাদা! কি বলব আপনাকে। অঞ্জনাকে এমনভাবে দেখব তা স্বপ্নেও আশঙ্কা করিনি কোন দিন। আমার মনে হতে লাগল—পায়ের তলে বুঝি মাটি নেই।

কোন মতে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ঘরে এলাম। অঞ্জনা যথারীতি আমার জামাকাপড় পরিবর্ত্তনে সাহায্য করল। আমি কোন উচ্ছ্বাস বা আগ্রহ দেখালাম না: কারও সঙ্গে কোন কথাও বললাম না। হাত-মুখ ধুয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

মাথার কাছে এসে বসল অঞ্জনা। কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল,—মাথা ধরেছে? এমন গুম হয়ে আছ কেন?

অঞ্জনার প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। 'তুমি তোমার কাজ করগে' বলে পাশ ফিরে শুলাম।

যথাসময়ে নীরবে রাত্রের আহার সেরে নিলাম। কিন্তু রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না। সন্দেহের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল বার বার।

ভোর চারটেয় উঠে পড়েছি। রোজকার মত অঞ্জনা চা-য়ের পেয়ালাটা আমার সম্মুখে টেবিলে রেখে পেছনটায় দাঁড়াল। চা-য়ে চুমুক দিয়েই মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। 'অখাদ্য' ব'লে চা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জানালা দিয়ে।

সপ্রতিভ অঞ্জনা ছুটে এসে হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে বলল,—ওহো, চিনি দিতে ভুলে গেছি। আবার ক'রে—

থাক। আর চা করতে হবে না।—ঝাঁঝাল স্বরে বলে উঠলাম আমি।—ভুলতো হবেই। কারণ মনতো এখন—

কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে অপ্রকাশিত কথাগুলি মনের ভেতর জাবর কাটতে কাটতে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

দু'ঘণ্টা পরে বাড়ী ফিরে আসি। দেখি তখনও বালিশে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে মাতৃশোকে অভিভূত হরিণ শিশুর চোখের কাতর চাহিনী। কত ডাকলাম। কোন কথা বল্ল না আমার সঙ্গে।

কথা বলবে কী? অঞ্জনার মনের মধ্যে তখন বোধ হয় ধ্বনিত হচ্ছে,—ছিঃ ছিঃ ও আমাকে এত নীচ ভাবল!

আমিও আর কিছু না ব'লে অফিসের পোশাক প'রে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

প্রশ্ন করলাম,—আপনি যে আপনার বন্ধুকে দিয়ে মিসেস সেনকে সন্দেহ করেছেন তা কি মুখে একবারও প্রকাশ করেছেন?

মৃদুলবাবু একটু চোখ বুজলেন। বোধহয় স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। বললেন—না। মৃণালের নাম উল্লেখ করিনি। তবে আমি যে তাকে সন্দেহ করেছি তা অঞ্জনা বেশ বুঝতে পেরেছে।

ভরসা দিয়ে বললাম,—তা বুঝুক। আপনি কথায় তো তা প্রকাশ করেন নি। কথার আঘাতে অন্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা নিরাময় করা বড় কঠিন। হয়তো জীবনেও সে দাগ মোছে না। যাইহোক, আপনি বাড়ী ফিরে যান।

বিস্মিত কণ্ঠে বললেন মৃদুলবাবু,—বাড়ীতো ফিরে যাবই। কিন্তু কিভাবে কি করব? কালবৈশাখী উঠবার আগে প্রকৃতি যেমন ধুম ধরে থাকে, আমাদের অমন সুখের সংসার তেমনই ধুম ধ'রে আছে। কখন যে তাণ্ডব শুরু হবে তাই ভাবছি।

বড় টেপরেকর্ডে দশ নং ক্যাসেটটি সেট ক'রে নিলাম। তাতে অনুরূপ একটা দাম্পত্য কলহের অবসান যে ভাবে হতে পারে, তার একটা মনগড়া নকশা রেকর্ড করা আছে। সুইচটিপে দিয়ে বললাম,—এই ক্যাসেটটি শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন বাড়ী যেয়ে আপনাকে কি কি করতে হবে। আমি অন্য একটা জরুরী কাজ সেরে আসি। আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না। তবে অনুগহ ক'রে সুইচ্‌টা অফ্‌ ক'রে দিয়ে যাবেন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে যদি, যা বল্লেন তাব মধ্যে বেঠিক কিছু না থাকে।

সত্যই সব ঠিক হয়ে গেল। ক'দিন পরেই দেখা করলেন মৃদুলবাবু। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে বললেন,—আপনার ক্যাসেটের কাহিনী অনুসারে মনখুলে অঞ্জনার সঙ্গে কথা বললাম। ক্যাসেটের ঐ কাহিনী দিশারীর কাজ করেছে। দুজনেই দুজনের হারান মনকে ফিরে পেয়েছি।

উল্লসিত হয়ে বললাম,—কিরকম?

বর্ণনা করলেন মৃদুলবাবু: সেদিন বাড়ী ফিরলাম একটু রাত ক'রে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলাম। অঞ্জনা আলাদা বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমাচ্ছে। নাইটল্যাম্পের স্বল্প আলোকেও চিক্‌ চিক্‌ করছে চোখের কোণে গড়িয়ে পড়া অশ্রুকণাগুলি। বুঝলাম; কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। অতি সন্তর্পণে তার মুখখানা আমার বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম। আদর করে বললাম,—বাব্বা! এত রাগ!! আমি না হয় মাথা গরম করে কাপের গরম চা-টা ফেলেই দিয়েছি। তাই বলে তুমি আমার সঙ্গে কথাই বলবে না?

এইভাবে আমার সোহাগ স্পর্শে তার কান্নার বুঝি বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। বললাম,—আর কেঁদোনা। আমার রাগ তো আর নেই। সেদিনে অফিসের ব্যাপারে মেজাজটা ঠিক ছিল না।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল অঞ্জনা,—তুমি হাজার বার রাগ করলেও আমার এত দুঃখ হতো না। চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করলে! স্বামীর সন্দেহভাজন হওয়া যে কোন স্ত্রীর পক্ষে নরকযন্ত্রনা তুল্য।

হো হো ক'রে হেসে উঠলাম আমি। আরও কাছের মানুষের মত জাপটে ধরে বললাম,—ওরে পাগলী! আমার কথাতে বুঝি তাই বুঝেছ? তাই এত কান্না? রাম! রাম!

অঞ্জনা জানে, আমি যখন খোসমেজাজে থাকি, তখন ওকে আদর ক'রে কখনও কখনও 'পাগলী' বলি। তাই আমার চোখের দিকে তাকাল। বোধ হয় দেখল, আমি অভিনয় করছি কিনা!

নিজেকে বুক থেকে আলাদা করে নিয়ে অঞ্জনা বলল,—সেদিন রাত্রে মৃণালবাবুকে ঘরে দেখেই তো তোমার মেজাজ গরম। আমি বুঝি কিছুই বুঝতে পারি না? তারপর ভোর বেলায় ঐ কথা বল্লে! বলতে চাও, আমার মন এখন পরপুরুষে মজে আছে! এই তো?

আরও জোরে হেসে উঠলাম অঞ্জনার কথায়। পরিবেশটা হালকা করার অভিপ্রায়ে বললাম,—ও বাবা! তোমার তো বেশ যোগবল হয়েছে দেখছি! মনের কথা সব বুঝে ফেলেছ?

অভিযোগ করে অঞ্জনা বলল,—তা তুমিই বা রাত্রে বাড়ী ফিরে অমন গুম হয়ে গেলে কেন?

শার্টটা খুলে অঞ্জনার হাতে দিয়ে বললাম,—আগে ভাল ক'রে দু-কাপ কফি তৈরী কর দেখি। খেতে খেতে বলব কেন গুম হয়েছিলাম।

অনেকখানি হালকা হয়েছে অঞ্জনা। দু'কাপ কফি, সঙ্গে চানাচুর নিয়ে এল শোবার ঘরে। কফিতে চুমুক দিয়েই বলল,—এবার বল কেন আমার ওপরে রাগ করলে!

হেসে বললাম,—আগে তুমি বল, কেন মৃণালের কথা তুল্লে। আমি তো একবারও মৃণালের কথা বলিনি। মৃণাল কেনই বা এসেছিল এ ঘরে?

মুখের কফিটা গলধঃকরণ ক'রে অঞ্জনা বলল,—আমি তখন ভাতের ফেন ঝরাচ্ছিলাম। লাইব্রেরীতে ফাংশন দেখতে যাবেন ব'লে মৃণালবাবু বেরিয়ে গেলেন। দুমিনিট বাদেই ফিরে এলেন। বললেন,—বৌদি, ছুঁচ-সুতোটা একটু দিন না। দুটো হাতার বোতামই খুলে গেছে।

আমার দুটো হাতই জোড়া। বললাম,—আপনার দাদার কলমের ট্রের ওপরে আছে দেখুন।

ট্রের ওপরে না পেয়ে বললেন,—সুতো তো পেলাম। কিন্তু ছুঁচটা পাচ্ছি না। বড্ড দেরি হয়ে গেল।

আমি ভাতের হাড়ি উপুড় দিয়ে হাত ধুয়ে ছুটে এলাম। দেখি, সত্যিই ট্রের ওপরে ছুঁচ নেই। ওমা! কোথায় গেল! হঠাৎ দেখি মৃণালবাবুর বাঁদিকে পেছনে ক্যালেণ্ডারে গোঁজা। ছুঁচটা খুলে ওনার হাতে দিতেই মৃণালবাবু তার ঘরে গেলেন। ঠিক সেই সময় তুমি মুখভার করে ঘরে ঢুকলে। একটা কথাও বললেনা। কি যে হল তাও বুঝতে পারলাম না। দুবছর বিয়ে হয়েছে, এমন মূর্ত্তি তো কোনদিন দেখিনি। তাই ভোরে চা করবার সময় সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে অন্য মনস্ক হয়ে পড়ি। চায়ে চিনি দিতে ভুলে যাই। আর তুমি কিনা বলে বসলে, আমার মন পরপুরুষের পেছনে ঘুরছে!

চটকরে অঞ্জনার মুখখানা চেপে ধরলাম। বললাম,—আমি কি তাই বলেছি? আমি বলতে চেয়েছিলাম, তোমার মনতো তখন বাপের বাড়ীর চিন্তায় মগ্ন!

সন্দেহের দোদুল চোখে চাইল আমার দিকে। গম্ভীর স্বরে বলল,—হুঁ! বাপের বাড়ীর চিন্তায় মগ্ন বলতে চেয়েছিলে! আর কথা পেলে না?

হেসে বললাম,—কি, তোমার বাবা তোমাকে নিতে আসবেন বলে লিখেছেন কি না বল? বাপের বাড়ী যাওয়ার নাম শুনলে তোমাদের মন কেমন নাচতে থাকে তা বুঝি আর আমি জানি না?

মৃদু প্রতিবাদ ক'রে বলল,—বেশ যাও! তাই ব'লে ঐ সাতসকালে বাপের বাড়ীর কথা ভাবতে বসেছিলাম,— আমার কাপ-প্লেট উঠিয়ে নিয়ে রেখে এল বেসিনে।

আমার বিবৃতি বিশ্বাস করেছে ব'লে মনে হ'ল। চোখে-মুখে সেই মনো-বেদনার কাল দাগ হালকা হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বরও স্বাভাবিক। আমার ডান-হাতটা তার ভিজে হাত দিয়ে মুছে দিয়ে বলল,—কথা ঘোরাতে অদ্বিতীয় ওস্তাদ।

কথা ঘোরাই আর যা করি, তোমার মনতো ঘুরেছে। মনে মনে বললাম,— মা কালীর দিব্যি, আর এমন ভুল করি?

প্রসঙ্গান্তরে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি রান্না হয়েছে? মৃণালের তো আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ! তাই না?

হ্যাঁ, আসতে রাত্রি হতে পারে, ব'লে গেছেন।—আমার শেলফের বইগুলি গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল—অঞ্জনা।

সুযোগ মত বললাম,—আচ্ছা, আমরা দুজনে একই সঙ্গে খেতে বসি। তা

তুমি আমাকে তো একবারও জিজ্ঞাসা করনা। ভাল তরকারিটা আর একটু দেব নাকি? অথচ মৃণাল না চাইলেও নিজের বাটি থেকে তার পাতে ঢেলে দাও।

সহজভাবে উত্তর দিল অঞ্জনা,—তোমার তো আমি আছি। প্রয়োজন হলে চাইবেই। ওনার তো মা, বৌ কেউ নেই এখানে। যখন দেখি শেষের ভাতটুকু শুখনো মাখিয়ে খাচ্ছেন তখন জিজ্ঞাসা করি। ভাবি, আমি তো তেল-লবন মাখিয়ে খেতে পারি। ব্যাটাছেলে কি শুখনো খেতে পারে? তাই, না চাইলেও নিজের বাটী থেকে ঢেলে দেই।—চট্ করে ছুটে এসে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল,—ও-ওঃ। তাই বুঝি বাবুর মুখ ভার হয়ে থাকে যেদিন সুখা আলুরদম বা ছানার ডানলা রান্না হয়।

অঞ্জনার হাতদুখানা আমার দু-হাতে চেপে ধ'রে কৃত্রিম অভিমানের সুরে বললাম,—তা হবে না? তুমিই বা ছানার ডান্‌লা নিয়ে পক্ষপাতিত্ব করবে কেন?

আচ্ছা-গো আচ্ছা! এবার থেকে দানের ঐ বড়বাটীটা ভরে দেব, কেমন? —চকিতে সোহাগের চিহ্ন এঁকে দিয়ে বলল,—এবার তোমার কাজ কর। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।

গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছিলাম—মৃদুলবাবুর স্তিমিত দাম্পত্য সুখের পুনরুজ্জীবনের নাটক। দশ নং ক্যাসেটের নকশার পরিমার্জিত নবীন সংস্করণ করেছেন মৃদুলবাবু। বাহবা দিয়ে বললাম,—Congratulation on your brilliant success.

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মৃদুলবাবু,—দাদা বুকের ওপর থেকে যেন এক বিরাট পাষণ নেমে গেল তখন। চোখের সামনে ভেসে উঠল বাসরঘরের দৃশ্য; ফুলশয্যার রাত্রের সেই আপন করা আগ্রহ। মনে পড়ে গেল কত বিনিদ্র রজনীতে তার উচ্ছ্বাস, বঙ্কিম চাহনীতে নিঃশেষে নিজেকে নিবেদন করেছে কতবার। নিজেরই লজ্জা হল যে, এতসব একমুহূর্তে ভুলে এমন নিষ্কলঙ্ক মানুষটিকে সন্দেহ করলাম কেন?

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—সন্দেহ আসাটা দোষের নয়। কিন্তু তা মনে মনে পোষণ করাই দোষের। পরস্পরের প্রতি যে সন্দেহই হোক না কেন তা যদি খোলামন নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা ক'রে, সত্যকে জানবার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনও মন কষাকষি হয় না।

স্ত্রীকে সন্দেহ করলে

কিন্তু খোলা মন নিয়ে স্ত্রীকে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে নি বলেই অক্ষয়ের জীবনটা বিষময় হয়ে উঠেছিল। আর সেই বিষের জ্বালায় ধিক ধিক করে জ্বলছিল অক্ষয়ের স্ত্রী তৃণা।

তৃণা বল। বয়স পঁয়ত্রিশ ছুঁইছুঁই। চার সন্তানের মা। বড়ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বড় মেয়েকে পাত্রপক্ষ দেখে গেছে, কয়েকদিন আগে। চেহারা দেখলে মনে হয় ভদ্রমহিলার বিয়ে হয়েছে আট-দশবৎসর আগে।

সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য। ভরা যৌবনে প্রতিঅঙ্গ কানায় কানায় পূর্ণ। কিন্তু কোথায় যেন কিছু না পাওয়ার বেদনার সুর সারাক্ষণ বেজে চলেছে। তাই সেদিন দীক্ষা নেবার পর দুঃখের কথা বলতে গিয়ে, স্বামী অক্ষয় সম্বন্ধে কত কথাই না বল্ল :

বারবছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। বাবার বড় আদরের ছিলাম। শ্বশুর-বাড়ীতে এসে আদরসোহাগের স্বাদ একদম ভুলে গেলাম। শাশুড়ির গঞ্জনার কথা এখনও ভুলতে পারি না। এমন দিন বোধহয় কমই গেছে যেদিন চোখের জল না ফেলে ভাত মুখে দিয়েছি। প্রতিবাদ করিনি। স্বামীর কাছেও বলতাম না। নীরবে সহ্য করতাম। স্বামীর কাছ থেকে এতটুকু সহানুভূতি যদি পেতাম, তাহলে সহ্যশক্তি আরও বেড়ে যেত। কিন্তু সহানুভূতি পাওয়া তো অনেক দূরের কথা। বরং প্রহারই ভাগ্যে জুটেছে বহুদিন……। তখন আমার বড় ছেলের বয়স দশমাস। আমাদের বাড়ীর দুখানা বাড়ী পরেই একবাড়ীতে ভাগবৎ পাঠ হচ্ছিল। শাশুড়িকে বলেই এক আত্মীয়া আমাকে ভাগবৎ পাঠে নিয়ে গেলেন। সামান্য কিছুক্ষণ শুনে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরেছি। উনি (অক্ষয়) গ্রামের হাটে গেছিলেন। জানতাম সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরবেন। কিন্তু ঐ দিন অনেক আগেই ফিরেছেন। বাড়ীতে আমাকে না দেখে রেগে ছিলেন। শাশুড়িও কিছু ফোড়ন্ কেটে থাকতে পারেন। আমি সদর দরজায় পা দিতেই অতলোকের সামনে আমার গালে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিলেন। সেকথা মনে হলে এখনও বুকের মধ্যে কেমন করে।—জলে ভরে উঠল তৃণার চোখদুটি। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল,—"এমনতর অত্যাচার কতদিন যে সয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। তবে মনে রাখতাম না। দোতলায় আমার ঘরে গেলেই মনে বল পেতাম। ঘরের আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়ের প্রাচুর্য্য, দেড়শভরি সোনার গহনা, তার সঙ্গে জড়োয়া সেট দেখলেই মনে হতো, থাকগে যাক্। মার খেলাম খেলাম। এসব তো আমার আছে। শিশু

বয়স। তখন তো বুঝিনি, মেয়েদের জীবনে এসব শাড়ী গহনার দাম কত কম।

যতবড় হতে থাকলাম, তত বুঝতে শিখলাম, শাড়ী-গহনা জড়োয়াসেট থেকে স্বামীর আদর, সোহাগ, ভালবাসা ও প্রশংসা [appreciation] মেয়েদের জীবনে অনেক বেশী মূল্যবান। নিজের শখ, আহ্লাদ, ভাল-মন্দ স্বামীর কাছে অকপটে ব'লে তার বুকে একটু সহানুভূতির আশ্রয় যদি পাই, তবে সেইটেই বড় পাওয়া। এই প্রাপ্তিটুকুর জন্যই তো প্রত্যেকটি মেয়ের অন্তর কাঙ্গাল। কিন্তু কাকাবাবু! আপনি বিশ্বাস করুণ, এই বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে এসবের বিন্দুমাত্র পাই নি কোন দিন। শুধু পেয়েছি—লাঞ্ছনা। পান থেকে চুন খসলেই লাঞ্ছনা। নিজেব শখ আহ্লাদের কথা ছেড়েই দিলাম। ওনার কামনা পূরণে এতটুকু খাকতি হ'লে খেসারত দিতে হয়েছে কতদিন ধরে। আমারও যে মন ব'লে কিছু আছে, চাওয়া না-চাওয়া আছে, তা কোনদিন বোঝে নি। সবই মূল্যহীন ওর কাছে। ওর প্রয়োজন পূরণের যন্ত্রছাড়া আমি যেন আর কিছুই না।—আবার একপশলা অশ্রুধারা ঝরে পড়ল। স্মৃতির ভাণ্ডারেব যত গভীরে নামছে তত যেন কান্নার ঢেউ উঠে আসছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল,—এসব এতদিন নীরবে সহ্য করেছি। কিন্তু আরতো পারি না। বিশেষ করে এই বয়সে, যখন আমার চরিত্র নিয়ে মন্তব্য করে, সতীত্বকে সন্দেহ করে, তখন ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে মনে হয় আত্মহত্যা করি। কিন্তু মা তো! বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে চেয়ে তাও পারি না। আমি বলে—"আর বলতে পারল না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কান্না আর থামে না। ঢেউ-এর পর ঢেউ বুকের পাঁজর ভেদ করে যেন অজগর সাপের মত মোচড় দিতে দিতে বেরিয়ে আসছে! অতীতের এক-একটা স্মৃতির ধাক্কায় কান্নার ঢেউগুলি যেন প্রকৃতির বুকে আছড়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম,—আর কেঁদোনা মা! অতীতের কথা স্মরণ ক'রে লাভ কী? তবে এই বয়সে তোমাকে সন্দেহ করার পেছনে কারণ কি তাই বল।

বলবে কী? কান্না থামাতেই কেটে গেল আরও কিছুক্ষণ। নিজেকে সামলে নিয়ে তৃণা এলো-মেলোভাবে যা বলল তা গুছিয়ে লিখলে একটা নাটকের অঙ্ক হয়ে যেত।

তৃণা তখন সবে সংসারে গৃহিনী পদ পেয়েছে। তিনমাস আগে শাশুড়ি

মারা গেছেন। রান্নাবাড়া থেকে অন্দরমহলের যাবতীয় কাজ তৃণা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। তার ওপরে অক্ষয় চাপিয়ে দিয়েছে উজ্জ্বলের দায়দায়িত্ব।

ভিন্ গ্রামের ছেলে উজ্জ্বল। অক্ষয় তাকে আশ্রয় দিয়েছে স্থানীয় স্কুলে পড়া-শোনার সুবিধা আছে বলে। প্রথমে স্কুলে তিনবছর এবং পরে কলেজে চারবছরের পাঠ শেষ করে, এই বাড়ীতে থেকে। এই দীর্ঘ সাতবছর তৃণা নিজের ছোট ভাই-এর মত ভাত-জল ভালবাসা দিয়ে পুষ্ট করে তুলেছে উজ্জ্বলকে। উজ্জ্বলও শ্রদ্ধা ভক্তি, আনুগত্য ও বিনম্র ব্যবহারে স্থায়ী স্থান ক'রে নিয়েছে তৃণার অন্তরে। অন্দরমহলে বন্দিনী তৃণার জীবনে বালক ও কিশোর উজ্জ্বলের প্রাণখোলা সাহচর্য্যে একঝলক স্বস্তি বয়ে আনত। উজ্জ্বলের কাছে তৃণা যে, মনের কোন কোন ব্যথার কথা বলত না, তা নয়। বয়সে কনিষ্ঠ হলেও কিশোর উজ্জ্বল পরামর্শ হিসাবে যা বলত তা তৃণার জীবনে অনেক সময় দিশারীর কাজ করত।

তাই ১৯৭২ সালে রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসবার পর তৃণা উজ্জ্বলের অনেক খোঁজ করেছে। কল্পনার দৃষ্টিতে উজ্জ্বলকে দেখবার চেষ্টা করেছে জীবনে প্রতিষ্ঠিত স্বগৃহী রূপে।

দশবৎসর কেটে গেল ভারতের নূতন আবাসে। হঠাৎ একদিন উজ্জ্বল এসে হাজির অক্ষয়ের বাড়ীতে। এতদিন পরে উজ্জ্বলকে পেয়ে অক্ষয় মহাখুশী। যাকে একদিন আশ্রয় দিয়ে লেখাপড়ায় সাহায্য করেছিল, সেই উজ্জ্বল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ সরকারী পদে চাকুরী করছে জেনে অক্ষয়ের আনন্দ আর ধরে না। আত্মপ্রসাদে ভরপুর অক্ষয় তৃপ্তির আবেশে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল উজ্জ্বলকে।

আর তৃণা? এতদিন সে যাকে মনে মনে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সেই উজ্জ্বলকে কাছে পেয়ে তৃণার বুকে সযত্নে সঞ্চিত ভ্রাতৃস্নেহ মুহূর্ত্তে উদ্বেল হয়ে উঠল। সেই কুড়ি বৎসরের কিশোর উজ্জ্বল যে আজ রূপলাবণ্যময় সুঠাম, স্বাস্থ্যবান এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক তা সে ভুলে গেল। স্থান-কাল বিস্মৃত হয়ে বিরহকাতর ভগিনীর ন্যায় উজ্জ্বলকে নিজের পাশে বসিয়ে বার বার উজ্জ্বলের মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তৃণা ও অক্ষয় দুজনেই উজ্জ্বলকে অনুরোধ করল কটাদিন তাদের বাড়ীতে কাটিয়ে যেতে। দুদিন থেকে উজ্জ্বল চলে গেল দমদমে তার নিজের বাড়ীতে।

তিন-চার মাস পরে পরে উজ্জ্বল আসে অক্ষয়দের কুশল জানতে। কখনও

একঘণ্টা কখনও বা একটা দিন থেকে যায়, বাড়ীর সবার অনুরোধে। বিশেষ করে অক্ষয়ের ছেলে-মেয়েরা ছাড়তে চায় না। তারা তাকে আপন মামা বলেই জানে।

উজ্জলকে পেয়ে তৃণার জীবনের একটা দিক যেন খুলে গেল। চাওয়াটা না পাওয়ার বেদনা, সংসারের একটানা একঘেয়েমী ও আত্মীয়স্বজন বর্জিত পরিবেশে তৃণা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। হঠাৎ উজ্জলকে পেয়ে যেন একটা স্বস্তির আলো দেখতে পেল। তাই উজ্জল যখনই এবাড়ীতে আসে, আনন্দের জোয়ারে কানায়-কানায় ভরে ওঠে তৃণার অন্তর। গান, গল্প, ছেলে-মেয়েদের খেলা ধূলা নানারকম খাদ্যের আয়োজন, ও হাসিহুল্লোড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে বাড়ীর পরিবেশ। সবাই উপভোগ করে। শুধু পারে না অক্ষয়।

অক্ষয়ের হয় ঈর্ষা। তার হীনমন্য অহং এ সন্দেহের অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে। উজ্জল তৃণার মেলামেশা, উজ্জলের প্রতি আপ্যায়নের আধিক্য সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে অক্ষয়। এই সন্দেহ একদিন আগ্নেয়গিরীর অগ্ন্যুৎপাতের মত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাইকরে দিল তাদের দাম্পত্যজীবন। ঘটনার বিবরণ দিতে যেয়ে তৃণা বলল,—কাকাবাবু। স্বামী-সুখের স্বাদ জীবনে পেলাম না। কিন্তু উজ্জলকে নিজের হাতে নেড়ে-চেড়ে বুঝেছি, স্ত্রীকে খুশী করার মত অন্তর সম্পদ তার আছে। তাই একদিন প্রস্তাব দিয়ে বসি : উজ্জল! তুমি এখন স্বাবলম্বী হয়েছ। আমার একটা অনুরোধ যদি রাখ।

সাগ্রহে বল্ল উজ্জল,—আপনার অনুরোধ রাখব না? বলেন কি দিদি! বলুন কি করতে হবে।

সাহসে ভর করে বললাম,—আমার বোন শীলাকে তুমি দেখেছ। এবার বি. এ. পাশ করল। তুমি যদি তাকে বিয়ে কর তাহলে মা-হারা মেয়েটি আশ্রয় পায়, আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারি।

উজ্জল কথা দিয়ে বলল,—জামাইবাবু ও আপনি আমার জন্য যা করেছেন তা কোনদিনই পরিশোধ করতে পারব না। আমার এতে অমত নেই। তবে আমার দাদা আছেন। তাঁর কাছে প্রস্তাব পাড়লে ভাল হয়।

উজ্জলের কাছ থেকে কথা পেয়ে তৃণার আনন্দ আর ধরে না। অক্ষয়ের কাছে সে সবকথা খুলে বলে। অক্ষয় যাতে এবিয়েতে সম্মতি দেয় তার জন্য তৃণা ক্ষণে অক্ষণে উজ্জলের প্রশংসা করে। নিজের স্ত্রীর মুখে অন্যপুরুষ সম্বন্ধে কার্পণ্যহীন প্রশংসা অক্ষয়ের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে, মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় সে।

উপরন্তু উজ্জল যখনই আসে, তৃণা অক্ষয়কে তাগিদ দেয় ফল, মিষ্টি ও অসময়ের সবজি ইত্যাদি আনতে। তৃণার ধারণা, আদর আপ্যায়নে উজ্জলকে যত খুশী করতে পারবে, শীলার ভাবি জীবনের পক্ষে তা তত সুবিধার হবে। কিন্তু অক্ষয়ের চোখে বেশী আধিক্যেতা বলে মনে হয়। ক্রমশঃই অক্ষয়ের ঈর্ষাকাতর মনের কাছে উজ্জল অসহ্য হয়ে ওঠে।

হঠাৎ উজ্জল এসে যা জানাল তাতে তৃণার মাথায় যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হল। উজ্জল গোপনে বলল তৃণাকে,—দিদি! আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার কথা রাখতে পারলাম না বলে দুঃখিত। এ বিয়ে আমি করতে পারব না। কেন, কিজন্য পারবে না তার ভাঁজ ভাঙ্গল না। অক্ষয় বাড়ীতে ফিরবার আগেই সে ফিরে গেল দমদমে।

কয়েকঘণ্টা দমধরে বসে রইল তৃণা। কারও সঙ্গে কোন কথা বলল না। শুধু ভাবতে লাগল—আমার এ সর্বনাশ কে করল!

অক্ষয় তৃণাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—কি আর হবে বল? এখন পয়সার মুখ দেখেছে তো! তোমার সেবাযত্নের কথা কি আর এখন মনে আছে? উজ্জল ভেবেছে তাকে তোষামোদ করে তার দাম বাড়াব। তা হচ্ছে না। অন্যপাত্র—ওর চাইতে অনেক ভালপাত্র পাওয়া যাবে!

বিশ্বাস করে তৃণা। কিন্তু উজ্জল কেন কথা ঘুরাল তা আর বুঝতে পারে না! বুঝতে পারল দশদিন পরে—ছোট বোন শীলার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে।

সকালবেলা কি এক জরুরী কাজে উজ্জল এসেছিল অক্ষয়ের কাছে। অক্ষয় তাকে ফিরে যেতে দিল না। থেকে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। নিজেই বাজার থেকে ভালমন্দ নিয়ে এল উজ্জলের জন্য। চুপি চুপি বলল তৃণাকে,—ভাল করে রান্না কর। অক্ষয় এমন ভাব দেখাল যে সেও যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে উজ্জল তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

তৃণার মনে তখনও ক্ষীণ আশা, উজ্জল হয়তো রাজী হবে। সেদিন তো তাড়াতাড়িতে চলে গেল। ভালভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি—কেন স মত পাল্টাল। ভাবল, আজ সুযোগ মত জিজ্ঞাসা করবে—শীলার সম্বন্ধে কোন খারাপ কিছু শুনেছে কি না।

উজ্জলকে প্রশ্ন করার আর প্রয়োজন হলোনা। শীলা নিজেই লিখেছে কেন উজ্জল বিয়ে করতে রাজী নয়। চিঠিখানা প'ড়ে তৃণার সারা শরীর বিবশ হয়ে এল। ঘৃণা, লজ্জা, রাগ ও অপমানে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল তার বুকের

মধ্যে। তার নিজের স্বামী, মা-হারা মেয়ের এমন সর্বনাশ করতে পারে তা সে ভাবতেও পারে না।

বাড়ীর সকলের আহারাদি হয়ে গেল। সবাই শুয়ে পড়ল যে যার স্থানে। তৃণা রাত্রেও কিছু মুখে দিল না। সংসারের কাজ সেরে নীরবে শুয়ে পড়ল অক্ষয়ের পাশে। কিন্তু অক্ষয়ের একটা কথারও জবাব দিল না তৃণা।

এর পরের ঘটনা বিবৃত করল অক্ষয়। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পতঙ্গের মত এসে হাজির হল আমার বাসায়। তার চোখে মুখে এক অস্বাভাবিক অস্থিরতার ছাপ। ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় যেন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে অক্ষয়। নিজেকে সামলাতে না পেরে ঘরে ঢুকেই বলে বসল,—আপনি প্রতিবারেই তৃণার পক্ষে কথা বলেন। আপনার কাছে সে চিরদিন ভাল মেয়েই রয়ে গেল। কিন্তু আমি তাকে আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছি না। হয় নিজে আত্মহত্যা করব, না হয় ওকে খুন ক'রে জেলে যাব।

মৃদু হেসে বললাম,—জেল, শাস্তি দিতে পারে, সান্ত্বনা দিতে পারে না। তাই জেলে যাবার আগে জ্বালা মেটানই তো ভাল।—অক্ষয়ের হাতধরে টেনে বসালাম আমার পাশে। তখনও উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। বলল,—এ জ্বালা মেটাবার নয় দাদা। তাই শেষবারের মত এসেছি আপনার কাছে।

এর আগে দুবার এসেছে অক্ষয়। প্রতিবারে কমবেশী একই অভিযোগ: তৃণা আমার সম্বন্ধে উদাসীন। এতটুকু সেন্টিমেণ্ট নেই আমার প্রতি। আমার জন্য যা-কিছু করে সবই দায়সারা রকমের। তাতে প্রাণের কোন স্পর্শ নেই। · ···আমার করা কোনকিছুই তার পছন্দ হয় না। এমনকি ওর শরীর খারাপ দেখে ওষুধ এনে দিলেও তা ব্যবহার করবে না। বলবে—আমার জন্য কারও কোন চিন্তা করতে হবে না। অথচ পাড়ার ছেলেদের দিয়ে ওষুধ আনিয়ে ব্যবহার করবে।

প্রতিমুহূর্তে আমাকে তাচ্ছিল্য করে, আঘাত দিয়ে কথা বলে। আমার সঙ্গে সিনেমায় যাবে না। বলে—কাজ আছে। অথচ উজ্জ্বল এলে এক পায়ে খাড়া। সহ্যও করতে পারি না, আবার প্রকাশও করতে পারি না।

প্রতিবারেই অক্ষয়কে বুঝিয়ে শান্ত করে বাড়ী পাঠিয়েছি।

এবারও পুরাণ অভিযোগ দু-দশটা উল্লেখ করতে ভুলল না অক্ষয়। এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল,—শীলার সঙ্গে উজ্জ্বলের বিয়েটা

আমিই ভেঙেছি। একথা ঠিকই। তাই বলে আমার স্ত্রী হয়ে সে ব্যভিচারিণী হবে? উজ্জ্বলই আমার সংসারটা ভেঙে দিল!

একটু গম্ভীর স্বরে বললাম,—তুমি বার বার একই কথা বলছ! উজ্জ্বলকে দিয়ে নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ কর? চাক্ষুষ প্রমাণ সঠিক ভাবে না পেয়ে এমন কথা প্রকাশ করা ভাল না।

উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে উঠল,—চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যই তো এসেছি। এই দেখুন, এই যে মাল।—পকেট থেকে একটা রঙীন পলিথিনের মোড়ক বের করে বলল—একেবারে ফরেন মেক। এজিনিষ তো আমি কোনদিন ব্যবহার করিনি। এজিনিষ ওর বাক্সের তলে এল কোথা থেকে? নিশ্চয়ই ঐ শয়তান-টাই এনে রেখেছে!

—কিন্তু তৃণার বাক্সের তলের সন্ধান পেলেন কি করে?—প্রশ্ন করলাম বিস্মিত কণ্ঠে।

—বাক্স ভেঙেছি। তিনি তো আজ বিশদিন বাপের বাড়ী যেয়ে বসে আছেন! রাগ করে গেছেন।—তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার সুর অক্ষয়ের কণ্ঠে।—রাগ করে গেলেন কেন?—প্রশ্ন করলাম।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমার মুখোমুখি ঘুরে বসল অক্ষয়। বলল—সে ঘটনা তো আপনাকে জানাই নাই। .... সেদিন রাত তখন দুটো। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি পাশে তৃণা নেই। মনে কেমন আশঙ্কা হল। রাত্রে শোবার সময় গুম হয়ে ছিল। আমার কোন কথার উত্তর দেয় নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বাথরুম, বারান্দা—সব অন্ধকার। মনটা কেমন ভার হয়ে উঠল। গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। পা টিপে টিপে বাইরে এলাম। দেখি উজ্জ্বল যে ঘরে শুয়েছিল সে ঘরে আলো জ্বলছে। ঐ ঘরের পেছনের জানালায় এসে দাঁড়ালাম। দুই পাল্লার মুখে যে ফাঁকটুকু আছে, তাদিয়ে ওদের কার্য্যকলাপ দেখলাম—উজ্জ্বল বালিশে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তৃণা বার বার তার বুকের ওপরে ঝুঁকে পড়ছে। উজ্জ্বলের হাতখানা বুকের কাছে টেনে নিয়ে তৃণা ফিস্ ফিস্ ক'রে কি যেন বলল। শুনতে পেলাম না। তবে তৃণার চোখে জল তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু যেই দেখলাম, উজ্জ্বল তৃণার মাথাটা নিজের বুকের ওপরে টেনে নিয়ে তার মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে —আর দাঁড়াতে পারলাম না। ঘৃণায় ও রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমার ঘরে

ফিরে এলাম। হার্টের ধুক-পুক খুব বেড়ে গেল। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা! চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে রইলাম।

প্রায় তিনটে নাগাদ তৃণা এসে তার জায়গায় শুয়ে পড়ল। আমার পিঠে তার হাতের ছোঁয়া লাগতেই ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠলাম,—ছুঁয়ো না আমাকে। তোমার মত চরিত্রহীনা স্ত্রীর সঙ্গে একবিছানায় শোয়াও পাপ।

অস্ফুট কণ্ঠে কি একটা বলতে যাচ্ছিল তৃণা। সুযোগ দিলাম না। ধাক্কা দিয়ে খাট থেকে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

পরদিন চলে যায় বাপের বাড়ী। সেখানেই আছে। বোধ হয় তেনার রাগ এখনও পড়ে নি!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তৃণা দুসপ্তাহ আগেই তার এই অশান্তির কথা সবিস্তারে বলেছিল। তার বাপের বাড়ীর কাছেই বাঁশদ্রোণীতে একটা বাড়ীতে যখন ছিলাম তখন দেখা করেছিল। তাই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম। মন্তব্য করলাম,—অন্তরে আঘাত খেলে এমন রাগ সকলেরই হয়। সে যে আত্মহত্যা করেনি এই তো যথেষ্ট!

ব্যাঙ্গোক্তি করে বলে উঠল অক্ষয়—তাহলে তো বাঁচা যেত। আমাকে আর খুনের দায়ে পড়তে হতো না।

ইচ্ছা করেই ধমকের সুরে ব'লে উঠলাম,—থামুন মশাই। খুন কি মুখের কথা? দোষ তো সম্পূর্ণ আপনার। তাকে নূতন করে আর কি মারবেন? সে তো অন্তরে মরেই আছে!

আমার ধমক্ খেয়ে কেমন যেন থতমত খেল অক্ষয়। বলল—আমার দোষ?

বেশ জোরের সঙ্গে বললাম,—হ্যাঁ। যা কিছু ঘটেছে সবই আপনার জন্য! আপনি কোনদিন তাকে সহানুভূতি বা সমবেদনা দেখান নি। বরং বাড়ীর ঝি-এর মত ব্যবহার করেছেন। তাই না? শাড়ি, গয়ণা, কি ছেলে-মেয়ে দিলেই স্ত্রীর অন্তরের ক্ষুধা মোটে না। তার জন্য চাই স্বামীর আদর, সোহাগ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়। তাকি কোনদিন দিয়েছেন? তা দেন নি। কোনদিন কি তার কোন কাজের প্রশংসা করেছেন? বরং পান থেকে চুণ খসলে লোকের সামনে মারতে পর্য্যন্ত কসুর করেন নি! সংসারের বিশেষ কোন কাজে কি কখনও তৃণার পরামর্শ চেয়েছেন? প্রয়োজনবোধ করেন নি! মমতামধুর দৃষ্টিতে তৃণার চোখের দিকে কি, একবারও চেয়ে দেখেছেন যে শুভদৃষ্টির সেই

তীক্ষ চাহনী তখনও তার চোখে মিট্ মিট্ করছে কিনা, তা দেখবার ইচ্ছাও হয়নি! কোন দিনকি তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, আদরে সোহাগে বুঝিয়েছেন যে, সে না হলে আপনার চলেনা? বরং বেশ জোরের সঙ্গে বুঝিয়েছেন যে আপনি ছাড়া তার চলবে না। তাই না? পার্থিব অনেক কিছুই দিয়েছেন। কিন্তু সে আপনার কাছ থেকে এমন কিছু পায়নি যাতে আপনার প্রতি তার ভালবাসা নিশ্চিত পেকে ওঠে। তাই দৈহিক সুখ-সম্ভোগের সময়ও তাকে অত নিস্পৃহ দেখেছেন। ঠিক কিনা বলুন?

অস্ফুট কণ্ঠে বলল অক্ষয়,—ঠিক। যা বলছেন সবই ঠিক। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

—তাই তৃণাও মরিয়া হয়ে উঠেছিল।—নাটকীয় ভংগীতে বলতে লাগলাম,—স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা তৃণার নারী হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল। তাই উজ্জলের কাছে সহানুভূতি, মমত্বপূর্ণ ব্যবহার, প্রশংসা ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি পেয়ে তার প্রতি তৃণাও মমতাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মনে রাখবেন মানুষ মনের খোরাক যেখানে পায় সেখানেই সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অনুরক্ত হয়ে ওঠে। উজ্জলকে তাই অত্যন্ত কাছের মানুষ বলে মনে করেছিল তৃণা। তাই উজ্জল আপনাদের বাড়ীতে এলে তৃণার অন্তর—আবেগ, আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ফুলঝুরির ফুলকীর মত ছড়িয়ে পড়ত। তার কাছে কামনার কিছু ছিল না তৃণার। ছিল, অন্তরে না পাওয়ার জ্বালাটা মিটিয়ে শান্ত ও সুস্থির ভাবে সংসার করার আকাঙ্ক্ষা।

আরও একটু গম্ভীর হয়ে শাসনের সুরে বললাম,—কিন্তু আপনি তার নিষ্পাপ মনের পবিত্র উচ্ছ্বাসকে সন্দেহ করলেন। আপনার হীনমণ্য অহং এতই ঈর্ষাকাতর যে সেদিন রাত্রে তৃণাকে উজ্জলের ঘরে ঐ ভাবে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। সে কেন, কিজন্য কি করেছিল তা জিজ্ঞাসা করে জানবার মত ধৈর্য্যও আপনার ছিল না। তাই তার আঙ্গুলের পবিত্রস্পর্শকে কলুষিত মনে করে তাকে খাটথেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। এখন চাইছেন খুন করতে।

অক্ষয় বেশ উষ্মা প্রকাশ করে বলল,—আপনি শুধু তৃণার পক্ষেই সাফাই গান! আমার কথার কোন দামই দেন না।

চট্‌করে উঠে পড়লাম চেয়ার থেকে। বেশ উত্তেজিত ভাব দেখিয়ে বললাম—দুর্ভাগ্য আপনার যে অমন শিশুর মত পবিত্র সরল মনের মানুষকে

নিয়ে ঘর করতে পারলেন না। তবে শুনুন তৃণা কেন অতরাত্রে উজ্জ্বলের বুকের ওপরে বার বার ঝুঁকে পড়ছিল।

টেবিলের নিচে সুইচ্‌টিতে গোপনে চাপ দিতেই পাশেরঘর থেকে স্পষ্ট ভেসে এল তৃণার কণ্ঠস্বর।

সচকিত হয়ে উঠল অক্ষয়। বলল,—একি! তৃণা কখন এল আপনার কাছে? এতক্ষণ ধরে তবে কি সে আমাদের সব কথা শুনেছে?

অভিভাবকের মত গম্ভীর হয়ে বললাম,—শুনন চুপ করে, তৃণা নিজেই বলছে সে ঐ রাত্রে কেন গেছিল উজ্জ্বলের ঘরে।

গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে শুনতে লাগল অক্ষয়। তৃণার কণ্ঠ ভেসে এল:

সেদিন দুপুরে। সবার স্নান-খাওয়া হয়ে গেছে। আমি খেতে বসব। এমন সময় পিওন চিঠি দিয়ে গেল। শীলার চিঠি। শীলা লিখেছে: দিদি! জামাইবাবু এত নীচ কাজ করতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার জীবনের সুখ তিনি সহ্য করতে পারলেন না কেন? উজ্জ্বল কি তার জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী যে এই ভাবে দাদার কাছে তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক কথা লিখল? জামাইবাবু কি ভেবেছে উজ্জ্বলকে সরিয়ে দিয়ে নিজে জুড়ে বসবে শীলার জীবনে? বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার স্বপ্ন যেন তিনি কোন দিন না দেখেন।

"শোন্ দিদি! দোহাই তোর! আমার বিয়ের জন্য আর চেষ্টা করবি না। হিন্দু নারীর দুবার বিয়ে হয় না। স্বামী একজনই হয়।"

শীলার শেষ কথাটা বলেই তৃণা যে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল তা টেপরেকর্ডারের লাউড্‌স্পীকার জানান দিতে ভুল করল না। তৃণা বলল,—দেখুন, মা-হারা মেয়ে। বয়স বেড়ে যাচ্ছে। উনি [অক্ষয়] এমন ভাবে একটা জীবন নষ্ট করে দিলেন? আর উজ্জ্বলই বা কি ভাবছে বলুন? আমি ওনার এই অপমান সহ্য করতে পারছি না। আমার স্বামী লোকচক্ষে হীন বা নীচ প্রতিপন্ন হবে এ আমি ভাবতে পারি না। তাই অতরাত্রে নিজের মান-ইজ্জৎ বিপন্ন করেও চুপি চুপি উঠে গেলাম উজ্জ্বলের ঘরে। ওর হাতদুটি চেপে ধরে কাঁদতে লাগলাম। বললাম,—ভাই, তোমার জামাইবাবুকে ভুল বুঝো না। নিশ্চয়ই কোন দুষ্টলোক তার কাছে তোমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে।

আমার কান্না দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল উজ্জ্বল, নিজেও কাঁদতে লাগল। বলল,—আপনাকে দিদি বলে ডাকলেও মায়ের মত মনে করি। আপনার ঋণ কোনদিনই শোধ দিতে পারব না।

শীলার চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ল। তার চোখদুটি জলে ভরে উঠল। আবেগভরে বলল,—আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার দাদা যদি রাজী থাকেন তাহলে এ বিয়ে হবে।

কাকাবাবু! আমার বুকের ওপর থেকে যেন বিরাট এক পাষাণ সরে গেল। উজ্জলের হাতদুখানা আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম। ও তখন আমার মাথাটা ওর বুকের ওপরে চেপে ধরে, আমার পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—আবার কাঁদা কেন? শীলার শ্রদ্ধা যখন নড়চড় হয়নি, তখন জীবন থাকতে আমার এ-কথারও নড়চড় হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন গে।

উঠে এলাম আমার ঘরে। জায়গায় শুয়ে পড়লাম। ইচ্ছা করেই ওনার পিঠে হাত বুলাতে লাগলাম। ভাবলাম, যদি জেগে যান, তবে সব ঘটনা বলে হালকা হতে পারব। ও বাবা! আগ্নেয়গিরির মত গর্জে উঠলেন। আমার কোন কথা শুনবার আগেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন চৌকি থেকে। কাকাবাবু! আমি পাঁচ সন্তানের মা! আমি নাকি চরিত্রহীনা!! আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়াও নাকি পাপ!!! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ ঘৃণ্য জীবন নিয়ে কেমন করে সংসার করব বলুন? আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার তো আর—শেষ করতে পারল না।

লাউড্‌স্পীকার থেকে তৃণার ফুঁপানী কান্নার আওয়াজ আছড়ে পড়তে লাগল অক্ষয়ের পেছনে দেয়ালের ওপরে।

চেয়ে দেখি, বড়বড় বৃষ্টির ফোঁটার মত অশ্রুকণা ঝরে পড়ছে অক্ষয়ের দুচোখ বেয়ে। অসহায় চাহনীতে চেয়ে আছে আমার দিকে। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে এল আমার কাছে। আবেগভরে আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরল। বলল,—দাদা! আপনি বার বার বলেছেন, তৃণা নিষ্পাপ। বিশ্বাস করিনি। এমন নিষ্পাপ পবিত্রাকে অমন আঘাত দিলাম!!

কোন কথা বললাম না। বহুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। তৃণার কান্নার প্রতিধ্বনি তখনও বুঝি ঘরের মধ্যে ঘুরছে। কাতর কণ্ঠে বলল অক্ষয়,—এখন আমি কি করব তাই ব'লে দিন আমাকে!

কি আর বলব? শুধু বললাম,—যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এর আগে দুবার আপনাকে বিতং ক'রে ব'লে দিয়েছি তৃণার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন। কথা কানে তোলেন নি। এখন ছুটে এসেছেন চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার

জন্য ? আপনার পাশের ঘরে একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ভাড়া থাকতেন না ?

অক্ষয়—হ্যাঁ থাকতেন। তিনি মাসখানেক আগে চলে গেছেন অন্য বাড়ীতে।

—তার ঘরে খাটের তলে ঐ ফরেনমেকের মোড়কটি তৃণা পেয়েছিল ঘর ঝাড়ু দিতে যেয়ে।—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—ঐটা পেয়ে যদি আপনাকে দেখাত বা জানাত তাহলে আপনার মাথায় খুন চাপত না!

লজ্জিত হয়েছে অক্ষয়। কাতর ভাবে বলল—আমার মনটা বড পাজি! ভীষণ সন্দেহ বাতিক!

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—খোলা মন নিয়ে তৃণার সঙ্গে ব্যবহার করবেন যাতে সেও আপনার কাছে মন খুলতে পারে। মনের ময়লা কেটে যাবে।

মন খুলে লিখেছিল তৃণা। ছমাস পরে চিঠি পেলাম তৃণার কাছ থেকে :

চা··· ····

তাং······

পরমপূজনীয় কাকাবাবু,

সর্বপ্রথম আপনি আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করবেন। * * * অনেক আশা করেছিলাম আপনি এদিকে কোন প্রোগ্রামে এলে দেখা করব। তা আর এবার হলো না। সকলে ভুলে গেলেও আপনি যেন আপনার এই হতভাগ্য মেয়েটির কথা ভুলবেন না। এবার যদিও একটু দূরে আছি, আর-জন্মে যেন আপনার ঘরে আপনার মেয়ে হয়ে জন্মাতে পারি। এজীবনে শুধু পেয়ে গেলাম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, আঘাত ও প্রতিঘাত। সব ভাগ্যটুকু খারাপ ক'রে এসেছি। শুধু একটুখানি সুকৃতির ফলে ঠাকুর পেয়েছি, আর আপনার মত ঋত্বিকের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে পেরেছি। না হলে মনে হয় এতদিন আর এ সুন্দর পৃথিবী দেখতে পেতাম না। যাক সে কথা। এ দুঃখের কথা লিখতে বসলে শেষ হতে চায় না। আগের থেকে আমি এখন অনেক ভাল আছি। * * *

কাকাবাবু, একটা কথা, আমার শুধু অনুরোধ, সবাই ভুল বুঝলেও আপনি ভুল বুঝবেন না আমাকে। তাহলে আমার আর এ দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না। * * *

ইতি—

আপনার আগের জন্মের মেয়ে

তৃণা [— মু]

আমি না হয় তৃণাকে ভুল বুঝলাম না। কিন্তু মল্লিকা তার স্বামীকে ভুল বুঝেছিল ব'লে মলয়ের দুঃখ রাখবার জায়গা ছিল না।

স্বামীকে সন্দেহ করলে

তরুণ যুবক মলয় সেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি পেয়েছে কৃতিত্বের সঙ্গে। পৈতৃক স্বচ্ছলতা অনেকের ঈর্ষার বিষয়। তদুপরী নিজের সরকারী চাকুরিটিও কম লোভনীয় নয়। মলয়ের বাবা আহ্লাদ ক'রে মলয়ের বিয়ে দিয়েছেন—বিশিষ্ট ধনীর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে।

সুখেই কাটছিল মলয় ও মল্লিকার সংসার। খুশীর ডানায় ভর করে মুক্ত বলাকার মত ভেসে চলছিল দুজনে। হঠাৎ ঘন কৃষ্ণ মেঘ জমে উঠল তাদের দাম্পত্য জীবনাকাশে। সুখের মুখে ছাই পড়ল মলয়ের নূতন প্রমোশনে।

প্রতি মাসের সিংহভাগ কেটে যায় তার বাইরে, পরগৃহবাসে। পাঁচটা জেলা জুড়ে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে যেতে হয় পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণে। ডেভালাপ-মেণ্ট স্কীম অনুমোদন ও ঋণদানের ভার মলয়ের হাতে। বহু লোকের সংস্পর্শে আসতে হয় তাকে। বিশেষ করে মহিলা কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়ের তরুণী শিক্ষিকা, মহিলা সমিতি, তন্তুবায় সমিতি, শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্র, সূচী-শিল্প শিক্ষায়তন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকাদের মলয়ের কাছে আসবার বিরাম নেই।

মলয়ও কর্ত্তব্যের খাতিরে, কখনও তাদের একক কারও সঙ্গে নির্জনে আলাপ করছে, কখনও বা পরামর্শদাতারূপে বিশেষ কোন পরিচালিকাদের সভায় পৌরহিত্য করছে। আবার কখনও কোন তরুণীকে নিজের গাড়িতে বসিয়ে নিয়েই দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে কোন সংস্থা পর্য্যবেক্ষণে।

মনে কোন প্যাঁচ নেই মলয়ের। কূটবুদ্ধি কাকে বলে তাও সে জানে না। মল্লিকার প্রতি ভালবাসার টানে এতটুকু খাঁমতি নেই তার। তবে মল্লিকার মানসিক প্রয়োজনকে মনের মত করে পূরণ করতে যে পারছে না, তা সে ভালভাবেই জানে। তার জন্য মল্লিকা যে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়, তাও মলয় বুঝতে পারে। কিন্তু সে যে নিরুপায়। পৈতৃক সম্পত্তির স্বচ্ছলতা থাকলেও চাকুরি তাকে রাখতেই হবে। আর দায়িত্বের খাতিরে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটোছুটিও করতে হবে তাকে—অন্ততঃ বিভাগীয় অধিকর্ত্তা না হওয়া পর্য্যন্ত।

মলয় নিজেই সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে মল্লিকাকে বুঝিয়ে বলেছে তার চাকুরির বর্তমান পরিস্থিতি। মল্লিকাকে একা রেখে প্রবাসে রাতকাটাতে

তারও যে কত দুঃখ তা বলতেও কসুর করেনি মলয়। কিন্তু মল্লিকা কোন জবাব দেয়নি, জবাব দিহিও করে নি মলয়কে। তবে মাঝে মাঝে এমন বঙ্কিম মন্তব্য করেছে যা হজম করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে মলয়কে, কিন্তু সে-রাত্রে আর সামলাতে পারল না নিজেকে।

বেশ ক'দিনের অফিসিয়াল ট্যুর সেরে বাসায় ফিরেছে মলয়। রাত্রে আহারান্তে দুজনে শুয়েছে পাশাপাশি। সোহাগজড়িত কণ্ঠে মলয় সবে বলেছে,—মলি, তোমার মত বুকজুড়ান স্ত্রী যদি আমার জীবনে না আসত, তাহলে—। কথা শেষ করতে পারল না। মল্লিকা ঝাঁঝাল সুরে বলে উঠল—থাক, থাক। তোমাকে আর ভণিতা করতে হবে না। তুমি ভেবেছ তোমার ঐ নেকাপনা কথায় আমি চিরদিন ভুলে থাকব। আর তুমি তোমার ছন্দা, নন্দিতার মত প্রেয়সীদের নিয়ে 'রাস' করে বেড়াবে?

বিরাট এক শেল যেন মলয়ের বুকে এসে বিঁধল। মল্লিকা এমনভাবে ভিসুভিয়াসের মত অগ্ন্যুৎগারণ করবে তা সে ভাবতেই পারেনি। বিশেষ ক'রে মল্লিকা তার পৌরুষকে লাঞ্ছিত করবে তা মলয়ের কল্পনার অতীত।

বিয়ের পরে মল্লিকাকে সব কথা খুলে বলেছে মলয়। ছোটবেলা থেকে লরেটোতে এবং পরে ইংলিশ-মিডিয়াম কো-এড্যুকেশন স্কুলে এবং কলেজে লেখাপড়া করেছে। খেলা-ধূলা, হাসি-হুল্লোড়, আমোদ-প্রমোদে বহুসময় কেটেছে মেয়েদের সান্নিধ্যে। তাই এই বয়সেও মেয়েদের সঙ্গ-সাহচর্যে এতটুকু জড়তা বা দ্বিধা নেই মলয়ের। তবে প্রতিটি মেয়েকে সে তার মায়ের প্রতিরূপ বলেই মনে করে। এ শিক্ষা পেয়েছে ছোটবেলায়—পাঠশালার প্রধান ড্রিল-শিক্ষক পাদ্রী ভুবনমোহন জানার কাছে। তাই কোন বিশেষ মেয়ের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে নিয়ে প্রবৃত্তি-উপভোগী কল্পনার জাল বোনাকেও ঐ মেয়ের মাতৃত্বকে অপমান করা হচ্ছে বলে মনে হতো তার কাছে। তাই মল্লিকার মুখে দুজন মহিলা বিশেষের সঙ্গে নিজেকে কলঙ্কজড়িত শোনায় মলয়ের আত্মমর্য্যাদা-বোধে ভয়ঙ্কর আঘাত লাগল। গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। আপন মনে বলল,—হায় ভগবান! যে আমার বুক জুড়ে বসে আছে সে আমাকে এতখানি ভুল বুঝল?

ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত গর্জন করে উঠল মল্লিকা,—খুব হয়েছে। পাঁচবছর আগে সেই বাসরঘর থেকে দেখে আসছি—তোমার মুখ এক, মন আর এক।

আমাকে যদি তোমার পছন্দই না হয়ে থাকে তবে ছলনা করবার কি দরকার ছিল? তোমার বাবাকে নিষেধ করলেই পারতে।

স্বাগত ভাবে ব্যাঙ্গোক্তি করল মল্লিকা,—আমি ওনার বুকজুড়ে বসে আছি!—একটু জোর গলায় বলল,—আমিই যদি তোমার বুকজুড়ে থাকব তবে সেবুকে ছন্দা, নন্দিতা—এরা স্থান পেল কি করে?

এবার ধমকের সুরে বলল মলয়,—কি সব আজে-বাজে কথা বলছ? এখন চুপ করে ঘুমাও।

পরবর্তী শর নিক্ষেপের জন্য যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল মল্লিকা। বালিশের তলা থেকে দুখানা মুখ-খোলা খামের চিঠি মলয়ের মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল,—এটা পড়লেই বুঝতে পারবে, আমি বাজে কথা বলছি না কাজের কথা বলছি।

চিঠি দুখানার আদ্যোপান্ত চোখ বুলিয়ে নিল মলয়। একখানা লিখেছে ছন্দা, অন্যখানা নন্দিতা। ছন্দা বিবিগঞ্জ শিল্প কো-অপারেটিভ সোসাইটির অধ্যক্ষা। বিশেষ কোন কারণে তার চাকুরি এবং সম্মান দুটোতেই টান পড়েছিল। মলয়ের বদান্যতা ও অফিসিয়াল চাতুরালী ছন্দাকে লাঞ্ছনা ও বরখাস্তের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ছন্দা তার পত্রে এতসব কথা উল্লেখ করেনি। তবে বিভাগীয় অধিকর্তার কাছ থেকে তার অনুকূলে আদেশ পেয়ে আনন্দে পত্র দিয়েছে সহ-অধিকর্তা মলয়ের কাছে। নিতান্ত আপনজনের মত উচ্ছল আবেগে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি সে।

চিঠিগুলি ব্যক্তিগত, তাই খামের ওপরে 'পার্সোনাল' লিখে মলয়ের বাসার ঠিকানায় পাঠিয়েছিল। তাই সহজেই পড়েছিল মল্লিকার হাতে।

ছন্দার পত্রের অংশবিশেষ দাগদিয়ে রেখেছিল মল্লিকা। তাতে ছন্দা লিখেছে,—আপনার মত সহৃদয় মহৎপ্রাণ পুরুষ যদি আমার জীবনে না আসত তাহলে আত্মমর্যাদা ও চাকুরি উভয়বেই হারিয়ে নিঃস্ব ভিখারিনীর মত আজ আমাকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হত। তাই কি দিয়ে যে আপনার ঋণ শোধ দেব তা ঈশ্বরই জানেন। আপনার ব্যবহার, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং সর্বোপরি নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না।

অনুরূপ আর একখানা চিঠি লিখেছে নন্দিতা। নন্দিতা বিদিশা গ্রামের সূচি-শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালিকা। সে লিখেছে,—"·· একজন উচ্চপদাধিকারী অফিসার যে সামান্যা একজন পরিচালিকাকে এত ভালবাসতে পারেন,

তার জন্য এত মমত্ববোধ থাকতে পারে তা আপনাকে না দেখলে কোনদিন বুঝতে পারতাম না। কি দিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব তা জানি না। শুধু আশীর্বাদ করুন, আপনার পরামর্শ মত কাজ ক'রে আপনাকে·· খুশী করতে পারি। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে আপনার এ ভালবাসার কথা মনে থাকবে। এ দাসীর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

আপনার সেবিকা—
নন্দিতা রায়।

দুখানা পত্রের মর্মার্থই মল্লিকা যে ভুল বুঝেছে তা বুঝতে বাঁকী রইল না মলয়ের। কিন্তু মল্লিকা এত উত্তেজিত যে এই চিঠিগুলির পশ্চাভূমি (background) এখন ব্যাখ্যা করা নিরর্থক মনে করে মলয় চুপ করে রইল।

মলয়কে নিরুত্তর দেখে মল্লিকা ভাবল যে তার সন্দেহই ঠিক। একটু খোঁচা দিয়ে বলল,—ডুবে ডুবে জল খাও, ভাব কিছুই টের পাই না? ছন্দা ও নন্দিতার জীবনেই যখন দেবতার আসন লাভ করেছ-তখন মল্লিকার জীবনকে সামনে রেখে ছল করবার কি প্রয়োজন ছিল ?

মলয় অতি সংযতভাবে বলল,—আজ ঘুমাও, কাল্ তোমায় সব খুলে বলব।

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে ব'লে উঠল মল্লিকা,—থাক, আর বলতে হবে না। তোমাদের মত কপট পুরুষকে আমি ঘৃণা করি।

নিজেকে সামলাতে পারল না। ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিল মল্লিকার গালে। বল্ল,—বাতুলতার একটা সীমা আছে। এতই যদি ঘৃণা তবে যেখানে খুশী, চলে যেতে পার। এতটুকু বাধা দেব না।—ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মলয়। মল্লিকা কাঁদতে লাগল বালিশে মুখ গুঁজে।

মলয় এসে কেঁদে পড়ল আমার কাছে। বল্ল,—এ জীবন তো দুর্বিসহ দাদা। সৎ ও সুন্দর ভাবে চল্লেও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি যে মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে তাতো আগে কখনও ভাবিনি।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলল,—মল্লিকা ও আমার মধ্যে অবিশ্বাস ও ঘৃণার প্রাচীর এত দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে—কেও কাওকে দেখতে পারছি না। উভয়ে উভয় থেকে দূরে সরে গেছি। অথচ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নও হতে পারছি না। এ এক দুর্বিসহ জ্বালা।

এই জ্বালা বোধ হয় ক্যান্সারের জ্বালার চাইতেও অসহ্য। ক্যান্সারে ক্ষত

হয় দেহের কোন অংশে। আর দাম্পত্যজীবনের জ্বালার বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করে মানুষের সমগ্র মানসিক দেহে। তাই বুঝিয়ে বললাম মলয়কে,—শুধু নিজে সৎ হলেই হয় না। নিজেকে কোন মহান সৎ-এ বা আদর্শে (Ideal-এ) বেঁধে রাখতে হয়। তাহলে জীবনেব ডিপ্লোমেসিতে কখনও ভুল হয় না। চলার পথেও পা বে-তালে পড়ে না।

দাম্পত্যজীবনের কূটনীতির [Conjugal diplomacy] কয়েকটা দিক মলয়কে বুঝিয়ে দিলাম। বললাম,—ভয় নেই! তবে মল্লিকা যাতে নিজের থেকে আমার কাছে এসে তার অশান্তির কথা খুলে বলে তার পরোক্ষ ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। সে তো আমাকে ভালভাবেই জানে। ওর বাবা আমাব বিশেষ বন্ধু।

বলা বাহুল্য, যথাসময়ে মল্লিকাও দেখা করল আমার সঙ্গে। দীর্ঘ সময় ধরে বলল তার ক্ষুব্ধ মনের কাহিনী। ছন্দা ও নন্দিতার প্রেমপত্রের অংশ বিশেষ উল্লেখ করতেও সে ভুল করল না।

নিবিষ্ট মনে শুনলাম প্রায় দেড়ঘণ্টা ধবে। বুঝলাম, মলয়ের প্রতি সন্দেহ মল্লিকার অন্তরে এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে তা উপদেশে মুছে ফেলা যাবে না। খুব জোরালো কোন টেক্‌নিকের প্রয়োজন।

টেক্‌নিক আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। প্রকৃতিও আমাকে সাহায্য করল। টেলিফোন বেজে উঠল। ডিক্‌টাফোনে মেসেজ রেকর্ড হয়ে গেল। ইয়ার-ফোন লাগিয়ে কিছুটা মেসেজ শুনে নিয়ে মল্লিকাকে বললাম,—তুমি যদি কিছু মনে না কর তবে তোমাকে বসিয়ে রেখে আমি একটু ঘুরে আসতে চাই—এই কাছেই।

বিনয় প্রকাশ ক'রে বলল মল্লিকা,—আজ্ঞে, আপনি ঘুরে আসুন। আমি বসছি।

একটা বিশেষ চিঠির ফাইল মল্লিকার হাতে দিয়ে বললাম,—তুমি বরং বসে বসে এই চিঠিগুলি পড়তে থাক। আমি কাজ সেরেই চলে আসব।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে আসতে মল্লিকা গভীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল,—জেঠু! এই চিঠিগুলি কারা কার কাছে লিখেছে। চিঠির বিশেষ বিশেষ অংশগুলি লাল কালিতে দাগ দেয়াই বা কেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে বললাম,—দাগ দেয়া অংশগুলি পড়তো মা জোরে জোরে।

মল্লিকা পড়তে লাগল :

সোহাগের জেঠুমণি আমার।

* * * তুমি আমার অন্তরের সবটুকু এইভাবে কেড়ে নিয়ে যাবে তাতো ভাবি নি। আমি যে স্বপ্নেও দেখতে পাই ; তুমি আমার পাশে বসে আছ। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করছি। সোহাগ করছি। জেঠু! তোমার কাছে যে ভালবাসা পেয়েছি, তেমনটি তো আর কারও কাছে পাই নি। * * * ইতি—

তোমারই নীল মা।

সোনা জেঠু আমার!

* * * তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি এক মুহূর্ত্ত ঘরে থাকতে পারছি না। রাত্রে ঘুমালেও শুধু তোমার মুখখানাই সামনে ভাসে। ঘুমের ঘোরে 'জেঠু' বলে ডেকে উঠি। আবার কবে আসবে জেঠু আমাদের এখানে? বল না জেঠু! আসবে তো? তোমার সোনালীকে কি দেখতে আসবে না জেঠু? একবার বল। তুমি বুঝতে পার না, তোমার সোনালীর জীবনে তুমি ছাড়া আর কেও নেই? এত আদর, এত ভালবাসা, এমন নিঃস্বার্থ মঙ্গল চিন্তা আর কারও কাছথেকে পাই নি। জেঠু! তোমার আসা চাইই—চাই !! * * * ইতি—

তোমার সোনালী

প্রিয় কাকুমণি,

* * * তুমি যে আমার জীবনে উজ্জল জ্যোতিষ্কের মত হাজির হবে এবং মধুর প্রেমের স্পর্শে আমার জীবনের কলুষ-কালিমাকে এভাবে মুছে দেবে তাতো স্বপ্নেও ভাবিনি। কাকুমণি তোমাকে আবার কবে কাছে পাব? আমি যে তোমার কথা ভুলতে পারছি না। যখন যেখানে যাই, তোমার সেই মধুর "সোনা মা" ডাক আমার পিছু নেয়। আমাকে চঞ্চল করে তোলে। কোন পুরুষের বুকে এত গভীর মাতৃস্নেহ আর কখনও তো দেখিনি। তোমার ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে আজ বুঝতে পেরেছি পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসা কত গভীর ও দিগন্তবিস্তৃত ছিল।

* * * ইতি—

তোমার সোনা মা।

জেঠু মানিক আমার!

* * * আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যেয়ে তুমি যে আমাদেরকে এভাবে ভুলে যাবে তা ভাবতে পারিনি। যদি ভুলেই যাবে, তবে মায়া ও ভালবাসায় এভাবে কেন আমায় বাঁধলে বল? এ জীবনে তোমাকে মনের মত করে পাব না জানি। তুমি বহুর জন্য, আমার একার জন্য নও। কিন্তু বুঝতে পার না জেঠু—তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা? তোমার চিঠির এক একটি ছত্র যে আদর-সোহাগের ফাগ বহন করে নিয়ে আসে আমি নীরবে বসে তার স্পর্শ অনুভব করি। তুমি হাতধরে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাকি আমি ভাবতে পারি না? * * * ইতি—

তোমার অভাগী মা
হাসি মণি।

আর পড়তে না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এই চিঠিগুলি পড়ে তোমার কি মনে হচ্ছে বলতো মা।

বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল,—এ চিঠিগুলি কে কার কাছে লিখেছে?

মৃদুহেসে বললাম—মূল চিঠিগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে। এগুলি তো Xe-rox Copy. পড়ে তোমার কি মনে হল তাই বল।

স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বলল মল্লিকা,—চিঠির প্রত্যেকটি ছত্রে ফুটে উঠেছে পবিত্র ভালবাসারস্পর্শে উদ্বেলিত অন্তরের গভীর উচ্ছ্বাস। যাকে লেখা হয়েছে তিনি প্রত্যেকটি লেখিকার জীবনে পরম আপনার জন বলে প্রতিভাত হয়েছেন।

চিঠিগুলি পরপর সাজাতে সাজাতে জিজ্ঞাসা করলাম,—এগুলি তরুণ প্রেমিকের কাছে তরুণী প্রেমিকার লেখা প্রেমপত্র বলা যেতে পারে?

—হ্যাঁ তা বলতাম। বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বল্‌ল মল্লিকা,—ভাবের অভিব্যক্তিতে প্রেমপত্রকেও ছাপিয়ে গেছে। তবে পত্রের প্রথমে "জেঠু" বা "কাকু" সম্বোধন এবং শেষে ইতি "নীলমা", "সোনা মা", "অভাগী মা" থাকায় বেশ বুঝতে পারছি এগুলি তথাকথিত লাভলেটার নয়।

ফাইলটা বন্ধ করে মল্লিকার মুখোমুখী হয়ে বসলাম। বললাম,—তাহলে বলা যেতে পারে যে ভালবাসার স্পর্শে মানুষের হৃদয়ে যে ভাব ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় তার যে বাচনিক অভিব্যক্তি তার একটা সার্বজনীন রূপ আছে। তা শুধু তথা কথিত প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেই সীমা-বদ্ধ থাকে না? "আমি তোমায় ভালবাসি",-

"তোমার মত ভালবাসা আর কারও কাছ থেকে পাইনি", "তুমি আমার হৃদয়ের সবটুকু কেড়ে নিয়ে গেছ", "তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কেউ নেই", তোমার মত মহান পুরুষ আমার জীবনে তো আসেনি", "তোমাকে আমি কোনদিন ভুলতে পারব না," ইত্যাদি ধরণের বাচনিক অভিব্যক্তি শুধু যে তথাকথিত প্রেমিক বা প্রেমিকাই লিখতে পারে তা নয়? আন্তরিক ভালবাসার স্পর্শে, দয়া, করুণা, বা অনুকম্পার ছোঁয়ায় মানুষের অন্তরে যে তৃপ্তির ঝঙ্কার ওঠে তার সুরমূর্চ্ছনা সর্বকালে, সর্বক্ষেত্রে, সকল হৃদয়ে যে এক তা কি স্বীকার কর?

চেয়ারটা একটু সামনের দিকে সরিয়ে নিয়ে মল্লিকা বলল,—এই চিঠিগুলি পড়ে স্বীকার করতেই হবে।

এবারে ঐ চিঠিগুলির মূল চিঠির ফাইলটা মল্লিকার সম্মুখে খুলে ধরলাম। চিঠিগুলির প্রথম ও শেষ পংক্তিগুলিতে চোখ বুলিয়ে নিল মল্লিকা। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। বলল—আপনাকে এত মেয়ে এত গভীরভাবে ভালবাসে? অবাক হয়ে যাচ্ছি!—পেছনের ঠিকানায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,—আপনি এদের অন্তরে এত গভীর শ্রদ্ধার আসনে বসে আছেন! এতে কামনার লেশমাত্র নেই; কামের পূতিগন্ধ নেই। আছে গভীর ভালবাসার অনাবিল স্বীকৃতি, আর অন্তরের অন্তস্থলে রয়েছে, আপনাকে তাদের কাছে পাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

এবারে মলয়ের কাছে লেখা ছন্দা ও নন্দিতার চিঠি দুখানার অংশ বিশেষের Xe-rox Copy মল্লিকার হাতে দিয়ে বল্‌লাম—এই দুখানা পড়তো মা। দুটি মেয়ে লিখেছে।

চিঠি দুখানায় চোখ বুলিয়ে নিল মল্লিকা। সহজভাবে বলল,—এতো ঐ একই ধরণের চিঠি ওঠু! যাকে লেখা হয়েছে তার কাছ থেকে এমন কোন উপকার, এমন ভালবাসা পেয়েছে যা প্রকাশ করতে লেখিকা নিজেকে অভিব্যক্তির তথাকথিত বাঁধনের মধ্যে সীমিত রাখেনি। প্রাণভরে মনের আবেগ প্রকাশ করেছে। এতে কোন পাপ নেই।

এবার ড্রয়ার থেকে মূলচিঠি দুখানা বের ক'রে মল্লিকার হাতে দিয়ে বললাম,—দেখ তো মা এতে কোন পাপ আছে কি না।

চিঠি দুখানাতে চোখ বুলিয়েই গম্ভীর হয়ে গেল মল্লিকা। একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমিও নির্বাক। দেখছি, মল্লিকার বড় বড় চোখদুটি

জলে ভরে উঠল। ঠোঁটদুটি মৃদু কাঁপতে লাগল। আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল,—আমাকে ক্ষমা করুন জেঠু। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। এ অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত?

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—নিজের ভুল যে বুঝতে পেরেছ এইটেই যথেষ্ট। মাথা ঠাণ্ডা করে যদি মলয়কে চিঠির বিষয় জিজ্ঞাসা করতে তাহলে জল এতদূর গড়াত না। মনে রেখো, পাত্র পূর্ণ থাকলে তাতে আর কিছু ধরে না। তোমার প্রাণ উজাড় করা ভালবাসায় মলয়ের বুক যদি ভরা থাকে, মলয়ের তৃষ্ণার তৃপ্তি যদি হয়ে থাকে তবে সে আর কোন পাত্রের জলে মুখ দেবেনা।

আবেগ ভরে মল্লিকা বলল,—আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন জেঠু! আমি যেন তেমন করেই স্বামীকে ভালবাসতে পারি।—গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

সুখী দাম্পত্য-জীবন রূপায়নে কার দায়িত্ব বেশী?

কিন্তু উঠতে চাইল না প্রশান্ত ও পারুল। দুজনেই আবদার করে বলল—এই প্রশ্নের মীমাংসা না করে আমরা উঠব না।

প্রশান্ত সুর ও পারুল নন্দী। দুজনেই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র। দুজনারই গবেষণার বিষয়—সুখী দাম্পত্যজীবন রূপায়নে কার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ—স্বামীর না স্ত্রীর?” প্রাচ্য দেশে, বিশেষ করে ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যই দুজনে ভারতে এসেছে গতমাসে। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে তারা এ-বিষয়ে যে ডেটা সংগ্রহ করেছে তা বিশ্লেষণ ক'রে কেউই সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না, সুখী দাম্পত্যজীবন রূপায়নে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের সিংহভাগ কে বহন করবে। তাই দুজনেই আবদার করে বলল,—এ-বিষয়ে আপনার অভিমত জানতে চাই।

আমি বললাম,—তোমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও 'ডেটা' থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ তা আগে বল। আমার অভিজ্ঞতার কথা নিশ্চয়ই বলব।

হাতের নোটবুকখানা টেবিলে রেখে একটু নড়ে বসল পারুল। বলল,—স্বামী মানে প্রভুও হয়। বাস্তবে দেখাও যায় তাই। নিজের মত, পথ ও পছন্দ স্ত্রীর ওপরে চাপিয়ে দিয়ে স্বামীরাই প্রভুত্ব করে স্ত্রীদের ওপরে। তা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে স্বামীর দায়িত্বই বেশী হওয়া উচিত। আবার, মাষ্টার বা শিক্ষক হিসাবে স্ত্রীর অজ্ঞতাকে দূর ক'রে, তার ভুল ভ্রান্তিকে

নিরসন ক'রে তাকে সংসারের সর্বক্ষেত্রে দক্ষ ক'রে তোলবার দায়িত্ব স্বামীরই থাকা উচিত। কারণ, সাধারণতঃ স্ত্রীর চাইতে বয়সে, জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়—সবদিক থেকে—স্বামীই শ্রেষ্ঠ বা বরনীয় হয়ে থাকে। তাইতো ভারতীয় সমাজে স্বামীকে মেয়ের 'বর' বলা হয়ে থাকে।

একটু থেমে বলতে লাগল পারুল,—একটা মেয়ে তার আজন্মের আবাস, মা, বাবা, ভাই, বোন, প্রভৃতি প্রিয়জন ও পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা মানুষের হাত ধরে নূতন পরিবেশে উপস্থিত হয়। তার অক্ষমতা, অজ্ঞতা বা ভুলভ্রান্তি সয়ে বয়ে সংসারের উপযোগী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব স্বামী যদি উপেক্ষা করে তাহলে দাম্পত্যজীবনে অশান্তি হবেই। কি তাইনা ?—প্রশান্তর দিকে তাকাল তার সমর্থনের আশায়।

প্রশান্ত নীরব। পারুলের বলা শেষ হলে তবে সে তার অভিমত ব্যক্ত করবে।

পারুল বলল,—যে পুরুষ স্বামী হিসাবে তার কর্ত্তব্য দায়িত্ব সচেতন, যে স্বামী তার হৃদয় ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে স্ত্রীকে মনের মত করে গড়ে নিতে পারে,—তার দাম্পত্যজীবনে অশান্তি প্রবেশের কোন পথই খোলা থাকে না—স্ত্রী যতই অপটু বা বেয়াড়া হোক না কেন। তোমার অভিমত কি ?

চেয়ারখানা সরিয়ে নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে বসল প্রশান্ত। উদ্দেশ্য পারুল ও আমার উভয়ের মুখ দেখে কথা বলবে। বলল প্রশান্ত—আমি পারুলের সঙ্গে কিছুটা একমত। কিন্তু সবটুকু মানতে পারছি না। পারুল যা বলল তাতে এই অনুসিদ্ধান্তে আসতে পারি যে স্বামী যদি শুধু প্রভুত্বই করে, স্ত্রীর প্রতি করণীয় সম্বন্ধে অজ্ঞ, অনিচ্ছুক বা উদাসীন হয়; অথবা নিজের ব্যক্তিত্ব ও ভালবাসা দিয়ে স্ত্রীকে মনের মত ক'রে গড়ে নিতে না পারে তবে তাদের দাম্পত্যজীবনে অশান্তি হবেই। কোনদিন সুখ পাবে না তারা।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোন স্বামী যদি তাইই হয়, অর্থাৎ স্ত্রীকে মনের মত ক'রে গ'ড়ে নিতে নাইই পারে সে ক্ষেত্রে তার স্ত্রী-বেচারী কি করবে ? সারাজীবন নীরবে দুঃখ-জ্বালা-অশান্তি ভোগ করবে, না দাম্পত্যজীবনের জঞ্জাল এড়াবার জন্য ঐ স্বামী পরিত্যাগ করবে ? প্রথমটি কাম্য নয়, দ্বিতীয়টি সমাধান নয়। মানুষ পেতে চায় তার কাম্য, আর উপভোগ করতে চায় সমাধান—সমস্যা নয়। এই চাওয়া আছে বলেই প্রকৃতি (Nature) নারী-প্রকৃতিকে তেমনইভাবে তৈরী করেছে।

—নারী মানেই 'নারয়তি ইতি নারী'। অর্থাৎ যে বা যিনি ধারণ ক'রে পোষণ পুষ্টি দিয়ে জীবনকে বৃদ্ধির পথে তুলে ধরেন সে বা তিনিই নারী। প্রাচীনতম ভাষায় নারী শব্দের যখন প্রচলন হয়েছিল তখন তার অর্থছিল 'পারিবারিক বিষয়ে নেত্রী।' ভোগবিলাস সঙ্গিনী রমনী বা কামিনী শব্দের বিকল্প হিসাবে নারী শব্দ ব্যবহার হতো না।*

—তুমি লক্ষ্য করে দেখো,—একটা কিশোরী তার সমবয়স্ক কিশোব অপেক্ষা বহুবিষয়ে শ্রেষ্ঠা। মানসিক স্থৈর্য্য, নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা, অপরিচিত পরিবেশ ও পরিজনের ওপবে আধিপত্য কববার দক্ষতা, নীতিবোধ, বিবেক, বিরুদ্ধপরিবেশেব চাপ সহ্য করবার শক্তি, সাংসাবিক বিষয়ে নেতৃত্ব দানকববার বুদ্ধি এবং সর্বোপরি স্নেহ-মায়া-মমতা ও সেবা সাহচর্য্যে পরজনকে আপন ক'রে নেবার স্বাভাবিক আবেগ কিশোরীব জীবনে অনেক বেশী।

—সব চাইতে বড কথা, প্রকৃতি নারীকে যে মহাসম্পদে ভূষিত করেছেন সে সম্পদ তো আব কারও নেই। তা হচ্ছে নারীর অন্তরে 'পোষণ-প্রদীপনাব' আবেগ [urge for enlightening nurture]। নাবী যেভাবে জীবনকে প্রেরণাপ্রবুদ্ধ করতে পারে অমনতরভাবে আব কেও তা পারে না। আব, এতথ্য শিশুর জীবনের পক্ষে যেমন সত্য, একজন স্বামীর জীবনের পক্ষেও তেমনই সত্য। ক্ষুধার্ত্ত, শ্রান্ত, বা বেদনাহত শিশু যেমন আহাব, বিশ্রাম ও সান্ত্বনার আকাজ্ক্ষায় মাতৃঅঙ্কে আশ্রয় চায়, ঠিক তেমনই স্বামী তাব কর্মজীবনের ক্লান্তি, শ্রান্তি, হতাশা ও ব্যর্থতার বেদনাথেকে মুক্ত হবার আকাজ্ক্ষায় তার স্ত্রীর কাছে স্বতঃই আশ্রয় আশা করে। তা যখন স্ত্রীর কাছ থেকে পায় না, তখন স্বামীর ক্ষুব্ধ অহং সংঘাত সৃষ্টি করে। সংসারে নেমে আসে অশান্তি।

—অপরপক্ষে, স্ত্রী যদি মায়ের মত স্নেহসিঞ্চনে, ধরিত্রীর মত ক্ষমাসুন্দর অনুকম্পায়, দাসীর মত সেবা-পরিচর্য্যায়, স্বামীর ভ্রান্তি, ক্লান্তি ও শ্রান্তিকে দূর ক'রে সখির মত রঙ্গরসে স্বামীকে ব্যর্থতার বেদনা থেকে মুক্ত ক'রে, মন্ত্রীর মত শুভসন্দীপী পরামর্শে তাকে পুণবায় কর্ম্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলে, তবে সে দম্পতির সংসারজীবন যে চিরসুখের আগর হবেই তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই—তা স্বামী যত খারাপই হোক না কেন!

শ্রীকরুণা সিন্ধু মুখোপাধ্যায়: উদ্বর্ধনে নারী, 8th edn. P—8.

তাই আমার মনে হয় স্ত্রীর ভূমিকার গুরুত্বই বেশী। কি বলেন মাষ্টার-মশাই ?—আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রশান্ত।

প্রশান্তের মুখে 'মাষ্টারমশাই' সম্বোধনটুকু বড় মধুর লাগল। সেই কতবছর আগে স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়েছিল আমার কাছে। এখন সে একটা পি.এইচ.ডি করেছে। পোষ্ট-ডক্টোরাল বৃত্তি নিয়ে গবেষণা করছে সুদূর আমেরিকায়। কিন্তু ভারতীয় রীতির সেই সম্বোধনটুকু ভোলেনি প্রশান্ত।

পারুল উগ্রীব হয়ে আছে আমি কি বলি তা শুনবার জন্য।

কি আর বলব? প্রশান্তকে প্রশ্ন করলাম,—পারুল যা বলেছে তা কি ঠিক ?

—তা ঠিক। ও যা বলেছে তা অস্বীকার করিনা।—প্রশান্ত বলল—কিন্তু আমি যা বললাম পারুল কি তা অস্বীকার করতে পারবে ?

সঙ্গে সঙ্গে ডানহাতের তর্জ্জনী উঁচিয়ে পারুল বলে উঠল,—আমি তো অস্বীকার করছি না। প্রশান্ত যা বলল তাও ঠিক বলে মনে হয়। এখন আপনি কি বলেন ?—আমার মুখোমুখী ঘুরে বসল পারুল।

টেপ রেকর্ডের সুইচ্‌টা অফ্‌ করে দিয়ে বললাম,—ভাত রান্না করতে জলের গুরুত্ব বেশী না আগুনের গুরুত্ব বেশী ? কে বলতে পারে ?

দুজনে সমস্বরে ব'লে উঠল—উভয়ের গুরুত্বই সমান।

প্রশান্ত বলল—চাউল সিদ্ধ করে ভাত করতে হলে আগুন ও জল উভয়ের ফাঙ্‌শানই অপরিহার্য একটিকেও নিষ্ক্রিয় হলে চলবে না।

হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পারুল। চেঁচিয়ে উঠল,—ইউরেকা! ইউরেকা!! আই গট দি অ্যানসার। একটা অন্যটার পরিপূরক। কি বলেন ?

দ্যাটস্‌ রাইট।—পারুলকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে বললাম—তুমি ঠিক ধরেছ। সুখী দাম্পত্যজীবন রূপায়নের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। তোমারা স্বামী এবং স্ত্রীর পৃথক পৃথক যে বৈশিষ্ট্যের কথা বল্লে তা প্রকৃতি প্রদত্ত। আমার মনেহয় প্রকৃতির দেয়া এই বৈশিষ্ট্য এবং দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যদি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে তাহলে দাম্পত্যজীবনে অশান্তি আসতে পারে না। দাম্পত্যজীবন সুখ-সিদ্ধ হবেই। তবে যদি বল কে সইবে বেশী ? আমি বলব, যার বুকে জ্বালা বেশী। যার জ্বালা বেশী তারই তো পালা (দায়) হবে সে জ্বালা নেভাবার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠা।

তাইতো সেদিন বুকে জ্বালা নিয়ে ছুটে এসেছিল প্রীতিকণা। আমাদেরই গ্রামের মেয়ে প্রীতিকণা। যখন ও ফুলের 'ল' এবং 'পেয়ারা'-এর 'রা' বলতে নারাজ, ছোট্ট হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলত,—দাদা 'ফু' দে, 'পেয়া' দে, তখন থেকে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা।

স্বামী ভাল না বাসলে

দুবছর আগে বিয়ে হয়েছে প্রীতিকণার। বিয়েব পরই স্বামী সুখেন বদলি হয়ে যায় জব্বলপুরে। প্রীতিকণাও চলে যায় স্বামীর সঙ্গে। বিয়ের সময় সেই যা দেখেছি প্রীতিকণাকে। আর কোন যোগাযোগ নেই এই দুবছরে।

হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকল প্রীতিকণা। হাতে একখানা স্টেটসম্যান্ পত্রিকা। আমি তো অবাক। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম,—আরে! কণি না? ওর ছোটবেলায়, 'কণি' বলেই ডাকতাম ওকে।

কোন জবাব দিলনা প্রীতিকণা। আমার সামনে মেঝেতে ঢিপ ক'রে মাথা ঠেকিয়ে বলল—তুমি কেমন আছ দাদা?

হাতখানা টেনে ধ'রে উঠিয়ে বসালাম আমাব চৌকির ওপরে। বল্লাম,—আমি ভো ভাল আছি। তা তুই শ্রবামপুবে কেমন কবে? আমাব খোঁজই বা পেলি কার কাছে?

হাতের সংবাদ-পত্রখানা দেখিয়ে বল্ল—মেসোর জন্য কাগজ কিনতে স্টেশনে এসেছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম মাইকে তোমার নাম ঘোষণা হচ্ছে। তুমি নাকি আজ সন্ধ্যায় টাউনহলে বক্তৃতা দেবে। ওদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তুমি এই চৌধুরী বাড়ীতে আছ। এ-বাড়ীর ছোট মেয়ে কবিতাকে তো আমি পড়াই! কবিতাই তো তোমার ঘর দেখিয়ে দিল। তোমাকে যে এত কাছে পাব তাতো ভাবতেই পারি নি।

—তোরা কি আবার বদলী হয়ে ক'লকাতায় এসেছিস?

প্রীতিকণা নীরব। মুখ নিচু ক'রে কি যেন ভাবছে। বল্লাম—তোর কর্ত্তা কোথায়?

নিচুমুখেই বলল প্রীতিকণা—সে জব্বলপুরেই আছে। আমি গত ছ মাস মাসীমার কাছে চলে এসেছি।

—সে কি রে! বিস্মিত হলাম।—সুখেন জব্বলপুরে! তুই শ্রীরামপুরে!! আবার চৌধুরী বাড়ীতে প্রাইভেট পড়াচ্ছিস!!!—অজানা আশঙ্কায় বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগল। ওর নতমুখ খানা তুলে ধরে বললাম,—কি হয়েছে রে কণি?

কাতর-চাহনী তার চোখে। বর্ষার প্লাবনের মত চোখের দুকূল ভাসিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে দু'গাল বেয়ে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল প্রীতিকণা। বাধা দিলাম না। বর্ষণ হলে মেঘ হাল্কা হয়। চোখের জল ঝরে গেলে বুকের বেদনাও হাল্কা হতে পারে ভেবে চুপ ক'রে রইলাম।

বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে নিজেকে সামলিয়ে নিল প্রীতিকণা। দীর্ঘ দুবছরের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করল সবিস্তারে। বলল—দাদা! স্বামীর ভালবাসার স্বাদ যে কেমন তা একদিনের জন্যও বুঝলাম না। যে সংসারে গেছি সেখানে আমার স্থান ঝিয়ের চাইতে একটু ওপরে। স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় শোবার অধিকারটুকু আমার আছে, যা ঝি-এর থাকে না। এছাড়া—। আবার এক পশলা ঝরে পড়ল অশ্রুধারা।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল,—আপ্রাণ চেষ্টা করেছি ওকে খুশী করবার। ওর পছন্দ, অপছন্দ রুচি ও প্রয়োজন, যেমন বুঝেছি ঠিক তেমনই করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এতটুকু মন পাই নি। সব সময় আমার প্রতি কেমন একটা উদাসীন ভাব। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে একটা সহজ ভাললাগার ভাব থাকে, তা কোনদিন ওর আচরণে প্রকাশ পায়নি। বরং এই কথাই মনে হয়েছে যে আমার অভাব ওর ভেতরে কোন ভাবান্তর সৃষ্টি করবেনা।

ক্রমশঃ আমার মনও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ক্ষুব্ধ মনের বহিঃপ্রকাশ যে হতো না তা নয়। তখন অশান্তি হতো। এইভাবে কদিন আর চলে বল? তাই চলে এলাম ভাগ্যের পরিহাসকে মেনে নিয়ে।

মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললাম—দূর পাগলী। এত অল্পে অধৈর্য্য হলে কি আর চলে? চ'লে তো এলি। তারপর? সারাজীবন কাটাবি কেমন করে?

অসহায় কণ্ঠে বল্ল প্রীতিকণা,—তাই তো তোমার কাছে ছুটে এসেছি। পেটের জন্য তো ভাবি না। এখানে গার্লস্ স্কুলে ভাল চাকরি পেয়েছি। কিন্তু বুকের মধ্যে যে ফাঁকা লাগে। মনে হয় কি যেন নেই আমার। এখন কি করব তাই ব'লে দাও দাদা!

বলব ব'লেই তো নানা প্রশ্ন ক'রে জেনে নিলাম সুখেন সম্বন্ধে।

সুখেনের স্বভাবটাই একটু গুরুগম্ভীর। কথাবার্ত্তা খুবই কম বলে। আসল কারণ তার কলেজের বান্ধবী মধুমিতা।

মধুমিতা মুখার্জী। পড়াশোনা শেষে একই এ. জি. বেঙ্গল অফিসে চাকরি করত দুজনে। সুখেন তাকেই বিয়ে করবে। কিন্তু সুখেনের বাবা গোঁড়া

বৈষ্ণব। বর্ণে মাহেষ্য ক্ষত্রিয়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ছেলেকে,—বামুনের মেয়ে ঘরে আনলে, এঘরের ভাত আর গ্রহণ করবেন না।

তাই বিয়ে ক'রে মধুমিতাকে ঘরে আনেনি সুখেন। কিন্তু ঘরেও মন বসে না তার। বাবার পছন্দের প্রীতিকণাকে অপ্রীতিকর বলেই মনে হয় তার কাছে।

ভাবান্তরে ওর মনটাকে হালকা করার অভিপ্রায়ে সোহাগজড়িত কণ্ঠে সুর ক'রে গাইলাম—

আমার প্রীতিকণা চাঁদের কণা
ফুলঝুরি তার চোখে ;
হাসির ছোঁয়ায় পুলক জাগায়
তৃপ্তিহারা বুকে।

হেসে বললাম—ভেতরে যাও, দেখগে কে এসেছে।

ওমা! বৌদি এসেছে বুঝি? উৎফুল্লকণ্ঠে বলল প্রীতি কণা—কবিতা বলেনি তো! দেখা ক'বে আসি।—বাড়ীর ভেতরে উঠে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম—কি বলা যায় প্রীতিকণাকে।

আমার বলবার অপেক্ষায় ওকে আর থাকতে হল না। ওর বৌদিই ওকে স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে কেমন ক'রে স্বামীর ভালবাসা বঞ্চিতা হয়েও স্বামীর 'ভালতে বাস' করা যায়। তাই শ্রীরামপুরের বাসা তুলে দিয়ে যথাসময়ে জব্বলপুরে ফিরে গেল প্রীতিকণা।

ছু'মাস পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। দেখা করতে পারছে না বলে দুঃখ ক'রে পত্র লিখেছে প্রীতিকণা—তার বৌদির কাছে—খুশীর সংবাদ :

" * * * বৌদি! তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। পাওয়ার আশায় দিলে দেওয়াটা ফলপ্রসূ হয় না। এতদিন সেবা দিয়েছি ওর ভালবাসা পাবার আশায়। তাই তো না পেয়ে ক্ষোভে মনটা ভরে উঠত। এবার আর তা করিনি। আমাকে ভালবাসে কি না, কতখানি ভালবাসে তার হিসাব-নিকাশ করিনি। অন্যের ভালবাসার সঙ্গে ওর ভালবাসার তুলনাও করিনি। শুধু দিয়েছি—অঢেল দিয়েছি।

"তোমার কথামত ওর প্রয়োজনের পথ দিয়েই ওর সান্নিধ্যে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছি। সকালবেলায় বেড্-টী থেকে শুরু ক'রে রাত্রে শোবার পর হাতে-পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া পর্য্যন্ত যখন যা প্রয়োজন তা না চাইতেই

যথাসময়ে যোগান দিয়েছি। জামা-কাপড় কেচে, ইস্ত্রী ক'রে সেটুকে সেট থরে থরে সাজিয়ে রেখেছি। ওর অজ্ঞাতে জুতো জোড়া এমন করে পালিশ ক'রে রেখেছি যে বাইরে পালিশ করাতে হয় নি একদিনও। খাবার সময় সারাক্ষণ কাছে বসে হাওয়া করেছি। হাত ধোয়ার জল হাতে ঢেলে দিয়েছি। যত কাজই থাক, অফিসের পোশাক নিজে এসে হাতে তুলে দিয়েছি। অফিস থেকে ফিরে এলে হাতের কাজ ফেলে ছুটে গেছি কাছে। একবারও কাছে টেনে নেয় নি ভুলেও। তবুও অভিযোগের ঢেউ ওঠে নি মনে। তোমার কথাগুলি মনে ক'রে আর দাদার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে করেছি সব।

"ভুলেও মধুমিতার কথা মুখে আনি নি। রাত্রি বারটায় বাসায় ফিরলেও কৈফিয়েৎ চাই নি একটি বারও। জানি, সে মধুমিতাকে নিয়ে সিনেমায় গেছিল। তবুও বলি নি কিছু। করণীয় যা তা করেছি হাসি মুখে।

"হঠাৎ বুঝি ওর বুক থেকে, উদাসীনতার হিমেল হাওয়ায়, জমাট বাঁধা তাচ্ছিল্যের বরফ গলতে শুরু করল। যেন ফাগুনের মলয় হিল্লোলে নেচে উঠল ওর হিয়া। আড় চোখে চাইল আমার দিকে। সে চাহনী শুকনো নয়। ত্বকুল ভরে উঠেছে মমতায়। বোধহয় মায়া হয়েছে আমার ওপরে। বৌদি, অবাক হবে শুনে। গত দুদিন আগে জিজ্ঞাসা করল—তুমি আমার জন্য এতসব কর, আমি তো তোমাকে কিছুই দেই নি প্রীতি।'

"আমি বলেছি—তোমাকে সেবা করবার অধিকার দিয়েছ এই আমার যথেষ্ট। বুকের কাছে টেনে নিল, আদর করল। জীবনে এই বুঝি প্রথম। অবাক হচ্ছ, না বৌদি ? আরও কিছু- কানে কানে বলব। কেমন ?

"বৌদি তোমার উদাহরণটা খুবই ঠিক। সব জায়গায় একই লেভেলে পানীয় জল পাওয়া যায় না। বলেছিলে,—কোথাও বেশী গভীর পর্যন্ত বোরিং করতে হয়। তেমনই কোন কোন পুরুষের অন্তর গভীরে প্রবেশ না করতে পারলে তার বুকের ভালবাসায় তৃষ্ণা মেটান যায় না। দাদাকে বলো, আমি তার কৃতী ছাত্রী। সত্যি বৌদি ওর (সুখেনের) বুকে যে এত ভালবাসা লুকান ছিল তা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত।"

সুরমাও প্রত্যাশা করে নি যে সামান্য একটা ছোট্ট ঠাট্টা তাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রীতির বন্ধনে এমন ফাটল ধরিয়ে দেবে। বিজন যে এত রেগে যাবে তা ভাবতেও বিস্ময় মনে হচ্ছে সুরমার।

স্বামীর বিরক্তি ও ক্রোধে

বিজন বয়াড়ু। খুবই স্মার্ট তরুণ যুবক। অল্পবয়সে পিতৃ-

বিয়োগ ঘটেছে। তাই সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে তাকেই। দুটি বোনকে পাত্রস্থ করেছে নিজের সামর্থ্যে। কোনমতে ভাই দুটিকে দাঁড় করিয়ে নিজে ঋণের চাপে বসে পড়েছে মাটিতে। তদুপরি মা, বোঝার ওপরে শাকের আটি চাপাবার মত, সুরমাকে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, পরপারে যাত্রার প্রাক্কালে। সেও কি এখন একা? তিনে-একে-চারে পড়েছে গত ফাল্গুনে। এই পাঁচজনের সংসার। তদুপরি আছে আত্মীয় স্বজন, অতিথি অভ্যাগতদের আনা গোনা। তাই গোনা পয়সায় টান পড়ে প্রতি মাসে। কিছু এদিক সেদিক করে নিজের শখ আহ্লাদ যে পূরণ করবে তার আর কোন উপায় নেই বিজনের।

বিজনের সহকর্মী যারা তারা প্রায় সকলেই রঙ-মিলান স্যুট পরে অফিসে আসে। বিজনেরও বহুদিনের সাধ। কিন্তু বাধা পড়ে বাঁধা পয়সার বাজেটে। গত দুবছর ধরে একটু একটু করে জমিয়ে স্যুটের কাপড় কিনে দিয়েছে দর্জ্জির ঘরে। কিন্তু মজুরি আর জোগাড় করতে পারে না। তাই ডেলিভারী নিয়ে স্যুটও ঘরে আনতে পারে না গত মাস থেকে।

মওকা মিলেছে আজ। ওদের ডিপার্টমেণ্টের যারা ট্রেনিং-এর জন্য মহীশূর যাবে তারা প্রত্যেকেই দু'শ টাকা রাহা খরচ পেয়েছে অফিস থেকে। রেলের পাশও পেয়েছে সাথে। তাই ছুটির পরে বিজন সোজা চলে গেল বিড্‌ন স্ট্রীটে। ট্রায়াল রুমে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার দেখে নিল স্যুটটি ফিট্ করেছে কি না। সুন্দর মানিয়েছে তাকে। মনে মনে ভাবল বিজন,—সুরমা ভাবে আমি স্মার্ট না। আজ দেখবে যে পয়সা থাকলে সকলেই স্মার্ট হতে পারে। তাই পরনের পোশাক ব্যাগে ভরে ঐ স্যুট পরেই সোজা চলে এল বাসায়। চুপি চুপি ঘরে ঢুকে পেছন থেকে চোখ টিপে ধরল সুরমার। সুরমা হঠাৎ তাকে দেখে অবাক হবে তাই এত সব পরিকল্পনা।

চেনা স্পর্শ সুরমার। আঙুলগুলি সরিয়ে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল বিজনের। বলল,—ও মা! এ কে গো? এ যে মনে হচ্ছে আমার খোদ বড় সাহেব!—কোটের বোতাম ও প্লেটগুলিতে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল,—খুব সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে।

বিজন আর একবার সোজা হয়ে দাঁড়াল ঘরের ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে। জিজ্ঞাসা করল,—রঙটা তোমার পছন্দ হয়েছে?

খুব পছন্দ হয়েছে।—বিজনের গালে একটা সোহাগের টোকা দিয়ে বলল,

সুরমা,—তোমার পছন্দ হয়েছে তা আমার পছন্দ হবে না।' তা বাপু তুমি তো একদিনও বল নি আমাকে যে স্যুট বানাতে দিয়েছ? কৃত্রিম অভিমানের সুর সুরমার কণ্ঠে।

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল, বিজন,—হাতে পাব তবে তো বলব? জান না কবি কি বলেছেন?

কী? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল সুরমা।

সুরমার চিবুকটায় ঝাঁকি দিয়ে বলল বিজন—কবি বলেছেন:

"There are thousands of slips
Between a cup and lips."

হেসে ফেল্‌ল সুরমা। চোখের সামনে ভেসে উঠল গত রবিবারের ঘটনা: মুখের কাছে আসবার আগেই বিজনের হাত থেকে স্লিপ ক'রে ছড়িয়ে পড়েছিল দৈ-এর ভাণ্ড।

রবিবারের সকাল। বাজারে বেরুচ্ছে বিজন। সুরমা বলল—আধাসের আলু বেশী নিয়ে এস। ছেলে-মেয়েরা শুধু রুটি খেতে চায় না। শুধু নুন-হলুদে আলুর ঝোল হলে সোনামুখ ক'রে খেয়ে নেয়।

চেঁচিয়ে উঠল বিজন,—অত পয়সা আমার নেই। তিনবেলা তরকারি যোগান দিতে পারব না। আলুর দাম কি কম?—গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল বাজারের থলি হাতে।

কি আর করবে সুরমা। রুটির সঙ্গে একটু সরিষার তেল ছুঁইয়ে তাতে লবন ঘসে তুলে দিল ছেলে-মেয়েদের হাতে। নিজের জন্য বরাদ্দও তাই্‌ই। কর্তার জন্য ভেজে রেখেছে বাগান থেকে তুলে আনা ছোট্ট একটা বেগুন।

আধা ঘণ্টা পরে বাজার করে ফিরে এল বিজন। একহাতে সবজির থলি, অন্য হাতে একভাণ্ড দৈ। বলল,—এই নাও, ছেলে-মেয়েকে দৈ-রুটি খেতে দাও।

সুরমা বোঝাবার চেষ্টা করে: আধা কিলো আলু বেশী আনতে পারলে না। চেঁচিয়ে উঠলে। অথচ আধা কিলো দৈ নিয়ে এলে! ঐ টাকায় যে বারদিনের সকালের তরকারির আলু হয়েযেত!

বিজন বুঝতে চায় না সুরমার দৃষ্টিকোন থেকে। সে বোঝে ফুড-ভ্যালু। বলল,—আলুতে কিছু আছে নাকি? সাহেবরা তো হাসে আমাদেরকে ভাত আর আলু এক সাথে খেতে দেখলে। দৈ-এর দাম বেশী ঠিকই। কিন্তু এতে

পুষ্টিও কত বেশী। তাছাড়া আমি কি আর কিনেছি? হরিহর নিজেও কিনল, আমার ঘাড়েও চাপাল এক ভাড়। নিজের পকেট থেকেই টাকা বের করে দিল। দুই তারিখে টাকা দিলেই চলবে। দৈ নাকি পেটের পক্ষে ভাল। ধর, নাও।—হাত বাড়িয়ে রাখতে গেছে তাকের ওপরে। অমনি হাত থেকে স্লিপ ক'রে ভাণ্ডটা পড়ে গেল মেঝেতে। ছত্রাকারে ছিটিয়ে পড়ল আধা কিলো দৈ।

আহা, বরাতে নেই বলে অপ্রস্তুত হয়ে রান্নাঘর থেকে চলে গেল বিজন!

বিজনের সেই মুখখানা মনে পড়তেই হাসি পেল সুরমার। হাসতে হাসতে বলল,—ছেলে স্কুলে যায় ন্যাংটো হয়ে, আর বাপের পরণে টেরিকটনের স্যুট!—স্টোভ ধরাতে ধরাতে ভাবল, আজ তিন দিন বাবলু স্কুলে যাবার সময় কাঁদে। ছেঁড়া প্যাণ্ট পরে স্কুলে যাবে না। বন্ধুরা ঠাট্টা করে। ১লা তারিখে মাইনা না পেলে আটটাকা দামের প্যাণ্ট আনতে পারল না ছেলের জন্য। অথচ নিজের স্যুটের মজুরি বাবদ আশী টাকা দিয়ে এল দর্জিকে। বড় মজার মানুষ।

মজা ক'রে বলতে যাচ্ছিল ছেলের কীর্তিটা। কিন্তু পিছনে ফিরেই দেখে বিজনের মেজাজ গরম। পা থেকে মোজা দুটো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল চৌকির নিচে। কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল,—আমি ভাল কিছু করলেই তোমার সহ্য হয় না। নিজের জন্য তো কোন চাইই করি না। যা আয় করি সবই তো ঢালি গুষ্টির গোয়ালে। ছেলে-মেয়ে নিয়েই থাক। আমাকে তো আর প্রয়োজন নেই।

অপ্রস্তুত সুরমা। বল্ল,—ও মা! আমি রাগের কথা বললাম নাকি? ঠাট্টা করলাম ছেলের কাণ্ড বলব বলে। এতে রাগের কি হলো?

বিজন কোট খুলে ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপরে। বল্ল,—ঠাট্টার একটা সময় আছে। তোমার ঐ খোঁচা মারা কথা শুনলেই পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যায়।

সুরমাও ঝাঁঝিয়ে উঠল।—তাতো জ্বলে যাবেই। আমি তো তোমার চোখের কাঁটা। ভগবান আমাকে সরিয়েও নেন না। একবার সরে যেয়ে দেখতাম, তুমি কি কর। সবসময় গুষ্টির খোঁচা দাও! গুষ্টি কি আমি বাপের বাড়ী থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি?

গরম জলের কেটলিটা সজোরে মেঝের ওপরে রেখে রান্নাঘরে গেল দুধ

আনতে। সেখান থেকে সুরমার কণ্ঠ ভেসে এল,—ঠাট্টাও করার উপায় নেই ? আমি কি মিথ্যে বলেছি ? ছেলেটা রোজ স্কুলে যাবার সময় কাঁদে, ছেঁড়া প্যাণ্ট পরে স্কুলে যাবে না। কিভাবে যে তাকে স্কুলে পাঠাই তা আমি জানি। সামান্য একটা সুতীর প্যাণ্ট কিনতে পারলেনা মাসের শেষ ব'লে। আর বাপ হয়ে কোন প্রাণে আশী টাকা মজুরি দিয়ে স্যুট নিয়ে এলে ? মাস পড়লে আনলে কি ভাগবত অশুদ্ধ হয়ে যেত ?

মনের ঝাল ঝাড়তে ঝাড়তে সুরমা চা আর ঝালমুড়ি রেখে আসে বিজনের সম্মুখে। ঝালমুড়ি বিজন ভালবাসে। তাই সারা দুপুর না ঘুমিয়ে মশ্‌লা তৈরি করেছে সুরমা— বিজন খাবে বলে। কিন্তু বরাতে থাকলে তো ? রাগ ক'রে বেরিয়ে গেল বিজন, কিছু না খেয়ে।

আমিও বেরিয়ে যাচ্ছিলাম কাজে। হঠাৎ বন্ধুবর ডঃ প্যাটেলের গাড়ী এসে থামল গেটের সম্মুখে। ডঃ প্যাটেল নামলেন গাড়ী থেকে। অগত্যা তাঁকে নিয়ে উঠে গেলাম আমার চেম্বারে। বাড়ীতেই কাটাতে হল সারা সন্ধ্যাটা।

কথা প্রসঙ্গে বললেন ডঃ প্যাটেল,—আজ সকালে মিসেস্ বড়ুয়া, মানে বিজন বাবুর স্ত্রী এসেছিলেন আমার কাছে। অদ্ভুত কেস্। স্বামীর সঙ্গে অশান্তির কথা বলতে যেয়ে কেঁদে ফেল্লেন সুরমা দেবী। বললেন,—এমন অবুঝ মানুষকে নিয়ে কি আর বুঝে সংসার করা যায় ? পদে পদে অশান্তি।

মিসেস বড়ুয়াকে আমার 'ভুলের স্বীকৃতি' বইখানা পড়তে দিয়েছি। বাহান্ন নম্বর কেসটা পড়লেই বুঝতে পারবেন এমন স্বামীর সঙ্গে তাঁর কি করণীয়। এই কেসটা আসলে আমার পার্সোনাল [নিজের]। লিখেছি অন্যের নাম দিয়ে।

কি রকম ?—আগ্রহ ভরে এগিয়ে বসলাম ডঃ প্যাটেলের দিকে।—ইণ্টা-রেস্টিং মনে হচ্ছে !

টাই-এর 'নট্'টা একটু ঢিলা করে দিয়ে বলতে লাগলেন ডঃ প্যাটেল,—তুমি যাই বল, আমরা স্বামীরাই কিন্তু অনেকক্ষেত্রে অন্যায়ও করি, আবার অশান্তি হলে স্ত্রীকেই দায়ী করি। [একটু থেমে] আমার মেজাজটা বেশ কড়া। কথায় কথায় চটে যাই। আমার কথার ওপরে বৌ-ছেলে-মেয়ে কথা বলবে এ আমার সহ্য হয় না। যমুনা (মিসেস প্যাটেল) ভাল কথা বললেও অনেক সময় তা ভুল বুঝে এমন জবাব দেই যা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে নিজেরই লজ্জা

হয়। কিন্তু আশ্চর্য, যমুনা এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করে না। চটে না। মুখের ওপরে কোন জবাবও দেয় না। নীরবে ব্যস্ত হয় অন্য কাজে। নিজের দুর্ব্যবহারের লজ্জা, রাগ বা অভিমানের আকারে প্রকাশ করি। হয়তো বললাম, —আমি কিছু খাব না। গুম হয়ে শুয়ে রইলাম। না হয় পড়ার ঘরে যেয়ে কিছু লেখার অজুহাতে চুপটি করে বসে রইলাম চেয়ারে। চুপি চুপি পেছনে এসে দাঁড়াবে যমুনা। দু-চারবার আস্তে ক'রে বলবে,—চল, খাবে চল। কোন জবাব দেই না। তখন পেছন দিক থেকে আস্তে ক'রে গলাটা জড়িয়ে ধরবে। নিজের ওপরে দোষ টেনে নিয়ে ধরা গলায় বলবে—আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ওকথা বলা ঠিক হয় নি। আর কোনদিন এমনটি হবে না। খেয়ে নেবে চল।

মা যেমন শিশুকে ভুলোয়,—খোকনের দোষ নেই, সব দোষ ঐ হালুম বুড়োটার, ঠিক তেমনি করে ভুলাবে আমাকে। মালুম থাকে না যে একটু আগেই রেগেছিলাম যমুনার ওপরে। অমনি প্রিয়-সখির মত এমন আদর আবদার করবে কার সাধ্য না হেসে চুপ করে থাকে? অসন্তোষের কালমেঘ মুহূর্তে জল হয়ে যায় উড়ে।

সেদিন 'নারীর নীতি' বইখানা হাতে নিয়ে পড়ার ঘরে ছুটে এল যমুনা। বলল,—দেখ গুরুদেব কি লিখেছেন। খুশীতে ডগমগ যমুনা, বাণীটি পড়তে লাগল :

তোমার কোন ব্যবহারে
তোমার স্বামী যদি
তোমার উপর বিরক্ত, দুঃখিত ও
ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন—
তুমি কখনই তাঁহাকে
অমনতর ফেলিয়া
সরিয়া দাঁড়াইও না;
তাঁহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া
ত্রুটি স্বীকার করিয়া
দুঃখিত হইও—
আর
আদর, সহানুভূতি ও সমর্থন দ্বারা
তাঁহাতে আরও নিবিড় হইও—
উভয়ে সুখী হইবে।*

---

*শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র : নারীর নীতি, পৃ—১৭১

মাতৃজীবন

সুখী দাম্পত্যজীবনই তো বধূজীবনের সার্থকতাকে রূপায়িত করে তোলে। অনেক মেয়ের মনে প্রশ্নজাগে—বধূজীবনের সার্থকতা কিসে?

একথা কে না জানে যে, কোন বস্তু যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেই বস্তু যখন সেই উদ্দেশ্যকে পরিপূরণ করে তখনই আসে বস্তুর সার্থকতা।

নারীর দৈহিক গঠন, মানসিক অভিব্যক্তি, ও জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিই প্রমাণ করে দেয় যে প্রকৃতি [Nature] যেন নারীকে শুধু মা হবার জন্যই প্রসব করেছেন। তাই নারী যেমন ধাত্রী, নেত্রী, তেমনই জনয়িত্রীও সে। নারী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই প্রসব করে। তাই সে জননী।

আশ্রয়, স্নেহমমতা, সহানুভূতি, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, সেবা, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও পোষণপ্রদীপনার রসসিঞ্চন—যা না হলে কোন মানবশিশুই সুস্থ, স্বস্থ ও সার্থকভাবে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারেনা তার প্রত্যেকটি প্রতুল পরিমানে বর্তমান নারীর জীবনে। তাছাড়া, প্রত্যেকটি মেয়ের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তার বৈধানিক সমাবেশ [Physiological System] বিভিন্ন গ্রন্থির নিঃসরণ প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়ে এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে যা কেবল সন্তান ধারণ ও পোষণার পক্ষেই প্রয়োজন। অন্য কোন ফাঙ্কশন নেই তার।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয়েছে যে 'বর' উপস্থিত হবার সংবাদ পেলে বিয়েবাড়ীতে [কনের বাড়ী] কর্মরত ব্যক্তিরা যেমন অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে, উন্মুখ আগ্রহে বর বরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই নারীর দেহবিধানের গ্রন্থিসমূহ, স্নায়ুমণ্ডলী, নানা অন্তর ও বহিঃ প্রত্যঙ্গগুলি স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে অনাগত সন্তানের আগমণী ইঙ্গিত পেয়ে।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস্ বললেন—"প্রকৃতি এমনই করিয়া নারীকে গঠন করিয়াছে যে তার সমস্ত সৃষ্টিকারিণী শক্তি এবং প্রাণের একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ সন্তান গঠনেই কেন্দ্রীভূত। যতদিন নারী নারী, ততদিন ইহা এই রূপই থাকিবে।*[1]

কিন্তু মা হতে হলেই নারীকে বধূ হতে হয়। বধূজীবনের অন্তর সত্তায় প্রস্ফুটিত হয়ে তাকে মাতৃমূর্ত্তিতে রূপায়িত করে তোলে। "নারীর ভিতর স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্ব দুইই আছে। প্রথমে নারীর স্ত্রীত্বের অভিব্যক্তি হয় তার পুরুষের কাছে। পরে সেই স্ত্রীত্ব সার্থক হতে চায় মাতৃত্বে। তাই নারীর

*1 Havelock Ellis: Sex & Society. P. 90.

মা-হবার এত ঝোঁক। বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে নারীর Latent [অন্তর্নিহিত] মাতৃত্ব Potent [সক্রিয়] হতে আরম্ভ করে।"*1

তাই বধূজীবনের প্রকৃত সার্থকতা মাতৃত্বে। যে নারী যত কৃতী সন্তানের মা, তার বধূজীবন তত সার্থক ও সুষমামণ্ডিত।

মা মানব জীবনের আধার

মা-ই তো মানবজীবনের আধার। মাকে আশ্রয় ক'রেই, সন্তান জীবনে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। উদ্ভিদ জগতে বীজ যেমন মাটির সংস্পর্শে উদ্গত হয়ে ওঠে; মাটি তাব তোষণ, পোষণ ও রস-সঞ্চারণে তাঁকে বৃক্ষে রূপায়িত করে তোলে, ঠিক তেমনই পুরুষের বীজ-সত্তা [Sperm] তার স্ত্রীর গর্ভে আশ্রিত হয়ে "মাতুঃ প্রসাদে" সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে।

স্ত্রীর অপর নাম জায়া। ভগবান মনু বলেছেন:

পতি ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য
গর্ভোভুত্বেহ জায়তে
জায়ায়া শুদ্ধি জায়াত্বং
যদস্যাং জায়তে পুনঃ ॥৭।৪

অর্থাৎ পতি স্ত্রীতে প্রবেশ করিয়া গর্ভ হইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে বলিয়া স্ত্রীকে জায়া বলে। সুতরাং প্রকৃত জায়া হতে গেলে জীবন কি ভাবে মূর্ত্তি লাভ করে তা জানা থাকা কি ভাল নয়?

জীবন মূর্ত্তিলাভ করে কি ভাবে?

প্রজনন বিজ্ঞান মানুষের জন্মরহস্য যতখানি ভেদ করেছে তা থেকে জানতে পারি যে স্বামী স্ত্রীর মিলনক্ষণে স্বামী থেকে কয়েক সহস্র শুক্রাণু [Sperm] স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে এবং জরায়ুমুখে হানা দিতে থাকে। হানা দিতে দিতে কতকগুলি শুক্রানু জরায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুনালীর [Phalopion tube] দিকে ছুটে চলে।

অপর পক্ষে, প্রতিমাসে পরবর্ত্তী স্রাবের ১৪ দিন পূর্বে স্ত্রীর ডিম্বাশয় [Overy] থেকে একটি করে ডিম্বাণু [Ovum] বেরিয়ে সোজা চলে যায় ডিম্বাণুনালীতে। নালীপথে এই ডিম্বাণুর সঙ্গে যদি কোন শুক্রাণুর সাক্ষাৎঘটে এবং সেই শুক্রাণুদ্বারা ঐ ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় [Fertilised হয়] তাহলে গর্ভাধান দেখা দেয়।

*1 Sri Sri Thakur Anukul Chandra.

নালীপথে প্রথম অঙ্কুর সৃষ্টি হয়। নবজাত অঙ্কুর ধীরে ধীরে জরায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ছয় দিনের মধ্যে জরায়ুগাত্রে প্রোথিত হয়। এখানে ক্ষুদ্র-অঙ্কুর পল্লবিত হতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে অঙ্কুর বেড়ে ওঠে ভ্রূণে এবং ভ্রূণ রূপান্তরিত হয় শিশুতে।

এই শিশু কেমন হবে তা কে বলবে? বিজ্ঞানীরা যেটুকু দেখেছেন তা থেকে বলেছেন যে শিশু কেমন হবে তা নির্ভর করছে ঐ শিশুর পিতা ও মাতা মিলিতভাবে যে অবদান [Contribution] জোগান দেন সেই অবদানের অন্তর্নিহিত সত্তার ও প্রকৃতির [Intrinsic wealth and nature] ওপরে।

নিষিক্তকরণের সময় শুক্রাণুর ২৪টি ক্রোমোসোম এবং ডিম্বাণুর ২৪টি ক্রোমোসোম সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এককোষী [Single Cell] অঙ্কুর সৃষ্টি করে। শুরু হয় কোষ-বিভাজন। কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে এই বিরাট মানবদেহ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি কোষে এইপ্রাথমিক সংযোজন অর্থাৎ ২৪+২৪=৪৮টি ক্রোমোসোম বর্ত্তমান থাকে। এই ৪৮টির মধ্যে মাত্র দুটি ক্রোমোসোমদ্বারা নির্ণীত হয় শিশুর 'সেক্স' অর্থাৎ শিশু ছেলে হবে না মেয়ে হবে। ৪৬টি ক্রোমোসোমদ্বারা স্থিরকৃত হয় শিশুর শারীরিক গঠন ও মানসিক ভাববৃত্তি।

প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমের মধ্যে আছে অজস্র জীন [genes] বা জনি।* একে বংশানুক্রমিক সাঙ্কেতিক চিহ্নও বলে। কারণ ইহার দ্বারাই আমাদের বংশগত ধারা—যেমন, চুল, চোখের রঙ, দেহ, মুখের গঠন, এবং মানসিক বৃত্তি ইত্যাদি বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। এই জীন বা জনির ভূমিকাকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বর্ণনা করেছে আধুনিক প্রজনন বিজ্ঞান।

প্রজনন বিজ্ঞান এ-কথাও স্বীকার করেছে যে শুক্রাণুর ক্রোমোসোম-বাহিত জীন এবং ডিম্বাণুর ক্রোমোসোম বাহিত জীন যদি পরস্পর সদৃশ [Com patible] না হয় তাহলে বিসদৃশ [incompatible] সংযোজন ঘটে এব তার ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাও বিষ-সদৃশ অপগুণের ধারক ও বাহব রূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

পক্ষান্তরে স্বামী ও স্ত্রীর জীন বা 'জনি' পরস্পর অনুপূরক [Comple mentary] ও সদৃশ [Compatible] হয় তবে তাদের মিলনে উদ্ভূত সন্তা সব দিক থেকে ভাল হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

তবুও প্রশ্ন জাগে মনে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই "হায়ার হেরেডিটি" ওয়াল

*শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র gene এর বঙ্গানুবাদ রূপে ব্যবহার করেছেন "জনি"।

হলেও এবং তাদের মিলন প্রজনন বিজ্ঞান সম্মতভাবে সদৃশ হলেও তাদের পাঁচটি সন্তান পাঁচ রকমের হয় কেন ?

একই পিতা-মাতার কোন সন্তান ছেলেবেলা থেকে এম. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে। আবার কোনটা তিনবার চেষ্টা করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম ধাপ পর্য্যন্ত পৌছাতে পারে না। কোন সন্তান ঈশ্বরানুরাগী, সর্বত্যাগী, পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনযাপন করে, আবার কোন সন্তান অত্যন্ত স্বার্থপর ও ঘোর বিষয়ী। কোন সন্তান সজ্জন, ধীমান, পিতৃ-মাতৃ অনুরাগী। আবার কোনটা দুর্বিনীত, বংশের কলঙ্ক স্বরূপ। তাইতো অনেকে বলেন,—হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান ?

এই অসমতার কারণ হিসাবে অধিকাংশ বাবা-মা ভাগ্যদেবীকে দায়ী করেন। তাঁদের মতেঃ জন্ম মৃত্যু বিয়ে

বিধাতাকে দিয়ে।— অর্থাৎ কে, কোথায়, কার ঘরে জন্মাবে, কে কখন মরবে এবং কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে তা বিধাতা স্বয়ং পূর্ব নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন। মানুষের হাত নেই তাতে।

বিজ্ঞান কিন্তু ফার্স্ট হ্যাণ্ড না দেখে অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিতে রাজী নয়। সে নিজে হাতে নাড়াচাড়া ক'রে নিশ্চিত না হয়ে কোন মন্তব্য ক'রতে নারাজ।

বিজ্ঞান তার পর্য্যবেক্ষণ ভাণ্ডারে যা সঞ্চয় করে রেখেছে তা থেকে আমরা জানতে পারি যে স্ত্রীর ডিম্বাণু নালীতে অপেক্ষমানা ডিম্বাণু নালীপথে ধাবমান শতসহস্র শুক্রাণুর সেইটিকে বরমাল্য দিয়ে বরণ ক'রে আপন বক্ষে ধারণ করে, যেটি দৌড় প্রতিযোগিতায় সবার আগে হাজির হয়। অবশ্য শতসহস্র শুক্রাণুর [sperm] মধ্যে কেন এ বিশেষ ভাগ্যবানটি ফার্স্ট হল তার হদীস বিজ্ঞান পায় নি। মানুষের দৌড় প্রতিযোগিতা হলে অনুসন্ধান করা যেত যে সে প্রত্যহ দৌড়ান অভ্যাস করেছে কি না। অথবা, ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া হলে তার কুলপঞ্জী দেখে বোঝা যেত যে, ফার্স্ট হয়েছে এমন কোন ঘোড়ার সঙ্গে এর পিতৃপুরুষের কোন সংস্রব আছে কি না।

তবে, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সংযোজনার ফলে যে নবজীবনের সূত্রপাত হল তা কেমন ব্যক্তিত্বে ব্যক্ত হয়ে উঠবে তা নির্ভর করছে শুক্রাণুর ২৩টি এবং ডিম্বাণুর ২৩টি ক্রোমোসোমের কম্বিনেষানের (Permutation & Combination) ওপরে।

রাশিয়ার প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক Mr. Amran Scheinfeld তাঁর বিখ্যাত "The New You and Heredity" গ্রন্থে যে গাণিতিক হিসাব দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় যে একটা নিষিক্তকরণে [fertilization] 300,000,000, 000,000 রকম ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। এই যে আমি [I] তা হচ্ছে ত্রিশলক্ষ কোটি কম্বিনেষানের কোন বিশেষ একটা কম্বিনেষানের ফলশ্রুতি। "আমি" যেমনটি হয়েছি, তেমনটি না হয়ে ঐ ত্রিশলক্ষ কোটি রকমের যে কোন একটা অন্য রকমেও জন্মগ্রহণ করতে পারতাম।

একটা শুক্রাণুতে ২৪ জোড়া ক্রোমোসোম আছে। এরা নিজেদের মধ্যে যত রকমে সজ্জিত [through permutation & combination] হতে পারে তার সংখ্যা 16, 777, 216 এবং প্রত্যেকটি সজ্জা অন্যরকমের সজ্জা হতে পৃথক। সুতরাং প্রত্যেকটি শুক্রাণু [Sperm] তার অন্তর্নিহিত ক্রোমোসোমের পৃথক পৃথক সজ্জানুসারে 16, 777, 216 রকমের রূপ ধারণ করতে পারে।

মিঃ শেনফিল্ড বলছেন :

কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্ম হতে গেলেই একটি বিশেষ শুক্রাণুকে কোন বিশেষ ডিম্বাণুর সঙ্গে সংযোজিত হতেই হবে। এখন চিন্তনীয় যে এই বিশেষ আপনার [you] জন্মগ্রহণ কিভাবে সংঘটিত হয়েছে।

সেই বিশেষ মুহূর্তে ১৬,৭৭৭,২১৬টি [রকমের] শুক্রাণুর একটিকে—যা আপনার অস্তিত্বের অর্দ্ধাংশের জন্য দায়ী—কোন একটি বিশেষ ডিম্বাণুর সঙ্গে —যা আপনার অস্তিত্বের অপর অর্দ্ধাংশের ধারক—মিলিত হতে হয়েছে। এই বিশেষ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন সংঘটন ৩০১,০০০,০০০,০০০,০০০ রকমের যে কোন একরকমের হতে পারত।

["But to produce a given individual, both a specific sperm and a specific egg must come together. So think now, what had to happen for you to have been born.

At exactly the right instant, the one out of 16, 777, 216 sperms which represented the potential half of you had to meet the one specific egg which held the other potential half of you. That could happen only once in some 300, 000, 000, 000, 000 times !"

The New You and Heredity. P. 28

কিন্তু "আমি" আমার মত হলাম,—অন্ত আর একরকমের কেন হলাম না; আমার ক্ষেত্রে এই বিশেষ 'কম্বিনেষান'টা কেন হল, কেন ঐ বিশেষ শুক্রাণুটি দৌড় প্রতিযোগিতায় 'প্রথম' হল তার উত্তর দিতে যেয়ে Mr. Scheinfeld যা বলেছেন তা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন:

"লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর হৃদয়গ্রাহী দৌড় প্রতিযোগিতায় যে ভাগ্যবান শুক্রাণুটি জয়লাভ করে সেটি স্ত্রীর [মা-এর] ফ্যালোপিয়ন নালীপথে অপেক্ষামানা বিশেষ ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে তাদের প্রত্যেকের দেয় ক্রোমোসোম [২৪+২৪] মুক্ত হয়ে পরস্পর মিলিত বা সংযোজিত হয় এবং ঐ নিষিক্ত ডিম্বাণু অভ্যন্তরে নবজীবনের সূত্রপাত করে।

কিন্তু এটা ঠিক যে এই বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ডিম্বাণুর সহিত বিশেষভাবে বিশেষিত শুক্রাণুর অলৌকিক মিলন ও সংযোজনার ওপরেই লিঙ্কন, শেক্সপীয়ার, অথবা এডিসন অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জন্মগ্রহণ নির্ভর করছে। এই অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৈবনির্দ্দিষ্ট [অলৌকিক] সংযোজনার প্রভাবই স্থিরকৃত করে যে তোমার সন্তান প্রতিভাবান হবে না নির্বোধ হবে, অপূর্ব সুন্দর হবে না কুৎসিত কদাকার হবে।"

[The lucky sperm which has won out in the spectacular race against millions of others, enters the chosen egg which has been waiting in a fallopian tube of the mother, Immediately, as we previously learned, the sperm and the nucleus in the egg each releases its quota of chromosomes and thus the fertilized egg starts off on its career.

"But it was on just such a miraculous coincidence—the meeting of a specific sperm with a specific egg at a SPECIFIC TIME—that the birth of a Lincoln, or a Shakespear or an Edison or any other individual in history depended. And it is by the same infinitesimal sway of chance that a child of yours might perhaps be a genius or a numskull, a beauty or an ugly duckling."

Amran Scheinfeld : The New You and Heredity. P-28

সন্তান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হবে না কান্তমুদী হবে, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হবে না অজমূর্খের মত নির্বোধ হবে তা নির্দ্ধারণে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের বিশেষ মুহূর্তটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ তা মিঃ শেনফিল্ড বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি "চান্স" এবং "মিরাকুলাস কয়েন্‌সিডেন্সের" ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন।

ভারতীয় দর্শন কিন্তু 'চান্স' বা মিরাকুলাস কয়েন্‌সিডেন্সের' [Chance & miraculous coincedence] কথা বলেন নি। যা বলেছেন তাতে যুক্তি আছে। তবে আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হলে এ তথ্যের যথার্থতা আরও নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিতভাবে বললেন :

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ৬।৮

—অর্থাৎ, যিনি মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন তিনি আবার ঠিক তেমন ভাবই প্রাপ্ত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন :

মৃত্যুকালে যে ভাব ধ'রে
ছেড়ে শরীর যায় জীবন।
জন্মে আবার তেমনই স্থানে
সেই ভাবের পথ পায় যখন॥

উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে সুদখোর শাইলকের মত সুদ আদায়ের কথা ভাবতে ভাবতে কোন মানুষ যদি দেহত্যাগ করে তবে সেই মানুষটি সেই পিতামাতার কাছেই জন্মাবে যারা সুদবিষয়ক ভাবনায় মসগুল হয়ে পরস্পর মিলিত হবে।

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে চক্রাকার [Cyclic] সম্বন্ধ পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে মানুষের মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের অবস্থা জানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তত্ত্ববিদের ভাষায় বলা হয়েছে :

"মানুষ জন্মায়। সে চায় আত্ম-সংরক্ষণ, আত্মসংপোষণ, ও আত্মসংবিস্তার। এই চাওয়া ও পাওয়ার তাগিদে মানুষ পরিবেশের সাড়া ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে এগোতে থাকে। যাত্রাপথে—অনুকূল যা তা গ্রহণ করে, এবং প্রতিকূল যা তা বর্জন করে বা নিরোধ করে। এই গ্রহণ ও বর্জন কালে পারিবেশিক

সাড়া ও সংঘাতের সহিত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় যে বিভিন্ন 'ভাবের' সৃষ্টি হয় তা তার মস্তিষ্কে মুদ্রিত হতে থাকে।

"এখন বিশেষ কোন কারণে মানুষ যখন ঐ মুদ্রিত ভাবরাজীর কোন বিশেষ একটা গভীরতম ভাবের মধ্যে সমাহিত হয়ে পড়ে তখন সে অন্যান্য সকল প্রকার ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এতদবস্থায় পরিবেশের কোন সাড়া [impulse] ঐ মানুষটির ভিতর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। এই এমনতর অবস্থা যখন হয় তখনই ঐ মানুষটির মৃত্যু ঘটে।"

—Sri Sri Thakur Anukul Chandra, Nana Prasange, Vol. I, P-35

যে গভীরতম 'ভাবে' সমাহিত হবার ফলে লোকটি মারা যায় বা পার্থিব দেহ ত্যাগ করে, সেই 'ভাবকে' ঐ লোকটির বিদেহী আত্মার 'বাহী-ভাব' বা 'Carrier-Bhava' বলে। এই বিদেহী আত্মা তাব 'বাহী-ভাবের' অনুরূপ [Correspondent] ভাবভূমিতে [Plane of Bhava] ভাবেব তরঙ্গরূপে অবস্থান করতে থাকে। ঐ 'ভাবই' বিদেহী মানুষটিকে স্বতন্ত্রতাসহ অস্তিত্বে বজায় রাখে। "এই 'ভাব দেহে [in Ecto-plasmic body] পিণ্ড দেহের [Physical body] সব যা কিছু সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। আর তাই সে ঐ অবস্থার মত সব কিছু অনুভব করতে পারে" [নানা প্রসঙ্গে : Vol. I, P. 35]।

মৃত্যুর পর মানুষ ভাবজগতে ভাবদেহে কি ভাবে অবস্থান করে তা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র একটি সুন্দর তুলনামূলক উপমার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"একটি নির্দিষ্ট ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ যেমন তার নির্দিষ্ট nature and frequency [প্রকৃতি ও অনুরণন] নিয়ে ইথার সাগরে আবস্থান করে, মানুষও ঠিক তেমনই মৃত্যুর পর একটি ভাবের তরঙ্গরূপে 'ভাবের' সাগরে অবস্থান করে"।

"ইথার একটি সূক্ষ্ম উপাদান। আর তার ঢেউ-এর মধ্যে আছে ইথার কণাগুলির একটি বিশেষ রকমের কম্পনের continuity [ক্রমাগতি] মৃত্যুর পরে আমরা যা থাকি তাহচ্ছে ভাবের সাগরে ভাব-তরঙ্গের একটা continuity. ইথার কণাগুলি আর ইথারের ঢেউ-এ যে প্রভেদ, আমাদের মূল সূক্ষ্ম উপাদান [fine essence constituting our form, or, essence of our being] ও আমাদের মৃত্যুর পরের অবস্থারও সেইরূপ প্রভেদ" [নানা প্রসঙ্গে : Vol. I, P. 37]।

যে মানুষটি মারা গেল সে অর্থাৎ তার বিদেহী আত্মা আবার কখন কোথায় কার ঘরে দেহ ধারণ করবে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করবে তা কে জানে ?

তবে একথা তো সবাই জানে যে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি এক গভীর আকর্ষণ ও প্রীতিবিভোর আবেগ নিয়ে যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং পরস্পরকে উপভোগ করে তখন তাদের দেহ মনে এক ভাবের ভরণ বা রণন [Thrills] সৃষ্টি হয়। এই মিলন মুহূর্ত্তে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত ভাবরণন [Resultant Thrills of Bhava]-এর সঙ্গে সংখ্যাতীত বিদেহী আত্মার মধ্যে যে একজনের 'বাহী-ভাব' [Carrier Bhava]-এর সঙ্গতি ও ঐক্যতান [harmony and resonance] ঘটে সেই বিদেহী আত্মাই ঐ দম্পতির সন্তান [সম+তান্] রূপে জন্মগ্রহণ করে।

এটা ঠিক বেতার যন্ত্রে প্রোগ্রাম শোনার মত। কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে আমাদের গ্রাহক যন্ত্র [Radio receiving plant] যে বেতার তরঙ্গ ধরবার মত সুবিন্যস্ত ও সাড়াপ্রবণ [tuned and sensitive] হয়ে ওঠে ঠিক সেই বেতার তরঙ্গে প্রেরিত বিষয়ই আমাদের শ্রবণে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। অন্য শতসহস্র প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গে প্রেরিত বিষয় আমাদের বোধের সীমার বাইরে থাকে।

অনুরূপ ভাবে কোন দম্পতি কোন নির্দিষ্ট মিলন মুহূর্ত্তে যে 'ভাব-ভরণ' দ্বারা আবিষ্ট [Induced] হয়ে ওঠে তার সঙ্গে যে বিদেহী আত্মার "বাহী-ভাবের" সঙ্গতি ও ঐক্যতান হয় সেই বিদেহী আত্মাই ঐ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে।

মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে মানে ? গর্ত্তে ইঁদুর প্রবেশ করার মত অদৃশ্য বা অজ্ঞাত কোন কিছু আকাশ থেকে নেমে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে—তা নয় কিন্তু।

মিলন মুহূর্তে পিতা থেকে স্খলিত শুক্রাণু তাদের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবভরণ অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ বিদেহী আত্মার ভিন্ন ভিন্ন 'বাহী-ভাব' দ্বারা আবিষ্ট হয়ে [Induced] ওঠে। এই লক্ষ লক্ষ রকমের ভাবাবিষ্ট [Induced with bhavas] শুক্রাণুর মধ্যে যে শুক্রাণুটির মাতৃজঠরে অপেক্ষমানা ডিম্বাণুর ভাব-ভরণের সর্বতোভাবে ঐক্যতান [resonance] ঘটে ডিম্বাণু সেই শুক্রাণুটিকেই আলিঙ্গন ও গ্রহণে আত্মীকৃত ক'রে নেয়। সৃষ্টি হয় নবজীবনের সূত্রপাত।

যুগমানব শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রজনন বিজ্ঞানের গূঢ়তম রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন —

অতিদেহিক সত্তা জানিস
কামকামনার ভয়ে
ঘন হয়ে শুক্রাণুতে
বীজ শরীরটি ধরে
শুক্রাণুটি সঙ্গত তার
ডিম্বকোষে মেশে
কোষ বিভাগে বেড়ে ওঠে
বৈশিষ্ট্যতে ভেসে।

অনুশ্রুতি Vol. I, P. 122

স্বামী স্ত্রীর মিলন মুহূর্ত্তে তাদের উভয়ের মনোভাব যত উদার, শ্রেয়-সন্দীপী, দিব্য আবেশী ও উন্নত মানের হবে সেই মুহূর্ত্তে যে সন্তান মাতৃগর্ভে আশ্রয় নেবে সেও তত উন্নত মানের ও দিব্য ভাবসম্পন্ন হবে।

উদাহরণ দিতে যেয়ে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ইংলণ্ডের কবি লর্ড টেনিসনের নাতি ও নাতবৌকে বললেন—"তোমরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার। মনে কর, দুজনেই ভগবান বুদ্ধের ওপরে লেখা নাটক দেখতে গেলে। দুজনেই ভগবান বুদ্ধের ঐ মহান ও ভাগবতভাবে মুগ্ধ হয়ে বাড়ী ফিরে এলে। ঐরূপ মানসিক অবস্থায় স্বামী স্ত্রীতে মিলিত হলে। এই মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে সন্তান শিশুকাল থেকেই ঐ দেবতার মত হাত নাড়ছে দেখবে।"[1]

স্বামী-স্ত্রীর মিলন মুহূর্ত্তে উভয়ের ভাবভরণ কেমন এবং কতখানি উন্নত-মানের হবে তা নির্ভর করছে স্ত্রী তার স্বামীর গুণগ্রহণ মুখর কতখানি এবং কোন্ ভাবের দ্বারা স্বামীকে উদ্দীপ্ত [Enlightened] ক'রে তোলে তার ওপর। অবশ্য স্ত্রীর উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে স্বামীও তার স্ত্রীকে কতখানি মিলন-আকুতিতে গ্রহণ করছে তার মূল্যও কিন্তু কম নয়। তবে এই বিশেষ-ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভূমিকার গুরুত্বই বেশী। স্ত্রী তার চলন, চাহনী, সেবা সৌকর্য্য, আপ্রাণ ঐকান্তিকতা ও প্রীতিমুখর তৎপরতায় স্বামীকে যেমন ও যতখানি নিজেতে [স্ত্রীতে] অনুরাগ আবিষ্ট ক'রে তুলতে পারবে, স্বামীকে যে ভাবের দ্বারা উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারবে, স্বামীর সেই ভাবই তার গর্ভে সন্তানরূপে মূর্ত হয়ে উঠবে।

1 আলোচনা প্রসঙ্গে : Vol. VII, P. 204-205

একই দম্পতির বিভিন্ন সন্তানের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার প্রধান কারণ সৃজন মুহূর্তে [At the time of inception when an egg is fertilized by a specific sperm] স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মনোভাবের বিভিন্নতা। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুরাগের টান ও গুণগ্রহণ মুখরতার তান যখন যেমন থাকে এবং যেমনতর ভাবের দ্বারা স্বামীকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে, তখন সে তার স্বামীর ততটুকু এবং তেমনতর ভাবকেই তার সন্তানে মূর্ত ক'রে তুলতে পারে।

"ঐ টান ও গুণগ্রহণ মুখরতার উন্মুখতাই হলো measuring agent বা পরিমাপনী শক্তি।" তাই স্ত্রীকে সন্তানের মা বলা হয়। 'মা' মানেই যিনি বা যাহা সন্তানকে পরিমাপিত করেন।

"রতিকালে মায়ের ভাবভূমি, চিন্তা ও চেতনা যেমনতর থাকে, তেমনতর বিশিষ্টতা সম্পন্ন সন্তান আবির্ভূত হয়।"[1]

অভিগমনের রীতি—

রতিকালে মনের ভাবভূমি, চিন্তা ও চেতনা ভুঁইফোঁড়ের মত মিলন মুহূর্তে গজিয়ে ওঠে না। দৈনন্দিন জীবনে স্ত্রী তার অনুরাগমুখর চিন্তা, কর্ম, সেবা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে স্বামীতে যতখানি রত থাকে তারই উপরে নির্ভর করছে রতিকালে উভয়ের, বিশেষ করে স্ত্রীর ভাবভূমি, চিন্তা ও চেতনা। তাই সুস্থ, সুন্দর ও মনের মত সন্তানের জননী হতে হলে দাম্পত্যজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহার মধুর ও মালিন্যহীন হতেই হবে। তাই ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হল :

"স্বামীর প্রতি টান যেমনই
ছেলেও জীবন পায় তেমনই ॥"[2]

পক্ষান্তরে, দৈনন্দিন জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি প্রীতিমুখর না থাকে, বরং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, ঘৃণা, অনুযোগ, অভিযোগ, অভিমান বা বেদনা-বিধুর মনোভাব থাকে তবে স্বামীতে অভিগমন না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ স্ত্রীর মন যদি ক্ষুব্ধ থাকে, তার অন্তরে স্বামীর প্রতি বিরূপতা ও বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হতে থাকে তবে ঐ স্ত্রী কোনমতেই স্বামীকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও শ্রেয় সন্দীপনায় অভিদীপ্ত করে তুলতে পারবে না। ফলে শ্রেষ্ঠ বা শুভসম্বেগী সন্তানের মা হওয়া সম্ভব হবে না। উপরন্তু, রতিকালে মিলন মুহূর্তে ব্যবহারিক

1 Sri Sri Thakur Anukul Chandra : Alochana Prasange, Vol. X. P-122
2 Sri Sri Thakur Anukul Chandra, Vol-P- ?

জীবনের অশান্তি ও অসন্তোষের রেশমাত্র যদি স্ত্রীর মনে উঁকি মারে এবং তার ফলে স্ত্রীর মনে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও বিকার ঘটে তবে ঐ মিলন-জাত সন্তান মানসিক বিকৃতি নিয়ে যে জন্মাবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমনকি স্বামীর প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে যেয়ে স্ত্রীর যে অঙ্গে বিকৃতি ঘটে থাকে প্রায় ক্ষেত্রেই সন্তান সেই অঙ্গে বিকৃতি নিয়ে জন্মে থাকে।

প্রজনন বিজ্ঞানে যাঁর ভূয়োদর্শন ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে সেই মহাজীবনের কণ্ঠে ঘোষিত হল :

অনুরাগে আবেগটানে
পেতে গিয়ে স্বামীর প্রীতি
পাওয়ার পথের বাধার তোড়ে
ঘটলে মনের কুবিকৃতি ;
যেমন ভাবে যে অঙ্গেতে
নারীর যেমন বিকার ফলে
সন্তানেরও সে অঙ্গটি
বিকৃতি পায় তেমনি হলে।*[1]

প্রকৃতি এখানে যেন পক্ষপাতিত্ব করেছেন। গোটা দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়েছেন স্ত্রীর ওপরে। তাই স্ত্রীকে যদি সুস্থ সন্তানের মা হতে হয় তবে স্বামী যেমনই হোক না কেন, বা যতই অন্যায় ব্যবহার করুক না কেন, তাঁকে সয়ে বয়ে মমতার বসে সিক্ত করে নিতেই হবে। প্রেম-প্রীতির সক্রিয় অভিব্যক্তিতে সেবামুখর আপ্যায়নে স্বামীকে মমতামুগ্ধ করে তুলতেই হবে। তা না পারলে ঐ স্বামীর সন্তান ধারণ থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ স্বামীর প্রতি ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান বা অনাদরে, তাঁকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে স্ত্রী যদি শুধু দৈহিক সান্নিধ্যে স্বামীকে টেনে নেয় বা আসতে দেয় তবে মনের মত সন্তান পাবার আকাঙ্ক্ষা মনেই রয়ে যাবে। বাস্তবে যা পাবে তা অবাঞ্ছিত ব্যবহারে স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মনকেই বিষিয়ে তুলবে।

আপসোস ক'রে বললেন কমলা দেবী,—দাদা ছেলে এমন হবে জানলে কি আর স্বামীর সঙ্গে অমন ব্যবহার করতাম।

শ্রীমতি কমলা রায়। বাপের বড় আদরের মেয়ে। বাবা দিল্লীতে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। গোড়া বৈষ্ণব। দিল্লীর মত অতি আধুনিক শহরে বাস

1 শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র : অনুশ্রুতি Vol-I. 2nd edn., P. 125

করলেও এবং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা হলেও ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও কুলাচারের প্রতি নিষ্ঠা কমেনি কমলার। বিবাহ হয়েছে হাওড়া জেলার কোন এক সম্রান্ত পরিবারে। কমলার স্বামী মিঃ রায় খুবই সজ্জন ব্যক্তি। চাকুরি করেন সরকারী সংস্থায়—বেশ উঁচু পদে।

কমলাদেবীর তিন ছেলে দুই মেয়ে। বড় ছেলে সবে কলেজে প্রবেশ করেছে। কমলাদেবী ও তাঁর স্বামীর আশা ছিল ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্য্যন্ত পড়াবেন। কিন্তু হতাশ হয়ে পড়েছেন, মহাবিদ্যালয়ের প্রথম ধাপেই দুবার ডিগবাজি খাওয়ায়। একটা বিষয়েও পাশের নম্বর তুলতে পারেনি প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষায়। তদুপরি তার অবাঞ্ছিত ব্যবহারে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন উভয়ে।

দুঃখ করে বললেন কমলাদেবী,—আমার পেটের ছেলে যে এমন হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। লেখাপড়া, আচার আচরণ, স্বভাবচরিত্রে যে ছেলেকে পাড়ার সকলেই খুব ভাল ছেলে বলত সে এমন কেন হল? পড়াশোনায় একদম মন নেই। ঠাকুর দেবতার ওপরে শ্রদ্ধাভক্তির বালাই নেই। আগে ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করত, গুরুজনদেব সবাইকে প্রণাম করত। তাতো করেই না, উপরন্তু এত অনাচার সৃষ্টি করেছে যা অসহ্য। কিছু বলতে গেলে অপমানজনক কথা বলে। বিশেষ করে ওর বাবার প্রতি ব্যবহার খুবই মর্ম্মান্তিক। ওনার মত মানুষ বিরল। ছেলে-মেয়েরা যেন ওনার প্রাণ। ছেলে-মেয়েদের কোন শখ আহ্লাদ অপূরণ রাখেন না। সেই মানুষটিকে বাড়ী আসতে দেখে বিড়বিড় করে অসম্মানজনক কথা বার্ত্তা বলবে। বলবে—এঃ রাজা সাহেব আসছেন! ভোঁদড় কোথাকার—আরও কতকি!

সেদিন সহ্য করতে না পেরে এক ধমক দিয়েছিলাম। ও ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে আমায় ফেলে দিল।—কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন কমলাদেবী। ছেলের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশের অবরুদ্ধ আবেগ ভাষায় যেন প্রকাশ করতে পারছেন না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন,—মনে হয় ও মানসিক বিকার গ্রস্ত। মাঝে মাঝে বেশ ভাল থাকে। পাড়ার কারও সঙ্গেও দুর্ব্যবহার নেই। যতরাগ সব যেন বাবার ওপরে। আমি প্রতিবাদ করি বলে আমার ওপরেও রাগ কম নয়।

উনি ছেলেকে কিছু বলেন না। লোকজানাজানি হলে নিজেরই মানে লাগবে। তাই নীরবে সহ্য করেন ছেলের অত্যাচার।

কিন্তু দাদা, আমার কাছে যে অসহ্য। ছেলের মুখে তার বাপসম্বন্ধে কটূক্তি আর কত শোনা যায় বলুন ? তাই সেদিন বলেছিলাম,—তুই বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা। ভাবব, আমার একটি ছেলে মরে গেছে। ছেলে বলেকি জানেন ? বলে—বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাব মানে ? জন্ম দেবার সময় মনে ছিলনা ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ঘৃণায় ওর মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না।—আবার কান্নার ঢেউ বেরিয়ে এল কমলাদেবীর বুকের পাঁজর ভেদ ক'রে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমার পেটে এমন ছেলে কেমন ক'রে হলো, তাতো ভেবে পাই না।

আমিও কি কম ভেবেছি। বেশ কিছু দিন ধরে স্টাডি করেছি ছেলেটাকে। কত প্রশ্নই না করেছি ওর মনের গহন থেকে তথ্য তুলে আনবার অভিপ্রায়ে। মায়ের কড়া শাসন, ছেলেকে আচলে বেঁধে রাখবার অভ্যাস, পরিবেশে সবার সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে না দেয়া, শিশুমনের ওপরে নীতিকথার ভারি বোঝা চাপিয়ে দেয়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় সাধারণতঃ যা ঘটে থাকে তাই ঘটেছে ছেলেটির জীবনে। বয়সের তুলনায় ব্যক্তিত্ব পেকে ওঠে নি। গৃহপরিবেশে শৈশবের শিক্ষা ও আধুনা বৃহত্তর পরিবেশে বিরুদ্ধ চলনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে সাম্য হারিয়ে ফেলেছে ছেলেটি। তাই মাঝে মাঝে অশোভন ও বিদ্রোহী মনোভাব ফুটে ওঠে ওর আচরণে।

কিন্তু বাবার প্রতি ঘৃণ্য মন্তব্যের কারণ আরও গভীরে বলে মনে হল। তাই মন থেকে শঙ্কোচ মুছে ফেলে কমলাদেবীকে বললাম—এই ছেলে যখন আপনার পেটে আসে তখন মিঃ রায়ের প্রতি আপনার মনোভাব কেমন ছিল তা জানতে পারলে সুবিধা হতো—অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

পলকবিহীন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন কমলাদেবী। মুখের ভাব দেখে মনে হল এতটুকু আপত্তি নেই তার—এই বিপত্তি থেকে রেহাই পাওয়ার তাগিদে। দীর্ঘ সতের বৎসর পূর্বের স্মৃতির ভাণ্ডার খুজে স্বামীর প্রতি মনোভাব বের করে আনলেন কমলাদেবী। বললেন,—আমার বিয়ে যখন হয় তখন আমি খুবই ছেলেমানুষ। মাত্র ষোল বছর বয়স। শ্বশুর বাড়ী খুবই বনেদী বংশ। শ্বশুরের পাঁচ ছেলে! উনিই [মিঃ রায়] সবার ছোট। শ্বশুরের খুবই আদরের ছিলাম। শাশুড়ীও স্নেহ করতেন খুব। তবুও আমার অন্তরটা শুখিয়ে থাকত—স্বামীকে কাছে না পেয়ে। শ্বশুরবাড়ী আমার কাছে কারাগার মনে হতো। রাগ হতো স্বামীর ওপরে। চার ভাসুরই চাকরীর পরে রোজই বাড়ী ফিরে আসতেন। কিন্তু উনি আসতে পারতেন না। ওনার চাকরির জায়গা

ছিল বাড়ী থেকে অনেক দূরে। তবে শনিবারে বাড়ী এসে সোমবারে কাজে যাওয়ায় কোন অসুবিধা ছিল না। উনি তাও আসতেন না। ওনার ঐ একই কথা, 'পরীক্ষাটা হয়ে গেলে প্রত্যেক শনিবারে বাড়ী আসব।'

ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। প্রত্যেক সপ্তাহে চিঠি লিখতেন,—"...তুমি তো জান, মাত্র চারশ' টাকা মাইনের জুনিয়র আমি। এই পরীক্ষায় পাশ করলে ন'শ টাকা মাইনে পাব। তোমাকে নিয়ে বাসা ভাড়া করে থাকতে পারব। তখন তোমাকে নিয়ে... ।" আর পড়তাম না। রেগে পুড়িয়ে ফেলতাম চিঠিখানা।

তিন চার মাস পরে বাড়ী আসতেন একদিনের জন্য। তাতে আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকত।

পশ্চিমের জানালা দিয়ে যেই দেখতাম যে উনি মাঠের পথে হেঁটে আসছেন, অমনি একটা পেতলের কলসী নিয়ে পুকুর ঘাটে যেয়ে বসে থাকতাম। বাড়ী এসে মনে মনে এ-ঘরে সে-ঘরে খুঁজে বেড়াতেন। বৌদিদের জিজ্ঞাসা করতেন, —'ও কোথায় গেল ?'

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পাট মিটে গেলে জায়েরা আমায় জোর ক'রে ঘরে পাঠিয়ে দিত। খাটের এক কোনে চোখ-কান বুঁজে পড়ে থাকতাম। ওনার কোন কথার জবাব দিতাম না। আমার কাছে এগিয়ে আসত। আদর করতে চাইত। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতাম। মুখে যা আসে তাই বলতাম। শেষে বিছানায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম। উনি কিন্তু আমাকে একটিও কটুকথা বলতেন না। কাতরভাবে আমাকে বোঝাতেন—লক্ষ্মী আমার। শুধু শনিবার আর রবিবারে ক্লাস করতে পারি। তাই আসতে পারি না। আর একটা বছর কষ্ট কর। প্রমোশন পেলেই তোমাকে নিয়ে সোজা দক্ষিণ ভারতে পাড়ি দেব। হাত ধরে কাছে টানবার চেষ্টা করতেন। আমার মন ভিজত না। শুধু মনে হতো, রাতের পর রাত একা বিছানায় শুয়ে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে ফেলি তা দেখে না! দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাবে ? রাগে, অভিমানে, ক্ষোভে, অশ্রদ্ধায় মনটা বিষিয়ে থাকত। ঠিক সেই অবস্থায় ঐ ছেলে পেটে আসে।

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম কমলাদেবীর কাহিনী। লোকচক্ষুর অন্তরালে কত স্বামী-স্ত্রীর জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে! চোখের সামনে ভেসে উঠল ঋষির বাণী :

রতিকালে উদ্দীপনা
শুভ সম্বেগ প্লাবন ছাড়া
নারীর মনের বিপাক যেমন
সন্তানও হয় তেমনি ধারা ।*

সৌভাগ্যের বিষয় আমাকে আর কিছু বলতে হল না। নীরবতা ভঙ্গ করে উদাম কণ্ঠে বললেন কমলাদেবী,—আজ বুঝতে পারছি ঠাকুর কেন বলেছেন,—

স্বামীর প্রতি টান যেমনই
ছেলেও জীবন পায় তেমনই ।

আবেগ ভরে বলতে লাগলেন কমলাদেবী,—তখন তো বুঝিনি, বুঝবার বয়সও হয়নি। যদি জানতাম, তাহলে তিন মাস কেন, তিন বছর বাড়ীতে না এলেও স্বামীকে অন্তত: ঘৃণা করতাম না; ক্ষুব্ধ হয়ে অশ্রদ্ধা করতাম না। স্বামীর অন্যায় বা অবিচারও যদি একটা বছর সয়ে বয়ে নিতাম তাহলে আজ এই অসহ্য জ্বালা সইতে হতো না। ওনার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। যখন দেখি, ছেলের দুর্ব্যবহারে উনি নীরবে মাথা গুঁজে বসে আছেন, তখন কান্নায় বুক ভেঙ্গে আসে। এ আমি কি ভুল করলাম জীবনে। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন কমলাদেবী।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—দুঃখ করবেন না মা। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন চেষ্টা করতে হবে যাতে ছেলের মন থেকে বাবার প্রতি এ অশ্রদ্ধার ভাব মুছে ফেলা যায়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাই তো তাদের সন্তানের জীবনের বুনিয়াদকে মজবুত ক'রে তোলে।

কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী যদি প্রায় সমবয়সী হয়, অথবা, অর্থ-সম্পদ, সম্মানে যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, অথবা স্ত্রীর মনে 'সুপিরিয়র কমপ্লেক্সের' (Superiority Complex) আবির্ভাব ঘটে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শ্রদ্ধা জমাট বাঁধতে পারে না। এবং ঐ স্ত্রী স্বভাবতই আচারে, ব্যবহারে, স্বামীর অনুগত হয়ে নিজেকে স্বামীর কাছে নৈবেদ্যের মত নিবেদন করতে পারে না। "আমিই বা তোমার থেকে কম কিসে?" এই মনোভাব থাকলে স্ত্রী কখনই স্বামীকে মহান ভাবের দ্বারা উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে না। আর মহান ভাবের দ্বারা যদি স্বামীকে উদ্দীপ্তই না করা যায় তবে মহানুভব সন্তানের মা হওয়া কি সম্ভব? সে অবস্থায় স্বামীতে অভিগমন অভিশাপ রূপেই দেখা দেয়।

*শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র : অনুশ্রুতি, Vol. I, P-126

আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কেঁদে ফেল্লেন স্থানীয় সিভিল সার্জেন ডাঃ মহাপাত্রের পত্নী শ্রীমতী মহাপাত্র।

ধর্ম্মসভায় ভাষণ শেষে সবে এসে বসেছি সরকারী নীরিক্ষণ ভবনে [Inspection Bungalow]। চারিদিক আলোর বন্যায় ভাসিয়ে এসে দাঁড়াল একখানা মেরুন রঙের মার্সিডিজ্ গাড়ী কে একজন এসে সংবাদ দিল : লেডী ডাক্তার শ্রীমতী মহাপাত্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

সঙ্গে করে নিয়ে আস্থন। সহকারীকে বললাম—গেঞ্জীটা দাও। গেঞ্জীটা গায়ে দিয়ে একটু ভদ্রলোক সেজে বসলাম। গণ্যমান্য ব্যক্তি দেখা করতে আসছেন ব'লে কথা।

ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী মহাপাত্র। নমস্কার ক'রে বললেন [ওড়িয়া ভাষাতে] আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

প্রতি নমস্কার ক'রে বললাম—মা এসেছে ছেলের কাছে, এতো ছেলের মহা সৌভাগ্য। বস্থন।

সম্মুখের সোফাতে বসলেন শ্রীমতি মহাপাত্র। বললেন—আপনার ভাষণ শুনলাম। আপনি ভাষণে বললেন, "তুনিয়ায় যত মানুষ আছে তাদের সকলের জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।" তা আমি যদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে গ্রহণ করি তাহলে কি আমার জীবনের সমস্যার সমাধান পাব?

একটু আমতা আমতা ক'রে বললাম,—আপনার সমস্যাটা জানতে পারি কি?

ডাঃ শ্রীমতি মহাপাত্র ঘরের ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মনে হল তাঁর সমস্যাটা একটু নিরালায় বলতে চান। ইসারা করতেই আমার সহকারী উপস্থিত তুজন যুবককে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বললাম—বলুন।

শ্রীমতি মহাপাত্র তার আঁচলে বাঁধা চাবির রিংটা তু-একবার পাক দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন,—বড় ছেলে পার্থকে নিয়ে আমার সংসারে অশান্তি। ছোটবেলায় বেশ ভাল ছিল। মাধ্যমিক পর্য্যন্ত ভাল রেজাল্টও করেছে। বি. কম. থার্ড ইয়ারে উঠেই পড়াশোনা একদম বন্ধ ক'রে দিল। অনার্স পেপার ছেড়ে দিল। যতসব বাজে ছেলেদের সঙ্গে ওর আড্ডা। আর—। একটু নীরব থেকে নিচু গলায় বললেন—শুধু মেয়েদের পেছনে ঘোরে। কোন কথা বলবার উপায় নেই। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলা

যাবে না। কিছু বলতে গেলেই ওর বাবার সম্বন্ধে আর আমার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলবে যা মুখে আনতে বাধে। যখন তখন হুকুম করবে,—টাকা দাও ব'লে। টাকা না দিলে ঘরের আসবাবপত্র ভেঙ্গে তছনছ করবে। ওর বাবা যেন ওর চোখের কাঁটা। একদম সহ্য করতে পারে না। অথচ তাঁরই খায়, তাঁরই পরে।

কথাগুলি মুখ নিচু ক'রে একটানা ব'লে গেলেন শ্রীমতি মহাপাত্র। আবেগ প্রকাশ করে বললেন—দাদা! আমার অমন ছেলে যে এভাবে জাহান্নমে যাবে তাতো ভাবতেও পারছি না।—অশ্রুধারা ঝরে পড়ল মেঝেতে পাতা কার্পেটের ওপরে। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে আমার দিকে অসহায় চাহনীতে চাইলেন। বললেন—আমি যদি ঠাকুরকে ধরি তাহলে আমার এ সমস্যার সমাধান কি হবে?

শ্রীমতি মহাপাত্রের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিপথগামী সন্তানের জন্য ব্যাথাতুরা মায়ের অন্তর বেদনার অভিব্যক্তি। বড় করুণ তাঁর চাহনী। গভীর আগ্রহে চেয়ে আছে আমার দিকে।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—হবে মা, নিশ্চয়ই হবে। তবে ঠাকুরকে শুধু গ্রহণ করলে হবে না। নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কথাগুলি মেনে চলতে হবে।

করজোড়ে কাতর কণ্ঠে বললেন শ্রীমতি মহাপাত্র—আমি মানব, নিশ্চয়ই মেনে চলব। আপনি ঠাকুরের মহামন্ত্রে দীক্ষা দিন।

রাত্রে দীক্ষা দেয়া সম্ভব হল না। কারণ তাঁর স্বামী ডাঃ মহাপাত্র ছিলেন ভূবনেশ্বরে। তাঁর অনুমতি প্রয়োজন।

বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে রাত্রিশেষে চলে এলাম বলেশ্বরে। দু'দিন পরে নিজেই গাড়ী চালিয়ে হাজির হলেন শ্রীমতি মহাপাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

দীক্ষান্তে আমার প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করলেন শ্রীমতি মহাপাত্র—পার্থ পেটে আসবার সময় স্বামীর প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন ছিল, বললেন: সত্যিকথা বলতে কি, পার্থ যখন পেটে আসে তখন ডাক্তারবাবুর ওপরে আমার মন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধায় ভরা ছিল। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।—দরজার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক দেখে নিলেন অন্য কেও সেদিকে আসছে কিনা। বললেন—ডাক্তারবাবু, হাসপাতালের এক নার্সের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেই নার্স ছিল একজনের বিবাহিত স্ত্রী। এই নিয়ে ওনার সঙ্গে প্রায়ই মনোমালিন্য হতো। উনিও-

নার্সকে ছাড়বেন না, আমিও তাকে বরদাস্ত করব না। এই নিয়ে দুজনে তুলকালাম বেধে যেত। উনি তখন খুব চেঁচামিচি করতেন আর ঘরের আসবাবপত্র আছড়ে ভাঙতেন। এইসব কারণে মন বিষয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে মনে হতো, আমি ওনার থেকে কম কিশের! আমিও তো গভর্নমেণ্ট হসপিটালের অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জেন। অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারিনি ওনাকে, সঙ্গ দান করেছি নিতান্ত অনিচ্ছা ও অশ্রদ্ধায়—যদি ওখানকার টান কাটে এই আশায়। টান অবশ্য নিজেই কেটেছিলেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে। অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল তার জন্য।

স্বামী বিপথ থেকে ফিরে এসেছেন ভাবতেই, তৃপ্তিতে ভরে উঠল শ্রীমতি মহাপাত্রের মুখখানা।

তৃপ্তিভরা বুকে, স্বামীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবার আগ্রহ নিয়ে অভিগমন করার রীতি। তার জন্য সারাদিনের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সশ্রদ্ধ অভিনিবেশ যেমন অপরিহার্য্য, তেমনই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রীতিমুখর আলিঙ্গনী আগ্রহও অবশ্য প্রয়োজনীয়। দুই পক্ষেরই আগ্রহ-আকুল পারস্পরিক আকর্ষণ অপরিহার্য্য। তাই সংসারিক ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীতে মতান্তর ঘটলেও 'মনান্তর' যেন দাম্পত্য আঙ্গিনার ত্রিসীমানায় প্রবেশ না করে। স্বামীর সঙ্গে মনান্তর ঘটায় স্ত্রীর মনে যদি কোন রকম 'অন্তর' বা বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তবে ঐ বিক্ষেপই তাদের মিলন মুহূর্ত্তে স্ত্রীর রজঃসন্দীপনাকে [The eager urge impregnated in the ovum] এমন ভাবে ম্লান করে তুলতে পারে যার ফলে ঐ অবস্থায় গর্ভজাত সন্তান মূঢ় ব্যক্তিত্ব ও বিক্ষুব্ধ মনোভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। রত্নগর্ভা মায়েদের কাছে অনুসন্ধান করলে এ তথ্য বিপরীতক্রমে প্রমাণিত হবে ব'লে বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে বাংলার গৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জননী শ্রীমতি প্রভাবতী দেবীর উক্তি বহু মায়ের কাছেই মূল্যবান পাথেয় হতে পারে।

সৎসঙ্গ-সভাপতি শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু তাঁর মানসতীর্থ পরিক্রমা গ্রন্থে লিখেছেন —"আর একদিন সুভাষ জননীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে কথা উঠতেই তিনি বললেন,—'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথান্তর বা মনান্তর যে কি ক'রে হয় তা আমার জীবনে আমি জানি না।"

বৃন্দাবনবাবুও জানতেন না যে তাঁর চার সন্তানের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠটি অনন্য সাধারণ হলো কেন!

কুষ্টিয়ার বিখ্যাত আইনজীবী শ্রীবৃন্দাবন মল্লিক। তিন ছেলে ও এক মেয়ের পিতা তিনি। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র, কিশোর বয়সেই প্রমাণ করেছিল যে, সে পরিবারের অন্যান্যদের চাইতে স্বতন্ত্র। নয়-দশ বৎসর বয়সেই ছেলেটি পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে উদাসীন হয়ে উঠল। জামা-জুতো প্রভৃতি পোশাক-পরিচ্ছদ কিম্বা লজেন্স, চকোলেট, বিস্কুট ইত্যাদি শিশুদের প্রিয় খাদ্য—কোনটাতেই তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। দিলে খায়। না দিলে চায় না।

সর্বদা কি যেন ভাবে ছেলেটি। রামায়ণ গান, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ এবং হরিবাসরে ছেলেটির আগ্রহ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ তার বাবা-মাকে ভাবিয়ে তুলল। ঐ টুকু ছেলে সুললিত কণ্ঠে, ভাবাবেশে এমন কীর্তন পরিবেশন করত যে পরিবেশ মুগ্ধ হয়ে যেত। আরও আশ্চর্যের যে ১৩/১৪ বৎসরের ঐ কিশোরের মুখ থেকে আধ্যাত্মিক ও দর্শন বিষয়ক এমন সব জটিল প্রশ্নের সমাধান বেরিয়ে আসত যে শহরের বিশিষ্ট বিদগ্ধগণ বিস্মিত হতেন।

এই কনিষ্ঠ পুত্র গর্ভে আসবার সময় মল্লিক দম্পতির মনোভাব কেমন ছিল সে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত বৃন্দাবনবাবু যা বলেছিলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

"দুই ছেলের পর যে মেয়ে সে হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা গেল। মেয়ের মা পাগলিনীর মত হয়ে উঠল। আমিও কেমন যেন হয়ে পড়লাম। কোর্ট-কাচারী যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধুদের পরামর্শে তীর্থদর্শনে বেরুলাম। উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করে ফেরার পথে এলাম নীলাচলে। বেশ কিছুদিন কাটালাম সেখানে। সন্তান হারানোর আঘাতেই হোক আর নানা তীর্থ পর্যটন প্রভাবেই হোক, আমাদের দুজনের মনই ভাগবতমুখী হয়ে উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে যেতাম। মহাপ্রভুর স্তবস্তুতি শুনতাম, আরতি দর্শন করতাম। বাসায় ফিরেও মহাপ্রভুর জীবনী, লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি পাঠ করতাম। কখন কখনও দুজনে বসে কৃষ্ণ বুদ্ধ-গৌরাঙ্গের মহিমা আলোচনা করতাম। আলোচনা করতে করতে কত বিনীদ্র রজনী যে প্রভাত হয়েছে তার হিসাব নেই। দুজনেই এক দৈবী ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম। সেই অবস্থায় ঐ ছেলে মাতৃগর্ভে আসে।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী থেকে জানা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ জননী, গদাধর পাদপদ্মে আকুল হয়ে প্রার্থনা করার পর গদাধর তাঁর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জননীও বাবা বিশ্বনাথের চরণে সন্তানের জন্য আকুল

হয়ে প্রার্থনা করে ছিলেন। তাই তো শিশুকাল থেকেই শিবের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন নরেন্দ্র নাথ। অন্যান্য সাধু, সন্ত, মহাপুরুষ যাঁরা, যাঁরা ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অধ্যাত্ম চেতনার প্রভাবে সংসারের মানুষকে ভাগবতমুখী হতে সাহায্য করেছেন তাঁদের মায়েদের কাছে অনুসন্ধান করলে এই তথ্যই সম্বৃদ্ধ হবে যে তাঁদের ভাবভূমি, চিন্তা ও চেতনা কোন ভূমায়িত বস্তু বা ভাবের দ্বারা আবিষ্ট অবস্থায় ঐ ঐ সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

তাই মনে হয়, সুখী দাম্পত্য সম্পর্কের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মন যদি কোন ভূমায়িতভাবে—ভাগবতভাব, ইষ্টানুরাগ, সু-উচ্চ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, দেশাত্মবোধক বা শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সূক্ষ্ম কলা-নৈপুণ্যের ভাবে—বিভোর থাকে, তাহলে তাঁরা অনায়াসে মহান সন্তানের জনক-জননী হতে পারেন।

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন—"উপগতির সময় স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের চিন্তাধারা ও ভাবভূমির সঙ্গতি থাকা দরকার। আর এই চিন্তাধারা ও ভাবভূমি যত উন্নত ও পবিত্র হয়, সন্তানও আসে তত উচ্চ প্রকৃতির। ঐ সময়কার স্বামী স্ত্রীর tuned psychical charge [সঙ্গতিশীল মিলিত মানসিক ভাব-ভরণ] সন্তানের পরবর্ত্তী জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ঐটেরই vitalized material embodiment হল সন্তান। তার চোখ, মুখ, নাক, কান, এককথায় প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন; চিন্তা, চলন, ঝোঁক ইত্যাদি অনেক কিছুই ওর দ্বারা moulded [গঠিত বা বিশেষিত] হয়। তাই নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে newer achievement দিকে এগিয়ে চলে।"*

উপগতির সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চিন্তাধারা ও ভাবভূমির সঙ্গতি সহজে স্থাপিত হয় যদি তাদের দৈনন্দিন পারস্পরিক ব্যবহার প্রীতি-উদ্দীপ্ত ও মমতা-মধুর হয় এবং উপগতির সময় স্ত্রী স্বামীকে প্রার্থনা [Solicit] করে। তাই আর্য্যশাস্ত্র বিধানে আছে স্ত্রী কর্তৃক প্রার্থিত না হয়ে স্ত্রীতে উপগত হওয়া অবিধি। স্ত্রী যখন সুস্থ মনে, সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে সাগ্রহ সন্দীপনায় স্বামীকে আলিঙ্গনে আবাহন করে এবং স্ত্রীর আপ্যায়নে স্বামীর মনোজগত যদি স্ত্রীতে অনুরক্ত হয়ে তাকে আপন অন্তরে আত্মসাৎ করবার এক উদগ্র কামনা জেগে ওঠে তবে সেই শুভক্ষণের মিলনেই উভয়ের চিন্তাধারা ও ভাবভূমি সাধারণতঃ সঙ্গতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় স্বামীর মনোজগতে তার প্রিয়তমা পত্নী ছাড়া আর কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিষয়ক ভাবনার এতটুকু তরঙ্গ

---

*Alochana Prasange : Vol-VIII, P. 208

পর্য্যন্ত ওঠে না। তাতে নাকি পারস্পরিক উপভোগও গভীর ও মধুর হয়। জীবনের ব্রহ্মচর্য্য বলতে যা বোঝায় তার কোন খামতি ঘটে না এমনতর মিলনে। এই প্রকার অভিগমনে স্বামী বল, বীর্য্য ও দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়ে ওঠেন এবং স্ত্রীর যোগাবেগ স্বামীতে দৃঢ়ভাবে সুনিবদ্ধ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় যে শিশু মাতৃজঠরে আশ্রয় নেয় সে যে সুস্থ ও সন্দীপিত জীবন নিয়ে পৃথিবীর আলোতে আত্মপ্রকাশ করবে তা বহু অভিভাবকের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়।

তাই দেশ, জাতি, সমাজ বা রাষ্ট্রকে যদি সুস্থ, সন্দীপিত ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বে প্রতুল ক'রে তুলতে হয় তাহলে সুস্থ ও প্রীতিমুখর দাম্পত্যজীবন অপরিহার্য্য। সুস্থ ও প্রীতিমুখর দাম্পত্যজীবন লাভের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে সদৃশ বৈধী বিবাহ, এবং স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অনুরাগমুখর চলন। মানুষের [পুরুষ ও নারী উভয়ের] অনুরাগ তত পোক্ত ও মজবুত হয় যত তার 'সুরত' (Libido) বা ভালবাসার টান শিশুকাল থেকে কোন শ্রেয় এবং প্রেয়তে নিবদ্ধ হয়। ছেলের জীবনে বিশেষ ক'রে তার মা এবং মেয়ের জীবনে তার বাবা যদি একান্ত হয়ে ওঠেন এবং মাও বাবার স্নেহ-ভালবাসা ও পোষণ প্রদীপনায় ছেলে ও মেয়ের 'সুরত' যদি পুষ্ট হয়ে ওঠে তাহলে ঐ ছেলে ভবিষ্যত জীবনে শ্রেয়তপাঃ ও আদর্শপ্রাণ হয়ে মহৎভাবের অধিকারী হয় এবং ঐ মেয়ে তার অনুরাগের ফাগে তার স্বামীর জীবনকে অনুরঞ্জিত ক'রে আদর্শ স্ত্রীরূপে সংসারকে স্বস্তির আগরে পরিণত করতে পারে। দেশ ও জাতির পরম সম্পদরূপ সুসন্তান অর্ঘ্য দিয়ে সমগ্র জগতের কল্যান আনতে পারে। কারণ, মেয়েই-তো মা—যিনি জন তথা জাতিকে পরিমাপিত করেন।

স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!!